উৎসর্গ

পরম কল্যাণীয়

শ্রীমান পঞ্চানন ব…োপাধ্যায়

ও

শ্রীমতী …তিরূপা দেবী

এবং

আমার উত্তরাপথের 'পথের সাথীদের'

হাতে আমার এই ভ্রমণ পথের

পত্রাবলী দিলাম।

ছোটদিদি—



তুষারমণ্ডিত নারায়ণপর্ব্বতের পাদদেশে লেখিকাসহ বদরীনাথের যাত্রীদল।

উত্তরাখণ্ডের পত্র

বদরীর পথে

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী—প্রিয়বরাসু

তোমার পত্রের উত্তর দেরাদুনে থাকতে দিতে পারি নি। দিলেও বেশী লাভ ছিল না; একেবারে ধীরে সুস্থে বড় করেই দিচ্ছি।

পৌষ মাসে যখন তোমার সঙ্গে দেখা হয়, তুমি বলেছিলে কুম্ভে হরিদ্বার যাওয়া তোমার এবার সম্ভব হবে না, যদি আমরা বদরী যাই তো খবর দিতে। সেটা দিতে দেরি হ'বার কারণ, আমার পক্ষে এ পথে যাত্রা করা যে সম্ভব হবে ভাবতে পারিনি। তাই ভরসা ক'রে খবরও দিইনি তোমায়। এবার আশ্বিন মাসে পূজার ছুটীতে কাশী আসবামাত্র পিতু বলেছিল, "এবার পূর্ণকুম্ভ, হরিদ্বারে গঙ্গাস্নানে যাওয়া যাক্—আর চলুন না, অম্নি বদরীও যাই।" আমি নেহাৎ বাজে আবদার ভেবেই উত্তর দিই, "বেশ ত, চল্ না।" তারপর তোমার সঙ্গে দেখা হ'তে এ খবর তো তোমায় দিয়েই ছিলুম!

কুম্ভস্নানের খবরটা তোমার সখাকে দিতেই তিনি চম্‌কে উঠে বলে ফেল্লেন, "ক্ষেপেছ?"

যে পুরোদস্তুর ক্ষেপেছে, সেও এ অপবাদ সয় না, আমি ক্ষেপেছি, যে ক্ষেপেচি বলে স্বীকার করে নোব? নিশ্চয়ই করলুম। ও লিখলে, "দেরাদুনে বাড়ী নেওয়া হচ্চে; সবাই ঐখান থেকে কুম্ভস্নান করাও হবে।"—বদরীর নাম ছিল না।

বল্লেন, "তুমি যেও, আমি কি করে যাব?"—অর্থাৎ মক্কেলে মহা ব্যস্ত! যাহোক, ছেলেদের সঙ্গে নে'বার দরখাস্ত দি পেলুম না,—এমন কি খবরের কাগজে কুম্ভমেলার বিরাটত্ব যত হ'তে লাগলো, স্নান-যাত্রার আশা ততই খর্ব্বীকৃত হ'তে অবশেষে 'ইতি গজ'র মধ্যেই কাশী যাত্রা করলুম।

বোনেদের বাড়ী পৌঁছে জানতে পারলুম ভাস্কর অসিধা সে ও বীরু দেরাদুনে বাড়ী ঠিক করতে গেছে, সেখান থেকে ত বেরুনো হবে। পঞ্চুর বোনেরা, ভগ্নিপতি—সদ্য পেন্সনপ্রাপ্ত ি ফণি বাবু, ভাগ্না, দু' একজন আত্মীয়া—সব যাবার জন্যে ৈ এখানে এসেছেন। মারও শিলং থেকে আসবার কথা আছে।

বিকালে ছিল "বাণীভবনে" খড়্গসিংহের মুক্তির জন্য মহি আমি এসেছি ওরা জানতো না। আমায় উপস্থিত দেখেই "কিছু বলতে হবে।"

পাঁচটী মিনিটের নোটিস! একটা পেনসিল কাগ কোণের মধ্যে মুখ করে লিখতে বসলুম। ফুলস্কেপ পৃষ্ঠ হয়েও ছিল, অথচ পড়তে দাঁড়িয়ে অর্দ্ধেক কথাই বুঝতে যাহোক করে গোঁজামিল দিয়ে দেওয়া গেল। পেনসিলের যদি বা কোন মতে সামলে নিতুম, তার আবার অর্দ্ধেকক

হারিয়ে। সমবেত মহিলাদের নাম সই করতে সঙ্গের কাগজগুলো দিয়েছিলুম, দেখছি সেই সঙ্গে প্রথমার্দ্ধটাও 'লোপাট' হয়েছে! বাণীভবনের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী শোভনা নন্দী লেখাটা কোনও কাগজে দেবার জন্য চেয়ে নিয়েছিলেন, তখন যে তার মুণ্ড উড়ে গেছে তা দেখা যায়নি।

খড়্গসিংহ নরঘাতক। নরঘাতী সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে এবং সকল সমাজেই নিন্দিত, আট বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড নরঘাতীর পক্ষে লঘুদণ্ডই। তার জন্য শোকপ্রকাশের কি আছে?

যুক্তি তাই বলে বটে! কিন্তু কার্য্যের সঙ্গে কারণের সম্বন্ধ এমনই নিবিড় যে সেটা বাদ দিলে চলে না। খড়্গসিংহ যে অমানুষিক অপরাধের জন্য এ হত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁকে নরঘাতক কেউ মনে করতে পারছে না, হিংস্র নরপশুর উচ্ছেদকারী বোধে সপরিশ্রম আট বৎসর কারাদণ্ডকে কঠোর বলেই অনুভব করছে। মানুষের চামড়া দিয়ে তৈরি হলেই মানুষ হয় না। নরমাংসলোলুপ বাঘেরও অধিক এই সব নারীমাংসলোলুপ হিংস্র শ্বাপদ; মানুষ পদবাচ্যই এরা নয়।

শাস্ত্রমতে নারী পিতার, পতির এবং পুত্রের রক্ষাধীনা। নারীমর্য্যাদা রক্ষার্থ আত্মদানকারী খড়্গ বাহাদুর সিং নারী সমাজের পিতা বা পুত্রের স্থানীয়—বিশেষতঃ যে দেশে নারী-মর্য্যাদা দস্যু তস্করের লুণ্ঠন বস্তু হয়ে দাঁড়ালেও, না শাসক সম্প্রদায় না স্বদেশবাসী প্রতিবিধানের জন্য সচেষ্ট হয়, সে দেশে নারী-মর্য্যাদারক্ষকের স্মৃতি দেবতার মতই পূজিত হওয়া উচিত। তিনি যেই হোন,—সকল কন্যার পিতা, সব ভগিনীর ভ্রাতা—সমস্ত মায়ের সন্তান। সেই স্নেহাধার, এবং স্নেহময় আত্মীয়তমের

জন্য গৌরববোধের মধ্যেও বক্ষে শোকের ব্যথা এবং চক্ষে অশ্রুবাষ্প জমে উঠেছে, আর এই সভাকে তাই আজ আনন্দ-সভা এবং শোক-সভা দুয়েতেই পরিণত করেছে। এই কথাটাই বলবার ছিল।

রাত্রে সিগ্রায় ফিরে দেখি মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের পুত্র ভ্রাতৃ-প্রতিম বৃন্দাবন আমার প্রতীক্ষায় বসে আছে। আর যাঁরা এসেছিলেন, বসে বসে ফিরে গিছেন। সকাল বেলায় বৃন্দাবনের বাড়ী গিয়ে যে আলোচনাগুলো আরম্ভ করা গেছলো, সে গুলো সব শেষ হয়ে উঠেনি। শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী মশাইও সে আলোচনায় ছিলেন, এবেলা তিনি আসেন নি। অগত্যা তিনজনের কায আমাদের দু'জন-কার উপরেই পড়লো।

বৃন্দাবনের সঙ্গে গল্প আরম্ভ হলে ত আর তার শেষ নেই! খড়্গ বাহাদুর সিংহ থেকে আরম্ভ করে, মজফ্ফরপুরের সাহিত্য সভা, কোন বিশেষ মাসের মাসিকে প্রকাশিত কোন বিশেষ ছোট গল্প ইত্যাদি এবং আরও অনেক কিছুই আলোচনা চলতে থাকে। ফণি বাবু (জজসাহেব বলেই তাঁকে উল্লেখ করা যাবে) বিচার সম্বন্ধীয় আলোচনার পর প্রায় চুপচাপই বসে রইলেন, একবার উঠে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে হয়ত বা দুটি চিনের বাদাম ও পাঁপর ভাজা খেলেন, কারণ সে দুটোর স্বাদ জিভে না থাকলে ফিরে এসেই আমায় "ওরা ডাকচে" বলে ঠেলে পাঠাতেন না!

বৃন্দাবন যখন চ'লে গেল তখন রাত এগারটা। বিছানায় পড়ে ঘুম এলো না। কড়ি রুণুর কথা কেবলই মনে পড়তে লাগলো। দেরাদুন থেকে শীঘ্রই ফিরবো বলে এসেছি, কিন্তু যদি ওরা বদরী যায়, তাহ'লে? এমন সুযোগ ছাড়বো কি? দেখা যাক, বদরী যাওয়া তো আর

মুখের কথাটী নয়! ৪২২ মাইল যাওয়া আসায়,—এই কাশী থেকে কলকাতা—তাও আবার পাহাড়ী পথ। সে আর আমরা গেছি!

দেরাদুন থেকে টেলিগ্রাম এলো বাড়ী পাওয়া গিয়েছে। সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে আমাদের যাত্রীদল ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে পৌঁছলো। কোনও গাড়ীতে রিজার্ভ কামরা পাওয়া গেল, কি গেল না—সে খবর নিয়ে মোগলসরাই থেকে লোক তখনও ফেরে নি।

দেরাদুন এক্সপ্রেস এসে চ'লে গেল, সেটায় বদল ছিল না। পেশোয়ার মেলে দুটো বদল, তবে আমাদের নামতে হবে না, এই যা সুবিধা।

পেশোয়ার মেলে দুটো কামরার বারোটা বাঙ্ক রিজার্ভ পাওয়া গেল। পঙ্কু সেদিন তার নূতন কেনা গাজীপুর অঞ্চলের জমীদারীর কাজে আমাদের সঙ্গী হতে পারলে না ব'লে সেদিন আমরা বারজন লোকই রওনা হলুম। আর দুটী মেয়ে ও একটী পুরুষ, সতীশের মার সঙ্গে এই দলে যোগ দিয়েছিলেন। তা ছাড়া আমাদের লোকজনেরা সব ছিল।

সতীশের মাকে চিনতে পারলে? বসুমতীর প্রোপ্রাইটার সতীশ মুখুয্যের মা, আমাদের বেয়ান।

আজ ভাই এখানেই বিদায়। দেখি পারি ত মধ্যে মধ্যে লিখে যাব। আমার যাবার ভরসা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ছিল না, তবু তোমায় সেই "যাব কি যাব না"র মধ্য থেকেই আসতে লিখেছিলুম। আসতে পারলে খুবই ভাল হতো। কিন্তু সে দোষ যখন তোমার চেয়ে আমারই বেশী, তখন উপায় কি? এলে না বলে ব'কে যে খানিকটা গায়ের ঝাল মেটাব তারও উপায় নেই! অতএব আজ এইখানেই ইতি—

উত্তরাখণ্ডের পত্র

ইষ্ট ক্যানাল রোড
বেলি লজ, দেরাদুন।
(১ম পত্র)

শ্রীমান্ অশোকনাথ,—কল্যাণবরেষু—

দেরাদুন সহরটি একেবারেই আধুনিক। এর মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই বড় দেখছি না। আধুনিক সাহেবী সহর সব যেমন সেই গোছেরই। রাঁচির এবং হাজারিবাগের সঙ্গে কোন কোন খানে কিছু কিছু মিল আছে, তবে সাহেবী পাড়াগুলো তার চেয়েও জমকালো এবং সব শুদ্ধ জড়িয়ে সহরটাও বেশ বড়। আর রাস্তা ঘাট তরতরে ঝরঝরে এবং চওড়াও খুব। দু'ধারে ছোট বড় বাগানবাড়ীগুলি, চিত্রাঙ্কিতবৎ সুদৃশ্য। আর একটি জিনিষের এখানে প্রাচুর্য্য—সেটি আর কোথাও এত নেই, তা' গোলাপ গাছের,—বিশেষ ক'রে নানা রঙের গোলাপ লতার। এই গোলাপ লতাগুলি দেখবার মত জিনিষ বটে! প্রত্যেক বাড়ীর ফটকের মাথায় অসংখ্য ফুলে ভরা নানা রঙের গোলাপের লতাগুলি যেন রাস্তা পথ আলো করে আছে। ফুল এখানের কোন গাছে এক-আধটা ফুটতে জানে না। থোলো থোলো হয়ে ফুটে থাকে—তা' সে কি লতায়, কি গাছে। লতানে গোলাপ এখানে দু'রকম দেখা যায়,—এক, এক-পাপড়ীর, আর একরকম খুব ছোট ছোট, নে[illegible]র বা গটাপাচার ফুলের মত অনেক পাপড়িযুক্ত, ভারী চমৎক[illegible] দেখতে। সমস্ত ফুলই নরসেট জাতীয় গোলাপের মতন স্তবকে স্তবকে তোড়া বাঁধা হয়ে ফুটে থাকে, তাতেই অত বাহার। আমাদের এই 'বেলি লজের' বাগানেও গোলাপ ফোটার হিসাব নেই! গাছগুলোর ডাল পাতার রং

যে সবুজ, তা যেন এখানে খুঁজে বের করতে হচ্চে। ওর সমস্তটাই ফুলের রঙে সাদায় লালে রঙীন হয়ে গেছে। বাস্তবিক এ দেশটাকে গোলাপের দেশ বল্লেও মন্দ হয় না!

ইউক্যালিপ্‌টস্‌ গাছ যতদূর উঁচুতে মাথা তুল্‌তে পারে, তা' তুলেছে! এ দেশের গাছেদের মাথাই একটু বেশী উঁচু। বাঁশঝাড়গুলো যদি দেখ, অবাক হয়ে যাবে। এক একটা ঝাড়ের বাঁশ আবার এম্‌নি মোটা, আমাদের বাংলা দেশের সুপারি গাছের মতন বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। আবার আর এক জাতীয় বাঁশ আছে, তাদের ঝাড়গুলি সরলোন্নত সমানই বটে, কিন্তু সেগুলি কঞ্চির মতন সরু এবং আখের খাদির মতন আঁক দেওয়া দেওয়া। সে দেখলেই তোমার একটা সংগ্রহ করে লাঠি তৈরি করবার সাধ যে হ'তো, তাতে আর সংশয় নেই! আচ্ছা, এখানের আর একটা জিনিষ দেখলেও তুমি কিন্তু খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে।—কি বল ত? এখানের আকাশে উত্তর দিকে অনেকগুলো অতিরিক্ত নক্ষত্র ওঠে, যা তোমরা দেখতে পাওনা! এটা খুব আশ্চর্য্য নয় কি? এ থেকে তোমার মনে পৃথিবীর গোলত্ব সম্বন্ধে একটু একটু সন্দেহ দেখা দিচ্চে,—না? আচ্ছা, সেগুলো কোথা থেকে এখানে এল বল ত? তাই সে কি দু'একটা? দেওয়ালীর আলোর মালার মতন ঝাঁক বাঁধা,—আবার সপ্তর্ষির মতন, এক সঙ্গে জটলা পাকানো তাও আছে। নানা আকার, বিভিন্ন ভঙ্গী! বুঝতে পারচো না ত? আচ্ছা, তাহলে বলাই যাক্‌। না হলে তোমার মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে হয়ত বা তুমি এই নিয়ে বিষম একটা তর্কই লাগিয়ে দেবে আবার, যে তার্কিক তুমি! এগুলো মুসুরি পাহাড়ের আলো। হঠাৎ দেখতে এমন মজা লাগে, মনে হয় যেন

হোরাইজনের কাছটায় কতকগুলো নক্ষত্র গ   এসে জমে রয়েচে। তুমি এখানে এলে নিশ্চয় রোজ সন্ধ্যাবেলা তাই দেখতে এই ময়দানটায় এসে হাজির হতে,—না ?

আচ্ছা, আর কি দেখতে তোমার ভাল লাগতো ? কৈ বিশেষ কিছু তেমন তো,—হ্যাঁ ঠিক কথা ! ঐ যে ইষ্ট কেনাল নাম দেওয়া বাঁধান নালাটা কোন্‌খানকার একটা উদ্দাম ঝরণাকে বেঁধে এনে অর্দ্ধেক সহরের জল যোগাচ্চে, আমাদেরই বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে রাস্তার ওধার ধ'রে সে সটান চলে গেছে, সেটা তুমি দিনের মধ্যে কতবার দেখতে যেতে বল তো ? উঁচু থেকে সে বেশ একটু কল্লোল শব্দে গ'র্জ্জে নেমে চলেচে। স্রোতটুকুও তার বড় মন্দ নয়। বার কতক যেতে বৈকি ! না ? তোমার রমুদাদাও তাই করচে। স্বস্তি বড় নেই তাদেরও। আর আশা করচে যে, গাড়িবারান্দার থামে জড়িয়ে যে আঙ্গুর লতাটা ফুলে ভ'রে উঠেছে, ওটার ফল তারা না খেয়ে এখান থেকে যাচ্চে না। ফুল থেকে ফল ধরতে কতটুকু দেরি সে তারা দুবেলা'ই তদারক করে থাকে।

এখানে বাঙ্গালী পরিবার সংখ্যায় নিতান্ত কম না হলেও, সবাই এখানকার স্থায়ী লোক নন। কিছু চাকুরে বাঙ্গালী এবং অনেকেই আমাদের মতন কুম্ভস্নানের উপলক্ষ্যে সমাগত। এই দ দলে মিলে গিয়ে একটু বর্দ্ধিত সংখ্যা হয়ে পড়েছে। এখানের বাঙ্গালীদের মধ্যে কিন্তু বেশ একটু সজীবতা দেখলাম। এঁদের একটি সাহিত্য সভা আছে, নিজস্ব বাড়ীতে একটি লাইব্রেরী আছে, এখানে নাকি এবৎসর দুর্গা পূজাও হয়েছিল। আমার সঙ্গে স্থানীয় ভদ্রলোকেরা ও ভদ্র

মহিলারা নিজগুণে খুব সদ্ব্যবহার করচেন। প্রথমেই তাঁরা দেখা ক'রে গিয়ে, বাড়ীর মেয়েদের পাঠিয়ে দেন। বিমলাবাবু লাইব্রেরী থেকে মাসিক পত্র প্রথম মোড়া খুলেই আমায় পাঠান, ভারী ভদ্রলোক এঁরা।

আমাদের সাম্‌নেই রমণীমোহন বাঁড়ুয্যে ইঞ্জিনীয়ার থাকেন। ছেলেটিকে প্রথম দেখেই বড্ড স্নেহ হ'ল, তোমার "দাদির" বয়সী—কি বছর দুইএর বড়ই হবেন। বিলাতে পাশ, কিন্তু স্বভাবটি বিলিতি হয়নি। তাঁর মাকে দিদি বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, সেই মতন স্নেহপ্রবণ স্বভাব।—এখানে অনেকের সঙ্গে দেখা হচ্চে! আচ্ছা, তুমি গুণে যেও। এক নেপাল ধর—"ওগো তোরা জামাই দেখ্‌সে আয়"—গ্রামোফোনের সেই গানের গায়ক। তোমার বড় দিদির বিয়ের স্ত্রী-আচারের সময় এই গানটাই গেয়েছিলেন। আমার বাবার বড় ভক্ত। বৃদ্ধ দেখা করতে এসে কত চোখের জল ফেল্লেন। দুই—পুসার ডাক্তার যতীন সেন পি, এইচ-ডি, পি আর এস্ এবং তাঁর বাড়ীর মেয়েরা। তিন—কল্‌কাতার অ্যাডভোকেট জেনারেল—এঁর সহপাঠী—বি, এল, মিত্রের মা এবং তাঁর দাদা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল মিত্র, তাঁর স্ত্রী প্রভৃতি। আরও যাঁদের সঙ্গে দেখা হলো তাঁদের তোমরা চেন না—তাই নাম লিখলুম না। কাশীর চেনাও অনেকে আছেন। একদিন টপকেশ্বর গেছলুম, পবিত্র নির্জ্জন স্থান, গুহামধ্যে শিবলিঙ্গ, তাঁর মস্তকোপরি পাহাড় ভেদ করে বিন্দু বিন্দু জল সর্ব্বদাই ঝরে পড়চে। পাশে জলহীন শুষ্ক একটী নদী-গর্ভ। সহস্রধারা আর একটী দর্শনীয় স্থান।

শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর বক্তৃতা এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল মিত্রের

ভাগবত ব্যাখ্যা, ডাক্তার সেনের ওখানে শোনা গেল। তোমরা ভাল আছ ত? শীঘ্র শীঘ্র খবর যেন পাই। আশীর্ব্বাদ নিও এবং তোমার বৌদি ও রুণুকে দিও।—তোমার মা।

(২)

ইষ্ট ক্যানাল রোড,
বেলি লজ, দেরাদুন

শ্রীমান্ অম্বুজনাথ—কল্যাণবরেষু—

কাল আমাদের কুম্ভস্নান হয়ে গ্যাছে। [illegible] খবরের কাগজে অনেক কিছুরই খবর পেয়ে হয়ত আমাদের জন্য [illegible] ভাববে, তাই তাড়াতাড়ি চিঠি লিখছি। আমাদের কোন রকম কষ্ট বা অসুবিধা হয়নি; বরঞ্চ আশাতিরিক্ত সুযোগ এবং প্রচুর আনন্দই আমরা পেয়েছিলুম। এমনটা ঘটলো কিসের থেকে জানো? মোটর গাড়ীর টায়ার ফেটে। এটা শুনতে অবশ্য একটুখানি আশ্চর্য্য লাগবে। কিন্তু সত্যি তাই! তাও একবার নয়—দুখানা টায়ার দু'বারে যখন সেই বনের মধ্যে ফাটলো, তখন অন্ততঃ শেষবারেও আমাদের মনে হয়েছিল যে, আমাদের ভাগ্যে বুঝি কুম্ভস্নান এবং সন্ন্যাসীদের [illegible]ভাযাত্রা দেখা আর ঘটে উঠলো না। তা' গতিক হয়েছিল [illegible] বটে! ভোরের বেলা দেরাদুন হ'তে দুখানা মোটরে বার হয়ে আ[illegible]। পাহাড়ের পথে ৪৪ মাইল এসে হরিদ্বারে স্নান ক'রে আবার ঐ গাড়ীতেই দেরাদুন ফিরবো, এই আমাদের অভিপ্রায় ছিল। সেই মত কাযও

হয়েছিল, কিন্তু মাঝে হ'তে এই ব্যাপার! যাহোক শেষরক্ষা হল। পঙ্কুদের মোটর হরিদ্বার পৌঁছে যখন দেখলে আমরা আর পৌঁছবার নাম করচি নে, তখন তারা বুঝলে আমরা না হলেও আমাদের বাহনই সম্ভবতঃ বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি ধরে অনড় হয়েছেন। বীরু তাদের গাড়ী নিয়ে ফিরে এসে আমাদের যথাসম্ভব শীঘ্র উদ্ধার করলে। পথ অবশ্য পাহাড়ের পাথুরে পথ, টায়ার ফাটা কিছুই অসম্ভব নয়। এক্ষেত্রে কিন্তু ড্রাইভারের যথেষ্ট দোষ ছিল। সে ৯৬৲ টাকা ভাড়া নিয়েও পুরাণো টায়ার দিয়ে এনেছিল এবং সঙ্গে একখানির বেশী অতিরিক্ত টায়ার আনে নি।

এদিন আমাদের সহর দেখা বা ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করা অসম্ভব হবে ... করে, পঙ্কুর ব্যবস্থায় আমরা এর আগে আর এক দিন এসে সহর দেখে পরিতোষপূর্ব্বক ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে গেছলুম। সেদিন ভাসিও আমাদের সঙ্গে ছিল। সে এখন ফিরে গ্যাছে। সেদিন বড় চমৎকার লেগেছিল। মা গঙ্গার কি অপরূপ রূপ! চারিদিক দিয়ে বেধে ছেঁদেও তাঁর সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিকে শ্রীহীন করতে পারেনি। ওপারে ঘোর নীল রংয়ের পাহাড়। তার তলায় যে সুনিবিড় বন ছিল এখন তার বদলে নরমুণ্ড লহরী কলকল শব্দ করছে! শুনলুম বৈরাগী সাধু এবং নাগা সন্ন্যাসীর দলে আবহমান কাল থেকে একটা ভীষণ মারামারির প্রতিযোগিতা চলে আসচে। গত বারের কুম্ভে এই দাঙ্গায় ... যুদ্ধে বৈরাগীদের হার হওয়ায় এবার তারা সযত্নে সুসজ্জিত হয়ে এসেছে এবং বলেওছে নাকি যে, এইবারে কা'রা জেতে দেখা যাবে! তাই সরকার বাহাদুর এবার তাদের "চকা চকীর" মতন নদীর এ পারে ও পারে বাসা দিয়ে, কড়া

বিলাতি পাহারায় ঘিরে রেখেছেন।—উদ্দেশ্য কেউ কারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে না পারে।

সেদিন এখানের শ্রীমৎ ভোলাগিরির আশ্রমে গেছলুম। গঙ্গার ঠিক উপরেই প্রকাণ্ড স্থান। সমস্তটা ব্যেপে এখন স্থানে স্থানে ঝুপড়ি বাঁধা, আর চারিদিকে যেন অন্নপূর্ণার অন্নভাণ্ডার খুলে দেওয়া হয়েছে। অনাহুত রবাহুত যে কেউ আসচে, প্রসাদ পেয়ে যাচ্চে। ভোক্তৃদের মধ্যে অসংখ্য বাঙ্গালী স্ত্রী পুরুষই খাচ্চে দেখা গেল। আমাদের ওরা খাবার জন্য ডাকছিল, তাতেই বোঝা গেল এর জন্যে জানাশোনার দরকার নেই। দেখবার জিনিস বৈ কি একটা! মোহান্ত মহারাজদের সোণার ছাতায় মতির ঝালর, আর রূপার হাওদা হেলান দেওয়া ঘৃতপুষ্ট নধর দেহ দেখবার চেয়ে এ দেখায় তৃপ্তিও বেশী, ফলও অনেক! দরিদ্র এবং গৃহস্থ বাঙ্গালীর কুম্ভস্নান কি এমন সুলভ হতে পার্‌তো যদি না এই অন্নক্ষেত্রটী তাদের জন্যে এমন করে খুলে দেওয়া হতো? একেই তো যথার্থ হিন্দু মহাত্মা বলে! সে দিন যতটা সম্ভব হরিদ্বার দেখা হয়েছিল, তাই এদিনে শুধু কোন মতে স্নানটার জন্যেই ফের আসা।

ইচ্ছা হচ্ছিল তোমরা সবাই যদি আসতে! মা বাবা যখন হরিদ্বার আসেন, ফিরে গিয়ে, আমরা সঙ্গে ছিলাম না ব'লে দুঃখ করতেন। গত বৎসর মা দেরাদুন থেকেও সমানে আমাদের আসতে লিখতেন কেন, এখন সেটা বোঝা যাচ্ছে, এ রকম সব জায়গা একলা দেখে সুখ হয় না।

গঙ্গার দক্ষিণ তটে সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ হরিদ্বার প্রতিষ্ঠিত। হরিদ্বার ঠিক সেই স্থলে অবস্থিত, যেখান থেকে ভারতের সমতল ভূমির সমাপ্তি হয়ে হিমালয়ের পার্ব্বত্য ভূমি আরম্ভ হয়েছে। দুই ভাবের দুটী

বিশেষ শোভনীয় একত্র সমাবেশে এই স্থানটী বাস্তবিকই একটি অনির্ব্বচনীয় শোভার আধার হয়ে আছে। এক সুশীতল, সুনির্ম্মল, স্বচ্ছসলিলা জাহ্নবীদেবীর সুপবিত্র জলধারা। আর দ্বিতীয় মনোহর হরিদ্বর্ণ লতাকুঞ্জ পাদপাদি সমাচ্ছাদিত সুবিশাল পর্ব্বতমালা। এতদুভয়ের মধ্যস্থলে সুরম্য সুন্দর চিত্রাঙ্কিতবৎ হরিদ্বার পুরী বিরাজিত।— দেখে যেন চোখের আশা মেটেনা, এমনই সুদৃশ্য!

কুম্ভস্নান উপলক্ষে এই ক্ষুদ্র হরিদ্বার আজ বিরাট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে। পার্থ-সারথির সহসা বিশ্বরূপ পরিগ্রহ আর কি! হরিদ্বার হতে দেরাদুন পর্য্যন্ত প্রায় সারা রেলপথের দু'ধারে যাত্রীর ভিড় লেগে আছে। তিনটা ষ্টেশন অবধি তাঁবু ও ঝুপড়ী বাঁধা। শুনলুম ঐ সব ঝুপড়ীর দশটাকা করে ভাড়া। হরিদ্বারের গঙ্গার ও-পারে বন জঙ্গল কেটে পাহাড় উড়িয়ে দিয়ে বিস্তর জায়গা জমি বার করা হয়েছে। সেই সকল স্থানে লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসীর আস্তানা হয়েছিল। দু'বৎসর ধরে নাকি কুম্ভযোগের উদ্যোগ পর্ব্ব চলছিল। বিস্তর নূতন নূতন বাড়ী ও ধর্ম্মশালা তৈরী হয়েচে। দশ পনের লক্ষ লোক জমলেও স্থানের অকুলান পড়ে নি। ব্যবস্থা বন্দোবস্ত স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা যতদূর সম্ভব ভাল হতে হয়, তা হয়েছে। দোকান পশার হোটেল রেস্তরাঁ সরবতের আড্ডা অনেকই দেখলুম। কিন্তু এই সঙ্গে ১২৬০ সনের কুম্ভে "তীর্থ ভ্রমণের" লেখক ৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় যে রকম দোকান পশারের বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে তুলনা করলে সেই রেলপথ খোলার পূর্ব্বযুগে এ দেশে ব্যবসায়িক উন্নতি এর চাইতে কত যে বেশী ছিল তা দেখা যায়! অবশ্য এখন যেমন বিদেশী ছিটের বস্তা আর টিনের কাঁচের

সেলুলয়েডের গটাপার্চ্চার ফাঁকি জমেছে. সে সব ছিল না। কিন্তু দেশী জিনিষের দোকান তখন কত, আর এখন তার জায়গায় কটাই বা আছে! পাঁচ ছটার বেশী না। সত্তর বছর আগে—"তীর্থ ভ্রমণে"র লেখক লিখেছেন,—

"বাজার সাজাইবার কথা কি পর্য্যন্ত লিখিব? অগণিত দোকান, মনোহারী দোকানে নানাবিধ দ্রব্যাদিতে সুশোভিত, দিল্লীওয়ালাদিগের প্রায় পাঁচ শত দোকান। ইহা ভিন্ন দেশীলোকের মনোহারী দ্রব্যাদির দোকান আছে। শাল, দোশালা, জামিয়ার, রুমাল, রেজাই, চোগা, মোজা, দস্তানা, আলোয়ান ইত্যাদি পশমিনার টুপী, নানাবিধ বস্ত্র, কাশ্মীর, অমৃতসহর, নুরপুর, লুধিয়ানা, রামপুর ইত্যাদি প্রদেশের পশমিনার উত্তম উত্তম বস্ত্র সকলের প্রায় দুইশত দোকান। উলবস্ত্র, লুই, পঙ্খী, একতারি, চশমা, ওদা ইত্যাদি। বৃন্দাবনের এবং কাশ্মীর, অমৃতসহর, শিয়ালকোট পেশোয়ার, মুলতান, ছোট রামপুর ইত্যাদি সহরের মহাজন সকল পাহাড় হইতে উলবস্ত্রাদি আনাইয়া চারিশত দোকান লুই-পটিতে হইয়াছিল। নানাজাতীয় কম্বল আসিয়াছিল। পট্টবস্ত্রাদির দোকান এবং সূতার বস্ত্রাদির নানাদেশীয় দোকান পাঁচ শতের কম নহে। আর পিতল, কাঁসা, তামা, দস্তা, লোহার বাসন এবং অন্যান্য তৈজস পত্রের কম-বেশ একশত দোকান ছিল। রুদ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ, স্ফটিক, পদ্মবীজ, তুলসী বিল্ব পলার দোকান অগণিত। শ্বেত পাথরের থালা বাটী রেকাব হুকা ফরাশ সেজ চৌকী কৌচ কেদারা ইত্যাদি উত্তম উত্তম দ্রব্যসকল এবং নানাপ্রকার খেলনা দোকানে উত্তমরূপে সাজাইয়া শোভাযুক্ত করিয়াছে।...

"নানাজাতীয় মেওয়া কাবুল, কান্দাহার, কাশ্মীর হইতে মোগল উটের

উপর বোঝাই করিয়া আনে।......মসলা নানাজাতীয়। গুজরাট বোম্বাই ইত্যাদি দক্ষিণ পাটনের দ্রব্যসকল। এলাচ, লবঙ্গ, জায়ফল, পানফল ইত্যাদি...এই সকল দোকানে স্তূপাকার দ্রব্যাদি পাহাড়ের নিকট পাল তুলিয়া রাখিয়াছিল। এইসকল দ্রব্য অন্যদেশীয় সওদাগরে লইয়া যায়। পান তামাকের দোকান (এ গুলির অভাব এদিনেও দেখিলাম না) নানাস্থানে আছে। মৃত্তিকার, কাষ্ঠের, পিতলের, কাঁসার, দস্তার রূপদস্তার এবং নারিকেল ও পাথরের নানারকম হুঁকার দোকান ছিল।...তরিতরকারি পটল ভিন্ন সকল জিনিষ পাওয়া যায়।...আচারের দোকান শত শত ছিল।...এইরূপ মোরব্বাওয়ালাদিগের দোকানেও নানাদ্রব্যের মোরব্বা যে যেমত তাহাকে সেইমত রসে পাক করিয়া নানা রঙ্গের করিয়াছে।... মেঠাইওয়ালাদের দোকান। দোকানদার সকল লাহোর, লুধিয়ানা, অমৃতসহর, অম্বালা, জলন্ধর, দিল্লী, সাহারাণপুর, মিরাট, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন ইত্যাদি সহর এবং গ্রাম হইতে আসিয়া অসংখ্য দোকান খুলিয়াছে।

"হরপিড়ির ঘাটের পশ্চিম দিকে এবং দক্ষিণে পশারীদিগের দোকান, তাহাতে নানা মত বেনিতি দ্রব্যসকল। তিক্ত কটু, মধুর, অম্ল, কষায়, ও ক্ষার সকল রকম রস আছে। নানাজাতি ঔষধির জড়িবটি ফলমূল ছাল পাতা লতা মিঠ্যা পান মূল আরক বীজ ইত্যাদি চিকিৎসার দ্রব্য; তদ্ভিন্ন চামর চুয়া শ্বেতচন্দন রক্তচন্দন ধূপ ধুনা সিন্দুর মৌলি আর নানাজাতীয় মশলাতে দোকান সাজাইয়া সুশোভিত করিয়াছে। ডোমদিগের বাঁশের লাঠি ছড়ি, গঙ্গাজল বহিবার জন্য ছোট সাজির আকার টুকরির দোকান কতস্থানে হইয়াছে গণিয়া শেষ করা যায় না।...

টিন ও গালা লইয়া বাজারে পথে ঘাটে মাঠে দোকান করিয়া আছে।··· ফুকাশিশি ৺গঙ্গাজল লইবার জন্য কত শত দোকান হইতে বিক্রয় হইতেছে। সংখ্যা হয় না। আর ফুকা বেল লণ্ঠন গোলক গেলাস ভাঁড় বোতল ইত্যাদির বহুমত দোকান সাজাইয়া বিক্রয় করিতেছে। কাষ্ঠের বাক্স, সিন্ধুক, চৌকি কেদারা, টুল, ডেস্ক, খঞ্জা ইত্যাদি আর নানামত খেলনা দ্রব্যাদি দোকান সাজাইয়া সুশোভিত করিয়াছে।···"

এই বর্ণনাগুলি থেকে তখনকার দিনের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত যে সংবাদ পাওয়া যায়, তার সঙ্গে এখনকার তুলনা করলে দেখা যায়, আমাদের দেশের পশম-শিল্পটা কি নষ্টই না হয়ে গেছে! কোথায় এগার শত শাল দোশালা, লুই কাশ্মীরার দোকান আর আজ কোথায় বড় জোড় দু'তিনখানা মাত্র! সমস্ত সভ্যজগৎকে নও হয়ত এরা এই-সব কাপড় জোগাচ্ছিল! ভারতকে তো বটেই

মহাকুম্ভ ভোরের বেলা আরম্ভ হয়েছে। বৃহস্প কুম্ভরাশিস্থ হলে ঐ কুম্ভরাশিস্থ বৃহস্পতিতে মহাবিষুব সংক্রান্তির সন্ধ্যায় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানারম্ভ। ঐ সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ভীষণ একটা ধাক্কা হয় এবং প্রায় ৮৪ জন লোক নাকি হতাহত হয়েছিল। মরা যখন ভীম গোড়ার দিক দিয়ে ব্রহ্মকুণ্ডের অনতিদূরে পৌঁছিলুম, নও অ্যাম্বুলেন্স কারগুলো ছুটোছুটি করচে দেখলুম। ভগবানের য় আর কোনও ভয়াবহ দৃশ্য আমাদের দেখতে হয়নি।

ঐ যে প্রথমেই লিখেছিলেম, টায়ার ফাটার দৌলতে আমাদের কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি, এইবার সেই কথাটা বলচি। ঐসব হাঙ্গামায়

আমাদের এসে পৌঁছতে ঠিক সেই সময়টা হয়ে গেছলো যে সময়ে সাধুদের স্নানের জন্যে সমস্ত সাধারণ লোককে আটকে রেখে জলকে প্রায় জনশূন্য করে ফেলেছে, এবং এর জন্যে অত্যন্ত কড়া পাহারা মোতায়েন হয়েচে।—তবু ব্রহ্মকুণ্ডের পথে চলে কার সাধ্য!

আমরা অবশ্য যেতে খুবই ইচ্ছুক ছিলুম এবং মানুষ মরার খবরও কিছু পাইনি। কাশী থেকে একজন কনেষ্টবল এসেছিল, সে পঞ্চুকে চিনে বল্লে, "মহারাজ! এদিকে আর আসবেন না; লোক ছাড়া হচ্চে না; অথচ ভিড়ের মধ্যে পড়লে বেরুনোও দায় হবে।"

তখন পূর্ব্বের মতই বাহাল হল। অর্থাৎ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের আশা ছেড়ে দিয়ে আমরা তার যতটা কাছাকাছি পাওয়া গেল, এক প্রায়-জনশূন্য ঘাটে স্নান করতে নেমে পড়লুম। ব্রহ্মকুণ্ডের জল তখন জনশূ . চারিদিকে কড়া পাহারা। সন্ন্যাসীর দল আসন্নপ্রায়। শুন . ব্রহ্ম-কুণ্ডের উপরের চারতলা বাড়ীর কোন একটি জানালা . ইউ, পির লাটসাহেব নিজে উপস্থিত আছেন। সেই জন্যেই হয়ত জনতার উপর রক্ষীদলের ব্যবহার এতটা মোলায়েম। এতক্ষণে কারণটা বেশ বোঝা গেল!

পঞ্চুর চেষ্টায় আমরা জল দিয়ে গিয়ে ব্রহ্মকুণ্ডেই স্নান করে এসে মা গঙ্গার বাঁধা চাতালে চাকরদের এনে রাখা কাপ . চোপড় ছেড়ে জল খেয়ে সেইখানেই বসে রইলুম। ঠিক তার পাশেই . ড়াপুল। তারই উপর দিয়ে সাধুরা স্নানে আসবেন। আমাদের দেখাদেখি আরও অনেকেই এই পথ ধরে নিলে।

অল্প পরেই সাধুর দল দেখা দিলেন। পুলের উপর হাতী ঘোড়া

প্রভৃতি তো আর ওঠানো চলে না, কাযেই ছত্রধারীর হাতে বহা সোণার ছাতা মাথায় দিয়ে পায়ে হেঁটেই সর্ব্বপ্রথম যিনি দেখা দিলেন, লোকে বল্লে তিনিই নাকি কেদারের মোহান্ত। ঠিক জানি না তিনি কে, তবে একজন ধনী লোক বটেন! মাথায় স্বর্ণছত্র;—সঙ্গেও লোকলস্কর বিস্তর। তার পর ক্রমে ক্রমে অনেকেই সদলবলে পুল পার হয়ে এসে ব্রহ্মকুণ্ডে নেমে জলস্পর্শ ক'রে উপরে উঠে চলে যেতে লাগলেন। আখড়াধারী মোহান্তদের কারু পাল্কী রূপোয়, কারু সোণায় মোড়া। সোণা রূপোর আশাশোটা, চামর, ছাতা, আড়ানি সঙ্গে; কারু দশ হাজার, কারু দু' হাজার, কারু এক হাজার কারু দু'পাঁচ শো চেলা আছে। এঁদের মধ্যে কত সম্প্রদায়ই আছে! রামাৎ নিমাৎ বৈষ্ণব, গিরি পুরী ভারতী সন্ন্যাসী, অবধূত ব্রহ্মচারী দণ্ডী পরমহংস পরিব্রাজক গোস্বামী আখড়াধারী নির্ম্মলী নির্ব্বাণী মালাধারী বৈরাগী উদাসীন নাগা—আরও কত কি সব জানিও না। সবচেয়ে বড়দল দেখলুম নাগা এবং উদাসীন বা বৈরাগীদের। নাগারা একেবারেই উলঙ্গ, অনেকেই বেশ শান্তমূর্ত্তি, যথার্থ ত্যাগীর মতই মনে হতে লাগলো। যেন দীর্ঘাকার নির্ম্মল শিশুর দল চলেচে! সহসা মনে হ'ল এইত মানুষ! এত চাইবার মধ্যে থেকেও এদের তো একখণ্ড কৌপীনও চাইবার দরকার হচ্ছে না। আর আমরা দ্রৌপদীর বস্ত্রস্তূপে আবৃত থেকেও আরও চাই বলে অশান্তিতে অস্থির হয়ে মরছি কেন?

বাস্তবিকই মানুষের অভাব বড় কম। কিন্তু অভাবটা.ক আমরা নিজেরা ইচ্ছে সাধে তৈরি করে নিয়ে অস্বস্তি বোধ করতে ভালবাসি। একপেট খাওয়া আর দু'খানা কাপড় এই ত আমাদের দরকার।

আবার কেউ কেউ তাও চায় না। না জানি কত মহামহা তপঃসিদ্ধ পুরুষ ভক্ত সাধক সাধুসন্ত এই জনমণ্ডলীর মধ্যে আছেন, এই ভেবে তাঁদের উদ্দেশ্যে মনে মনে প্রণাম করলুম। সংখ্যায় এই নাগার দল অনেক। কেউ কেউ বল্লে এদেরই সংখ্যা প্রায় লাখ খানেকের কাছে। হতেও পারে। তবে এদের চাইতেও বড় দল ছিল বৈরাগীর। তারা সবাই প্রায় সশস্ত্র! মেয়ে সাধুনীদেরও বেশ পুষ্ট রকম একটা দল দেখা দিলে। হাতে গলায় রুদ্রাক্ষ ভদ্রাক্ষ তুলসী বা পদ্মবীজের মালা, এলো চুল, গেরুয়া পরা যেন মা কালীর সঙ্গের ডাকিনী যোগিনীদের মতন উর্দ্ধমুখে ছুটে চলেছেন। শান্তমূর্ত্তি সংযতভাব দেখতে পেলুম না ত! দেখে তেমন শ্রদ্ধা হল না। শঙ্করাচার্য্যের মতটাই হয়ত আমি বেশী মানি। বুদ্ধদেবের অত বড় ত্যাগের ধর্ম্মটাকে শ্রমণ শ্রমণীরা ভৈরবী চক্রের তলায় ফেলে কি কুৎসিত না করে তুল্লেন! আবার চৈতন্যদেবের প্রেমের ধর্ম্মে টেনে আনলে কি না শেষে নেড়ানেড়ী!—অবশ্য এর জন্যে এরাই যে দায়ী নয়, তা জানি। কিন্তু আমি 'অবলা' 'সরলা' 'অসহায়া' এসব শব্দ মেয়েদের পক্ষে ব্যবহার করি না। আমি ভাবি তারাই চণ্ডী, তাদেরই মধ্যে চণ্ডমুণ্ডনাশের মহাশক্তি নিহিত আছে। তারা তার অপব্যবহার না করতে দিলে, কার সাধ্য করে!—তোমাদের মেয়েদের তোমরা এই শিক্ষাই গোড়া থেকে দিও যে, নারী অবলা-জীব নয়।—নারীজন্ম অধম জন্ম নয়।—নারীশক্তি জগতের সর্ব্বশক্তির মূলীভূত আদ্যাশক্তি! তারা মা,—তারা জীবজননী! ছোট বেলা থেকে নিজেকে মা বলে চিনতে শিখলে সে মেয়ের মধ্যে মাতৃত্বটাই প্রবল হয়ে উঠবে, আর সে নিজেকে সখীভাবে দেখতে পারবেইনা। এটা খুব সত্য!

আমাদের দেশে—যেখানে নারীর মাতৃত্ব বিশেষভাবে সম্পূজিত হয়েছিল,—সেখানে মেয়েদের কচি বয়স থেকেই বুড়ো আত্মীয়রা—বাপ কাকা মেসো পিসেরা—সবাই মা বলে ডেকে, নিজেদের তাদের কাছে ছেলে করে তুলে, এই ভাবটাই অতি শৈশব থেকে তাদের মনের মধ্যে মুদ্রিত করে দিত। এ শিক্ষার মত বড় শিক্ষা নেই। শৈশবে বড় বড় 'ছেলে' পেলে ছোট মেয়েদের মনে কত গৌরব বোধই যে হয়, সে আমি খুবই জানি! আমাদের ছাপাখানার লোকেরা, বাড়ীর সরকার গোমস্তা এবং দাদাবাবুর প্রতিপাল্য অনেকেই আমায় ছেলে-বেলায় কেউ "মা" কেউ "মাসি" বলে ডেকে কত যে পাণ স্বপুরি আদায় করেচে তার হিসেব নেই। তাদের অসুখ করলে আমার মনে স্বস্তি থাকতো না। তার পর চিরদিনই দেখেচো তো আমি ছোট বড় কত লোকেরই মা!

তাই বলে কি মেয়েরা ধর্ম্মের পথে আসবে না? আসবে বৈ কি! এঁরা যদিই বা অমনি চলচেন, তো তাঁরা চলেছেন ছুটে! এ যেন বলা —"আগে চল্ আগে চল্ ভাই"!—পিছিয়ে পড়তে এযুগে কোন ছেলে মেয়েই অবশ্য রাজী নন, কিন্তু সে চঞ্চলতাটার উপর একটা আবরণ থাকা উচিত।

আর একটী জিনিষ এইখানে লক্ষ্য করবার আছে "তীর্থ ভ্রমণ" পুস্তকের লেখক ৭৪ বৎসর পূর্ব্বে যে কুম্ভ স্নানে উপস্থিত ছিলেন, তাতে তদানীন্তন এ দেশী রাজা মহারাজাদের কুম্ভস্নান সম্বন্ধে বর্ণনাগুলি তাঁর পুস্তক থেকে পাঠ করলে এ দেশীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের রুচি পরিবর্ত্তনের কি উজ্জ্বল চিত্রই চোখের উপর উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে! ভারতীয় ধর্ম্মপ্রাণ

উত্তরাখণ্ডের পত্র

স্বদেশীয় শিল্পিগণের আশ্রয়দাতা, দেব দ্বিজ ভক্ত, দরিদ্র নারায়ণের সেবাপরায়ণ হিন্দু রাজারা আজ বিলাত-প্রবাসী, পোলোক্রিকেট-বীর, বিলাতী-বিবি ঘটিত মোকদ্দমার আসামী, শ্বেতাঙ্গিনীবিবাহের খাতিরে নিজের দেশভূমি সিংহাসনে জলাঞ্জলিপ্রদানকারী। তাঁদের তীর্থ ধর্ম্ম সমস্তই এখন ইয়োরামেরিকায়! দান তাঁদের ধর্ম্মার্থ না হয়ে অধর্ম্মার্থই বেশী। সাহেব ভোজনেই তাঁদের ব্রাহ্মণ ভোজনের, কুটুম্ব ভোজনের ও কাঙ্গালী ভোজনের সমস্ত ফল প্রাপ্তি হয়ে থাকে! "তীর্থ ভ্রমণ" থেকে একটু তুলে দিচ্চি; তা'তে দেখো, রাজারা তখনও রাজার মতই চলতেন। তাতে এদেশের কতগুলি সুকুমার শিল্প পুষ্ট হতে পেতো সেটাও লক্ষ্য করো। এক সোণা রূপোর কারুকার্য্য, দুই মুলতানী বনাত,—তাতে কারচোবের কায, রেশমী কাপড়ে সোণার তারের কায (তারকুশীকার চোব) মুলতানী জোড়, শালের জোড়া। ... কা তক্তারাম চতুর্দ্দোলা এসবও মোটর ক্রুহামের স্থানে এদেশেই তৈরী হতো। তাতে এদেশী কারিগর অন্ন পেত। নিত্য নব সভ্যতার স্রোত আমাদের দেশকে যে কি ক'রে ধুয়ে মুছে সাবাড় করে দিচ্চে, এইটেই আমার সব কিছু থেকেই চোখে পড়ে যায়, এবং বুকের ভেতর কর্‌কর্‌ করে ওঠে। নূতনের সকল সৌন্দর্য্য ও উপকারিতা এর কাছে অসার ও শ্রীহীন মনে হয়। এই বাক্যটী মনে প'ড়ে।

"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়! মা প্রযচ্ছেশ্বরে ..."

"তীর্থভ্রমণ" গ্রন্থে আছে—

"প্রথমতঃ বিকানীরের রাজা স্নানে যাত্রা করিলেন। রাজার সমভ্যারে ত্রিশ হাজার লোক। প্রথমে ঘোড়ার উপর ডঙ্কা, তাহার পর

উটের উপর ডঙ্কা, তাহার পর লালনিশান দুইশত, তাহার পরে খাস গেলাস, ভাল ভাল মুলতানী বনাতে কারচোবের কর্ম্ম, তাহার পর দুইশত স্বর্ণ রূপার আশাশোটা, পঞ্চাশ রূপার ছড়ের বল্লম, পঁচিশ পঞ্জা, দশ ছত্র, অতি উত্তম রেশমী কাপড়ে সোণার তারে তারকুশী কারচোব, স্বর্ণের দাণ্ডি মুক্তার ঝালর এক ছত্র রাজার মস্তকে, আর তদ্রূপ এক আড়ানি, শ্বেতচামর, দুই পার্শ্বে দুই স্বর্ণদাণ্ডি, মোরছোল, তদ্রূপ ত্রিশ হস্তী সুসজ্জিত, পঁচিশ ঘোড়সওয়ার অস্ত্রধারী মায় বন্দুক রাজার অগ্রপশ্চাৎ আর দুই পার্শ্বে রক্ষার্থে আছে। কাপ্তেন ও ম্যাজিষ্টর সাহেব আপন পদাতিকগণ সমভ্যারে লইয়া অগ্রে অগ্রে লোকের ভিড় ঘুচাইয়া দিতেছে। এইরূপে গমন করিয়া সহরের পশ্চিম দিক হইয়া যে পথ দিয়া আর আর সকলে স্নানার্থে আসিয়াছিল, সেই পথ হইয়া রাজাকে স্নানজন্য আনিয়া হরপিড়ির ঘাটে স্নান করাইয়া, কুশার্ত্তের ঘাটে পিণ্ডদান করাইবার জন্য আনয়ন করিল। রাজা ঘাটে পৌছিয়া শ্রাদ্ধাদি করিলেন। নয় সের সোণার নয় পিণ্ডদান, এক হাতী মায় আসবাব, আর ভাল এক ঘোড়া, সুবর্ণের কড়া, মোতির মালা, হীরার অঙ্গুরী, শালের জোড়া, মুলতানী জোড়, পাগ দুপাট্টা, ৩ হাজার মোহর দক্ষিণা দিয়া আপন পাণ্ডাকে তাবৎ দ্রব্য দান করিয়া তক্তারামার উপর উঠিয়া যাত্রা করিলেন। রাণীগণ চতুর্দ্দোলে উঠিলেন। তক্তারামার ষোল দ্বার রূপায় নির্ম্মিত, স্বর্ণখচিত বস্ত্রাদিতে সুশোভিত। আর চতুর্দ্দোলে মুলতানী বনাতের উপর কারচোবের কাযকরা উত্তম ঘেরাটোপে ঘেরা; বাঁশে সোণার মুখ, উপরে সোণার কলস।...কঙ্খল যাইবার চৌরাহে পৌছিয়া তথা হইতে কাঙ্গালীদিগের জন্য সিকি আধুনি টাকা ফেলিতে ফেলিতে

কঙ্খল পর্য্যন্ত পৌছিল। এইমত ক্রমে রাজাদিগের স্নান দান কর্ম্ম সমাপন করাইতে প্রায় রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত হইল।"

ফেরবার পথে রাইবালা ষ্টেশন পার হয়েই আবার সেই মোটরটারই টায়ার ফাটলো। সে টায়ার ফাটা তো নয়, যেন একটা কামান দাগা! হৃষীকেশের নূতন লাইন তৈরি হয়ে এই ক'দিন থেকে ট্রেণ চলতে সুরু হয়েচে, কাছেই তার ইঞ্জিনীয়ারের অফিস ও বাংলো। টায়ার ফাটার ভীষণ শব্দে ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের দুটি ছোট ছোট মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এক হিন্দুস্থানী আয়া আমাদের দুর্দ্দশা দেখতে এল। দ্বিতীয় মোটর নিয়ে বীরু পঙ্কু এরা ফের হরিদ্বারে ফিরে গেল। এ গাড়ী এবার অচল হয়েছে, অন্য গাড়ী আন্‌তে হবে। আমরা পথের ধারেই দাঁড়িয়ে রইলুম। কিন্তু তাতেও কিছু বাধা বোধ হচ্ছিল, পথ সেদিন আর নির্জ্জন নয়। গাড়ী ও লোক যথেষ্ট চলাচল করচে।

হরিদ্বার থেকে দেরাদুন পর্য্যন্ত এই যে পথটী আমরা এসেছিলুম, এর দৃশ্য ভারী চমৎকার! এর কোথাও ঝোঁপঝাপ, কোথাও ঘন বন, কোথাও আকাশে মাথাঠেকা দেবদারু, বাঁশ এবং অসংখ্য জাতীয় গাছ পালা, কোথাও তাদের জড়িয়ে ধরে ফুলের গুচ্ছে ভরিয়ে দিয়ে গোলাপ লতা, মল্লিকা লতা, আরও কত অজানা লতা বন আলো করে রয়েছে। ঝরণা পাহাড় থেকে ঝ'রে প'ড়ে কোথাও একটু চওড়া কোথাও খুব সরু, কোথাও আঁকা কোথাও বাঁকা ভাবে বয়ে গ্যাছে। বালি ও ছোট বড় নোড়ায় ভর্ত্তি করা নদীর জলহীন গর্ভ মধ্যে মধ্যে আছেই! সেগুলোর কোন কোনটায় একটু একটু জলও ঝির্ ঝির্ করে বয়ে যাচ্চে। দু-একটায় আমাদের নেমে নেমে পাথরের উপর দিয়ে দিয়ে

পার হ'তে হলো। একটায় ছোট ছোট মাছ কিলবিল করচে দেখলুম।

ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের বাংলোর কাছে আমাদের রথচক্র যখন অচল হল, তখন আমাদের সঙ্গী সেজদা' (পঙ্কুর সেজ ভগ্নীপতি—তিনি মানুষটী বেশ জোগাড়ে আছেন) চট্ করে গিয়ে মেম সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে ফেল্লেন। মেমটী সব শুনে বল্লে, "তা' ওঁরা আমার এখানে এসে বসুন না —দরকার হয় মস্ত বাড়ী, অফিস বাড়ীতে আমরা ব্যবস্থা করে দেবো, একরাত্রি থেকে যেতেও পারেন।"

শুনে একটু আশ্চর্য্য বোধ হয়েছিল, তারপর আলাপ হতেই সেটুকু দূর হয়ে গেল। এঁরা বিলাত থেকে এই কাযের জন্য তিন বৎসরমাত্র এসেছেন, এসে পর্য্যন্তই এই বিজনবাসী। তাঁদের "এংলোইণ্ডিয়ান সোসাইটী"তে ভাল করে মেশামেশির সুযোগ ত পাননি, তাই 'নেটিভ'দের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয়, সেটা ঠিক জানেন না আর কি! মানুষের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করা সঙ্গত, সেইটেই শুধু জানা আছে।

মেমটী তা ছাড়া মোটের উপর লোকও ভাল। আমাদের সঙ্গে খুবই ভদ্রতা করলেন। কি চাই না চাই, জিজ্ঞাসাটা বারে বারেই করলেন। কোথায় থাকি, কোথা থেকে কোথা যাচ্চি, তাঁর স্বামীর তৈরি রেলে হৃষীকেশ যাব কি না, ইত্যাদি অনেক খবরবার্ত্তাই নিলেন।

মেয়ে দুটীর মধ্যে একটী বছর পাঁচেকের। তার নাম [illegible]। মেয়েটী বেশ মিশুক। সে তার ছোট বোনের সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ উপস্থাপিত করলে। সে নাকি বলে 'আমি তোমায় কামড়ে দেবো', বলেই সঙ্গে

সঙ্গে অমনি খুব জোরে কামড়ায়। যখন কাঁদে, চোক বুজে চেঁচায়। বাবা এসে ডাকলেই কিন্তু চুপ করে। আমাকে খুব মারে, Joy কিন্তু মারে না। আরও অনেক কথা। মেয়েটি তার মাকেও ঢের প্রশ্ন করছিল। তিন বৎসর তারা এখানে এসেছে, তিন বৎসরে কত হপ্তা, সবশুদ্ধ কত দিন ইত্যাদি।—মা বল্লেন, "জয়ের এই সব প্রশ্নোত্তর করতে করতে আমি হায়রাণ হয়ে যাই।"

রুণুকে মনে পড়েছিল। বয়সে তফাৎ থাকলেও রুণু মাথায় প্রায় অত বড়ই। আর কথায়ও বড় কম যায় না!

মেমটীর আর সবই ভাল, শুধু ঐ যে সর্ব্বনেশে হালফ্যাসানে ওদের মাথা মুড়িয়ে দিয়েছে, ঐতেই মাথা খেয়েছে! আমাদের দেশে একদিন "হাঁটু ঢেকে বস্ত্র' কথাটার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই জিনিষটার কিঞ্চিৎ অভাব ছিল বলেই তো! ওদের দেশের উৎপন্ন বস্ত্রে পৃথিবী শুদ্ধর অভাবের অতিরিক্ত যদিচ আজ যোগাচ্চে, তথাপি ভাগ্য ওদের জন্যে হয়ত চক্রান্ত করেই ওদের মনে এম্‌নি রুচিটা এনে দিয়ে ওদের এই বস্ত্রাভাবটা ঘটিয়ে তুলে পৃথিবীর হাস্যাস্পদ করে তুলেছে। আমাদের দেশে গরীবের মেয়েরা অনেক সময় ঘরের মধ্যে গামছা পরেও খানিকটা কাপড় বাঁচায়, এদেরও সেই গামছা পরার মতই দুর্দ্দশা।* একেই বলে কপাল।

তিনখানা মোটরে একসঙ্গেই আবার বার হওয়া গেল। সমাগতপ্রায়

---

* সম্প্রতি আশ্বিন সংখ্যা ভারতবর্ষে পরশুরাম লিখিত "স্বয়ম্বরায়" দেড় হাতি বাঁদিপোতার গামছার সঙ্গে মেমেদের স্কার্টের উপমা দেখিয়া অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়াছি!

—লেখিকা

সন্ধ্যায় সেই বিজন অরণ্যপথে লোক অর্থাৎ যাত্রী চলাচল প্রায় শেষ হয়েই গেছলো। কদাচিৎ একখানা লরি বা মোটর তখনও হয়ত হুস হাস ক'রে খানিকটা ধূলো উড়িয়ে দিয়ে উড়ে গেল। আমরাও চল্লুম। নীরব নির্জ্জন বনপথ; চারিদিকের পাহাড়, বন, ঝরণার ক্ষীণধারা, বেতসবন, অসংখ্য নুড়ির স্তূপ, মৃদু জ্যোৎস্নায় অদূরস্থ ধূসর পর্ব্বতমালা যেন অনির্ব্বচনীয় শান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করেছিল। আমাদের গাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে দুটো বড় বড় জানোয়ার ছুটে চলে গেল। কেউ বল্লে হরিণ, কেউ বল্লে বাঘ। হয়ত আর কিছুও হতে পারে। এত জোরে দৌড়ে গেল যে ভাল করে বোঝাই গেল না। সকালবেলায় এই পথে কত রকম পাখীর গান, বানরের ছুটোছুটি দেখা শোনা গেছলো, এখন তারা সব সুপ্তিমগ্ন। চাঁদের আলোয় ক্রমে ক্রমে সমস্ত বনভূমি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠলো। পাহাড়গুলোর মাথায় যেন রূপার আভা ছড়িয়ে পড়লো, নদীর বালি ঝরণার জল, সব রৌপ্যময়! মাঝে মাঝে জোর বাতাসে যেন কি সব অচেনা ফুলের গন্ধ ভেসে উঠ্‌ছিল।

বাড়ী পৌঁছতে রাত প্রায় সাড়ে আটটা হল। পর দিন হরিদ্বার ফেরৎ কারু কারু কাছে শোনা গেল, কাল ভিড়ের চাপে ৮৪ জন লোক মরেছে। তাছাড়া একটা পুল ভেঙ্গে পড়ে অনেক লোক মারা গেছে, ১১৯ জনের মৃতদেহ নাকি পাওয়া গেছে। কিছু ভেসে যাওয়াও তো অসম্ভব নয়! ঐ অত প্রবল স্রোত রয়েছে জলে।

ট্রেণেও নাকি ঐ দিনের চাপাচাপিতে দু' চার জন মরেচে। তবু ষ্টেসনে খুব সতর্কতা ও সুবন্দোবস্ত শোনা যাচ্ছে। প্রথম দিন আমরা যখন ট্রেণে যাই, তাতে সেটা দেখেও ছিলেম।

তুমি কবে মজঃফরপুরে আসচো? চিঠিপত্র শীঘ্র শীঘ্র লিখ।—তোমার মা।

ইষ্ট ক্যানাল রোড,
দেরাদুন।

(৩)

শ্রীমান্ অশোকনাথ—কল্যাণীয়েষু—

মসুরীতে আমরা বেশী দিন থাকিনি, এসেছিও মোটে জন দুয়েক লোক। ওরা সবাই আগে এসেছিল, তাছাড়া দেরাদুনে গরম পড়লে দিনকতক এখানে এসে থাকবে এ ইচ্ছাও আছে। আমি সে[illegible]ও থাকবো না, তাই একটু বেড়িয়ে যাব বলে এসেছি।

দেরাদুন থেকে রাজপুর রোড দিয়ে মোটরে বা টোঙ্গায় মসুরী পাহাড়ের তলায় রাজপুরে যেতে হয়। এই পথটা প্রায় মাইল সাতেক হবে। রাজপুর থেকেই মসুরী পাহাড়ের চড়াই আরম্ভ। আট মাইল চড়াই উঠে তবে মসুরীতে পৌঁছানো যায়। রাজপুর রোড রাস্তায় এর আগেও মধ্যে মধ্যে আমরা বেড়াতে এসেছি। রাস্তাটী বেশ চওড়া, দু'ধারে সমানেই প্রায় বড় বড় বাগান আর তার ভিতরে ভিতরে বাংলো ফ্যাশনের বাড়ী। এর বেশীর ভাগই সাহেবদের। তবে দেশী লোকের বাড়ী যে এর মধ্যে একেবারেই নেই, এমন কথা বলি না। দু' একখানায় আমরাই বেড়াতে গেছি। তার মধ্যে একটী অধ্যাপক ডাঃ

উত্তরাখণ্ডের পত্র

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের। রাস্তাটার দু'ধারেই প্রায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইউক্যালিপ্‌টস গাছ—যেন এ রাস্তার প্রহরীর মত আকাশের দিকে সগর্ব্বে মাথা খাড়া করে পাহারা দিচ্চে। জায়গায় জায়গায় ঝাউ, দেবদারু, সেই রকম অস্বাভাবিক মোটাসোটা বাঁশের ঝাড় এবং পাকা কমলারংয়ের লুকাটে ভরা গাছ যথেষ্ট পরিমাণে রয়েচে। লালফুলে ভরা এক রকমের গাছ দু'একটা দেখতে পাওয়া গেল, তার ফুলগুলো একহারা জবা অথবা হেলিও ফুলের ধরণেরই, কিন্তু একত্র একটা মস্ত থোকা হয়ে আছে। তার প্রত্যেক গুচ্ছে ষোল সতেরটা করে ফুল। যেখানে আছে যেন পথ আলো করে আছে। নাম কি জানিনে, কিন্তু এর 'পথের আলো' নাম দেওয়াই উচিত!

রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা এই রাজপুর রোডের ধারে রয়েচে দেখতে পেলুম। দুটি মন্দির দেখা গেল। চারিদিকের উচ্চ পর্ব্বতরাজি তরঙ্গায়িত সুদৃঢ় দুর্গ প্রাচীরের মত শোভা পাচ্চে। দেশটি যেন তাদের দ্বারা সুরক্ষিত একটি দুর্গ!

রাজপুরে কতকগুলি হোটেল আছে। সেই সব হোটেলে মসুরী যাত্রীরা ইচ্ছা হলে আহার ও বিশ্রামলাভও করতে পারেন, আর সেখান থেকেই মসুরী যাবার ডাণ্ডি কুলি প্রভৃতিরও বন্দোবস্ত করা যায়। আমরা পাঁচখানা ডাণ্ডি নিলুম। পশুপতি ঘোড়ায় চড়ে চল্লো। এদের 'ক্যালিডোনিয়া' 'ইম্পিরিয়াল' আরও ক'টার কি নাম ভুলে গেছি। আমরা অবশ্য বুঝতেই পারচো হোটেলের যাত্রী নই।

পাহাড়ে ওঠবার ঐ দুই ব্যবস্থাই আছে—ডাণ্ডি এবং ঘোড়া। ঢের লোকে হেঁটেও উঠচে—বিশেষতঃ সাহেব এবং মেমেরা। ওদের শরীরে

বল, মনে স্ফূর্ত্তি দুইই যথেষ্ট! কাযেই ওদের কাছে এই আট মাইলের চড়াই আর কতটুকু? তবে আমাদের মত অন্নগত প্রাণ বাঙ্গালী মেয়েদের পক্ষে ঐ চড়াই ওঠা সহজ নয়! তোমাদের মাস্তদিদি নামবার দিন বাহাদুরী করে' হেঁটে নেমেছিল বটে, কিন্তু সে নেমে যা অবস্থা হয়েছিল, তাতে নামার গৌরব আর বজায় থাকে নি। ডাণ্ডিওয়ালা কুলিগুলো তেমন লোক ভাল না। দুবার আমায় নামিয়ে রেখে দুটো কুলী পালিয়ে গেল। শেষকালে সেজদা এজেণ্টকে ডাকিয়ে খুব রাগ করতে, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এজেণ্টের লোক সব ব্যবস্থা করে দিয়ে গেল। পথে আর কেউ কোন অসুবিধেয় ফেলেনি। মধ্যে মধ্যে ঘাড়ের বোঝা নামিয়ে তামাক না খেলে ওরা পারে না, আর তা' পারবেই বা কি করে? একে চড়াই ওঠা, তাও এই ভারি বোঝা ঘাড়ে, তার উপর সের দশেকের কাছাকাছি গরম কাপড় জড়ানো এবং এর উপরে ডাণ্ডিখানার ভারও বড় কম হবে না। পলকা কাঠের হালকা জিনিষ নয়, বেশ মজবুত ও ভারিভুরী। শিশু কাঠের বা সেগুন কাঠের একখানা ইজি চেয়ারের মত ভার হবে।

মসুরী পাহাড়ে উঠতে হলে প্রত্যেক লোককে ১৷৹ হিসাবে 'টোল' দিতে হয়। নামবার সময় হয় না। কিন্তু যদি নীচে থেকে ডাণ্ডি আনানো হয় তা হলে ফের আর একটা 'টোল' লাগে; কিন্তু উপরে যদি ফিরতি ডাণ্ডি পাওয়া যায়, তা হলে ওটা আর লাগে না। আমারা অবশ্য অত জানতুম না, তাই নীচে থেকে ডাণ্ডি আনার ব্যবস্থাই করেছিলুম।

'হাফওয়ে-হাউস' নাম দিয়ে অর্দ্ধপথে বিশ্রামের জন্যে একটী ছোট হোটেলগোছ আছে। কুলিরা সেইখানে জলখাবারের পয়সা চেয়ে তারই

ব্যবস্থায় আমাদের ডাণ্ডি নামিয়ে দিলে। সেজদা নিজে লেমনেড না কি খেয়ে আমাদেরও অনুরোধ করলেন। আমাদের সঙ্গে যা' ছিল, তাইতেই আমাদের চলে গেল।

মসুরীর এই রাস্তাটী বেশ চওড়া। ঘুরিয়ে বাঁকিয়ে যতটা সম্ভব খাড়া চড়াইকে সহজ করতে চেষ্টা করা হয়েচে। এই পাহাড়টার খাড়াই দারজিলিং প্রভৃতির চাইতে নাকি বেশী। এতে ট্রামের রাস্তা দু'বার করা হয়েছিল, শেষ চেষ্টার সমস্ত সাজ সরঞ্জাম এখনও এর গায়ের উপর জড়ো হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু চেষ্টা সফল হয়নি। মোটর খানিক দূর পর্য্যন্ত উঠ্‌তে পারে, কিন্তু সবটা পারে না। আর যতটা পারে, সেও এ রাস্তায় নয়, সেটা আর একটা রাস্তা তৈরি হচ্ছিল, কেন হয়নি জানি না। তবে চেষ্টার যে ত্রুটি হচ্চে না, তা' বলাই বাহুল্য। কেন না প্রত্যেক হিল ষ্টেশনেই দেশী লোকের চেয়ে সাহেবলোকেরই আধিপত্য এবং প্রয়োজনীয়তাও তাঁদের খুব বেশী। তাঁদের সুবিধার জন্যে ভারতের রত্নাকর সর্ব্বদাই তার আকর খালি করে রত্ন জোগাতে প্রস্তুত।

নেপালরাজের এক প্রকাণ্ড প্রাসাদ পথে থেকে দেখতে পেলুম। মস্ত বড় বাড়ী পাহাড়ের গায়ে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। মিশনরীদের স্কুলটাও কিছু কম বড় নয়। সেদিন শনিবার, ও সকাল সকাল স্কুল বন্ধ হয়েছে। দলে দলে ইউরোপীয় এবং ইউরেশীয় ছেলেরা উপরে নীচে নামা ওঠা করচে। স্বাস্থ্যের আভায় গালগুলোয় তাদের যেন আপেল পেকে আছে, ডালিম ফেটে পড়চে!

তোমায় বারে বারেই মনে পড়ছিল। তুমিও হয়ত এই সময়ে স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে আসচো। এদের মতন গরমের সুট পরবার দরকার

তোমার মোটেই নেই, খাকি সার্ট ও প্যান্ট পরেই গ্যাছো হয়ত !—তবে গাল দুটীতে অমন স্বাস্থ্যের লালিমা তো ফেটে পড়তে পায়নি ! ঐখানেই যে এদের সঙ্গে তোমাদের মস্ত বড় তফাৎ। এরা ওই রাঙ্গা গালের তাজা রক্তের তেজে বিশ্ব জয় করতে কোন্ অজানা রাজ্যে উধাও হয়ে ছুটে যাবে,—আর তোমরা !

নাঃ—তাই বা কেন ? তোমাদেরও আর কোণের মধ্যে জড় হয়ে বসে থাকবার দিন নেই—'উত্তিষ্ঠত ! জাগ্রত' !—বলে তোমাদেরও আজ ডাক পড়ে গ্যাছে। উঠতেই হবে আবার ! জাগতেও হবে ভাল করে। কেমন ! পারবে ত ? স্বাস্থ্য, জীবন ও জয় এই জাগ্রত দিনের পুরস্কার। এ যে তোমাদের নিতেই হবে।

ল্যাণ্ডোর বাজারটা দেখে কিছু বিস্ময় বোধ হ'ল। এই পাহাড়ের উপর নেই এমন জিনিষের দোকানই নেই ! মায় কারপেন্টারীর সমুদয় জমকালো যা কিছু। বড় বড় খাড়া আয়নাওয়ালা ৭॥ ফুট লম্বা আলমারি পর্য্যন্ত।

তরকারির বাজার দেরাদুনের চাইতে ঢের বড়। ষ্ট্রে' থেকে সমস্ত রকম ফল ও শাক-সব্জী আছে। পটলটা বাদ—ত মাদ্রাজের আমটী তো বাদ পড়ে নি ! গরম কাপড় ও সূতী সূ কাপড় কিছু কিনলুম, আমাদের ওখানে দাম এর চেয়ে ঢের বেশী প।

আমরা যেখানে বাসা নিলুম, তার সঙ্গে একটী বড় দেবালয় আছে। বাড়ীতে কল, ইলেক্‌ট্রিক বন্দোবস্ত ভালই। ঘরগুলিও নেহাৎ ছোট নয়। নেয়ারের খাট চেয়ার টেবিল আল্‌না এ সবও কিছু কিছু ছিল।

একটু জিরিয়ে, খাওয়া দাওয়া করে' আমরা গোছগাছ হয়ে প্রথমেই

উত্তরাখণ্ডের পত্র

লালটিব্বাতে যাবার জন্যে ডাণ্ডি ভাড়া করলুম। দেরাদুনেই শুনেছিলুম, লালটিব্বার উপর থেকে কেদারনাথ ও [illegible]নাথের পাহাড় এবং গঙ্গোত্তরী দেখা যায়। লালটিব্বা [illegible] সব চেয়ে উঁচু চুড়ো। সেখানেই ক্যাণ্টনমেণ্ট।

আমরা অত কষ্ট ও খরচা করে এলাম বটে, কিন্তু কিছুই কায হলো না। দেখতে দেখতে হঠাৎ মেঘে ও কোয়াসায় সমস্ত পাহাড়গুলিকে কে যেন তার সাদা সাড়ীর আঁচল চাপা দিয়ে লুকিয়ে দিলে। ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট—আর সমস্ত ঝাপ্‌সা হয়ে গেল। তার তলায় কি যে আছে, ভাল করে তা' দেখাই গেল না। মনে হলো আমাদের এই উচ্চতর পর্ব্বতাশ্রয়ের চারিপাশেই যেন ধূসর বর্ণের অসীম সমুদ্র, মাঝখানে এই একটী ছোট্ট দ্বীপের মধ্যে আমরা ক'জনে কোন মতে এসে পৌছেছি। এখান থেকে বেরুবার পথ নেই!

ক্যাণ্টনমেণ্টের বাড়ীগুলি উপরে নীচে, উপরে নীচে করে' থাকবন্দী ভাবে সাজানো। তার মধ্যে থেকে কোথাও পিয়ানো বাজার শব্দ, কোথাও হাসি চীৎকার গান শোনা যাচ্ছিল। সাহেবদের দু'একটি ছোট ছেলে আমাদের কাছ দিয়ে চাইতে চাইতে যাচ্ছিল—ডেকে একথা সেকথা জিজ্ঞাসা করে নিলুম।

মসুরী পাহাড় জায়গাটি নেহাৎ ছোট্ট নয়—বেশ লম্বা সহর। যতদূর চোখ যায়, বাড়ীর অন্ত নেই। আশে পাশে উপরে নীচে সর্ব্বত্রই ছোট বড় বাড়ী বাগান রাস্তা পথ চলেইছে। ম্যালে দু'সারি দোকান,—কলকাতার চৌরঙ্গীকে মনে পড়িয়ে দেয়। কোম্পানীর বাগান, লাইব্রেরী বেশ দেখবার মত। ঈডেন গার্ডেনের মত কোম্পানীর বাগানে ব্যাণ্ড

বাজ্‌ছিল। "ক্যামেল্‌স্‌ ব্যাক রোড" রাস্তা থেকে সকালে সূর্য্যোদয় ভারী চমৎকার দেখতে। প্রাতঃসূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণে অনেক দূরের পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। দূরে—বহুদূরে তুষারগিরির অস্পষ্ট একটা সমুজ্জ্বলতর শুভ্রতা দেখতে পাওয়া গেল। কালো পাহাড়ের পাশে পাশে যেন খানিক খানিক রূপার পাত পাতা রয়েচে বোধ হলো।

যা কিছু দেখছি, তোমাদের জন্যে মন কেমন করছে। রাত্রে খুব শীত ছিল। দুখানা র‍্যাগ ও গরম জামা পরে' শুয়েও শীতে ঘুম হয়নি। ভোরের দিকে উঠে আর একটা গরম জামা পরতে হলো। ওখানে এখন রাত্রে হয়ত গায়ে কিছু দিতেই হয় না? মর্ণিংস্কুল,—ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিচ্চে কে? রুণু না বৌদিদি?—তোমার মা।

(৪)

শ্রীযুক্ত শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।—

বদরী না যাওয়া স্থির করে বীরুর সঙ্গে হৃষীকেশ ও লছমনঝোলার এপারে মুনিকারেতি পর্য্যন্ত একদিন বেড়িয়ে এসেছি, কিন্তু সেই দেখেই মুগ্ধ হয়ে এসেছি। এমন অনায়াসলভ্য সুবর্ণসুযোগ ত্যাগ করা চলে না! ওরা যখন যাচ্চে, তখন আমিও চলে যাই? কি বল? কষ্ট হবে? ওরা যদি সইতে পারে, আমিই বা না পারবো কেন? দূর পথ, অনেক দিন সকলকে ছেড়ে থাকতে হবে, হয়ত সব সময় খবরও পাবো না, এই জন্যেই যা একটু ভাবনা হচ্চে। তা আর কি করা যাবে, ও-ও সয়ে নিতে হবে। কথায় বলে 'কষ্ট না করলে কৃষ্ণ মেলে না'। বদরীনাথ দর্শনও

কি আর কষ্ট স্বীকার না করেই পেয়ে যাব? অত... ওয়াই স্থির। তোমার টেলিগ্রাম পেয়েছি, গবর্ণমেণ্ট কমিউনি... ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে বেরিয়েছিল, সেও দেখেছি। পাণ্ডাজী, যিনি আমাদে... নিয়ে যাচ্ছেন, বল্লেন, আমরা পৌঁছবার আগে ও বরফের চাপা আটটা ভাঙ্গা পুল জোড়া লেগে যাবে। এদিকের পথঘাট সর্ব্বদাই এসময় মেরামত করা হয়। এর জন্যে ইঞ্জিনীয়ার, ওভারসিয়ার ও প্রত্যেক মাইলে ষোল জন করে কুলি সর্ব্বদা মোতায়েন থাকে—অবশ্য এই সময়ের জন্যে। আমাদের অতদূরে পৌঁছতেও তো মাসখানেক লাগবে। পুল যেখানে ভেঙ্গেচে, সে বদরী থেকে মাইল পনেরর মধ্যে। প্রায় প্রতি বছরই ভাঙ্গে।

এখানের বাঙ্গালীরা আমায় কাল তাঁদের লাইব্রেরীতে নিয়ে গিয়ে একটু খাতির যত্ন দেখালেন। শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষ মহাশয় সভাপতি এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন, তোমার বন্ধু বি, এল, মিত্রের দাদা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি অনেকে এবং এখানের সমস্ত বাঙ্গালী পুরুষ আর মেয়েরা উপস্থিত ছিলেন। মহেন্দ্রবাবু আমায় একটী সংস্কৃত অভিভাষণ দিলেন। লাইব্রেরীর সম্পাদক বিমলাবাবু খুব সুন্দর ব্যবস্থা করেছিলেন।

এ চিঠিখানা পাঠান হয়নি। কাল ২৬।৪।২৭ মঙ্গলবার আমরা হৃষীকেশে এসেছি। আজ বৈকালে অথবা কাল ভোরে লছমনঝোলা রওনা হব। যাওয়াই স্থির করলুম। *এ সুযোগ ছেড়ে গেলে আর কি এ জীবনে ফিরে পাব?*

এ এক অপূর্ব্ব স্থান! পূর্ব্বেই হয়ত লিখেছি, দেরাদূন আমার তত ভাল লাগেনি,—দেওঘর হাজারিবাগেরই সংস্কৃত সংস্করণ মাত্র। হরিদ্বার

ও হৃষীকেশ একজাতীয় হলেও হৃষীকেশ সরেস তো নীরেস নয়! মা গঙ্গার রূপ এখানে অনির্ব্বচনীয়! 'ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে'—দর্শকের সমস্ত মনপ্রাণ যেন লুটিয়ে পড়তে চায়। অন্তরের সঙ্গেই বলতে ইচ্ছে করে, 'তব নহি দূরে নৃপতিকুলীনঃ'—। কল কল গদ গদ কি অফুরন্ত গম্ভীর শব্দলহরী! ফেনশুভ্র তরঙ্গরাজির কি উদ্দাম লীলারঙ্গ! মেঘধূসর, সুবিশাল পর্ব্বতমালার অঙ্কশয্যায় দুহিতারূপিণী এই বাল-তরঙ্গিণীকে যিনি এঁর স্নেহের দুলাল কন্যারূপে কল্পনা করে গিয়েছেন, তিনি যথার্থ দর্শক বটেন! এ কল্পনা যার তার পক্ষে সম্ভবে না। এই সব প্রত্যক্ষদর্শীদের যে ঋষি বলা হয় সে ঠিকই!

ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে পূজার বন্ধে এসে যদি তোমরা দেখে যাও তবেই আমার এ ক্ষোভ দূর হবে।

রাজবাড়ীর মত প্রকাণ্ড নূতন ও সুপরিচ্ছন্ন ধর্ম্মশালাগুলিতে যাত্রীদের খুবই সুখ ও সুবিধার ব্যবস্থা আছে। পরিষ্কার রাখার বন্দোবস্ত খুব ভাল। শুধু লিখে দিয়ে যেতে হয় যে কর্ম্মচারীদের ব্যবহার ভাল, কোনরূপ অসুবিধা হয়নি। তা সত্যই অসুবিধা হয় না,—ভদ্রলোক সকলেই। এখানে কালী-কম্‌লীর ধর্ম্মশালা ও সদাব্রত আছে। বদরী পথের যাত্রী যে সব সাধুসন্ন্যাসী সদাব্রতে খেতে চায়, এইখান থেকে পাস জোগাড় করতে হয়, তা হলে বদরীনাথের সমুদয় বড় বড় জায়গায় তারা কালী-কম্‌লীর সদাব্রতে স্থান ও আহার পেয়ে থাকে। এই কালীকম্‌লী একজন কালো কম্বল পরা গরীব সাধু ছিলেন। পথের যাত্রীদের দুঃখ দূর করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টায় ধনকুবের শেঠদের ধরে ধরে বিস্তর টাকা আদায় করে' এখন অনেক সুবিধা করে' দিয়েছেন। সমস্ত বদরী পথেই কালী-

কম্‌লীর সদাব্রত ও ধর্ম্মশালা আছে শুনলুম। ধর্ম্মশালা এখানে আরও অনেক শেঠ-নামধারী ধনীদের তৈরি করা আছে। তীর্থের উন্নতি সাধুসেবা এ সব মাড়োয়ারীরা খুবই করে থাকেন। ধনকুবের শ্রেষ্ঠীদের তীর্থস্থানের এই সকল কীর্ত্তি দেখলে তাদের পরে অনেকটা শ্রদ্ধা হয়। কতজনের কত পূণ্যকীর্ত্তি লোকহিতের জন্য তৈরি রয়েছে সবার নামও সব সময় জানা যায় না। এ দেখে গীতার সেই প্রসিদ্ধ শ্লোকটী মনে পড়ে—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ।

কিন্তু এই টাকাটা বিদেশী জিনিষ দেশের লোককে বিক্রি করে সংগ্রহ করা এই কথাটা মনে হলে মন যেন মুস্‌ড়ে প...

রাইওয়ালা ষ্টেশন থেকে হৃষীকেশ রোড (লাইট ... ...য়ে) নাম দিয়ে যে ছোট রেলপথ হয়েচে, তাইতে এসে মাইলটাক আমরা হেঁটেই এলুম। (এর আগে বীরুর সঙ্গে যেদিন একা আসি, সেদিন দুজনে ট্রেণে না এসে টোঙ্গায় হৃষীকেশ ও লছমনঝোলার কাছাকাছি পাহাড়ের তলা পর্য্যন্ত এসেছিলুম।) রাইওয়ালায় সবাই ওজন হওয়া গেল। এ ব্যবস্থাটা বীরুর। সে বল্লে কে কতটা কমে আসেন, দেখতে হবে।

এই হৃষীকেশ রোডটী যেন সমস্ত ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি। এর কোনখানে কর্কশ কঠিন পার্ব্বত্যভূমি, কোথাও সুজলা শ্য... বঙ্গ-জননীর স্নিগ্ধমূর্ত্তির অবভাস, কোথাও উত্তরপশ্চিমের উভয় ...গ্র রূপ। সুমহান্ বিচিত্র বর্ণে অনুরঞ্জিত প্রস্তরখণ্ডের স্তূপ, সেও যেমন সুন্দর, অনতিদূরে বেতসকুঞ্জের পাশে শেওলাপড়া জমা জলের মধ্যে ব্যাঙএর

াফানোও তেমনই চমৎকার! ফলে, ফুলে, জলে, স্থলে, সর্ব্বত্রই বচিত্র্যের রাশি যেন ছড়িয়ে দেওয়া!

পাহাড় দিয়ে বেড়ের পর চারিদিকে বেড় দিয়েছে। নীল মেঘের সঙ্গে াবার তা' বুকে বুকে মিশে গ্যাছে। অসীমে স-সীমের এই কোলাকুলি নকে সীমাহারা করে দেয়। মনে হয় ক্ষুদ্র এই জগতের এত ছোট প্রাণী ামি, আমারও বুঝি ঐ চিররহস্যময় আকাশের রাজ্য আর অনধিগম্য নই। এই হিমালয়ই যেন আমাদের মধ্যের সেই সংযোজক সেতু। ালিদাস এঁর অসংখ্য গুণরাজি কীর্ত্তনের মধ্যে একস্থানে বলেছেন—

"ক্ষুদ্রেঽপি নূনং শরণং প্রপন্নে মমত্বমুচ্চৈঃ শিরসাং সতীব।"

মহতের স্বভাবই এই যে শরণাগত ক্ষুদ্রকেও সাধুর মত মমতা করেন। ামাদেরও এই ভরসামাত্র! তাঁরই তো শরণাগত হ'তে চলেছি, দেখি জ মহত্ত্বগুণে এই ক্ষুদ্রতমদের জন্য কি ব্যবস্থা করেন। পঙ্গুর পর্ব্বত-ঙ্ঘনও যা, আর আমাদের হিমালয় ভ্রমণও তা'।

এই যাত্রাপথের বামভাগে এক উঁচু পাহাড়ের উপর নবনির্ম্মিত রেন্দ্রনগর টিহিরির বর্ত্তমান রাজা নরেন্দ্র সাহের নামে তৈরি করা তন সহর। রত্নপ্রসূ হিমালয়ের মাথার উপর হীরক কিরীটের মতই সেটা লমল করছে।

হৃষীকেশ হরিদ্বার থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে। এর মাঝখানে ামগোড়া নামক স্থানে ভীমকুণ্ড ও ভীমেশ্বর হাদেব আছেন। াইওয়ালার মাইলখানেক পরেই সত্যনারায়ণের মন্দির। এখানে অনেক র্মশালা ও দোকান প্রভৃতি আছে। বিস্তর যাত্রী স্নানাহার করচে।

হৃষীকেশের প্রধান মন্দির হৃষীকেশের বা ভরতের। শ্রীরামচন্দ্রের

মন্দিরও আছে। মুনিকারেতিতে যেতে শত্রুঘ্নর মন্দির। লক্ষ্মণ চলে গেছেন লছমনঝোলায় এগিয়ে। কালো পাথরের মূর্তি, বড় বড় সাদা চোক, বেশভূষা বেশ ভাল—বড়লোকের ছেলের মতই। জটাধারী সাজ ওঁদের কোথাও দেখি না। অথচ ঐ মূর্তিতেই ভরতের ও লক্ষ্মণের বিখ্যাতি! রামের না হয় রাজবেশই তাঁর যশের আকর।

হৃষীকেশে গঙ্গার ধারে ও পাহাড়ের গুহায় গুহায়, গায়ে ও মাথায় অনেক ছোট বড় বাড়ী, কুটীর ও ঝুপ্‌ড়ী তৈরি করে অসংখ্য লোক বাস করচে। স্থায়ী অস্থায়ী অনেক বাসিন্দা দেখলুম। বদরীযাত্রীতেও পথঘাট ধর্ম্মশালা সমস্তই ভরা। তবু পাঁচ ছ'দিন থেকে ক্রমাগত লোক ছাড়া হচ্চে। এতদিন পথ তৈরি হয়নি আর বরফও মোটে গলেনি বলে যাত্রীদের আটকে রাখা হয়েছিল। আমাদের আজ ডাণ্ডি ঠিক হয়ে উঠলো না। যা দাম সেদিন বীরু স্থির করে গেছলো, আজ ঢের বেশী চাইলে। জলপানি তীর্থমোকাম এসব থাকবে, এ ছাড়া ডাণ্ডি ২৫৲ টাকা করে কিনতে হবে, সে অবশ্য নিয়মই। তা ছাড়া কুলিভাড়া ৩৫০৲।

এখানে তিন রকম যান আছে। ডাণ্ডি তার মধ্যে ভাল। একখানা ইজিচেয়ার গোছেরই—কতকটা পা ছড়িয়ে বসা যায়, মাথার উপর অয়েলক্লথের হুড তোলা থাকে রোদবৃষ্টির জন্যে। চার জনে বহন করে। বেশী ভারি হলে পাঁচ বা ছ'জন কুলি নিতে হয়। কাণ্ডি একজনে বয়, দামও সস্তা, দার্জ্জিলিংয়ের তরকারীর ঝুড়িগুলোর মতই, ভিতরে জিনিষপত্র কিছু রেখে বসা যায়। তবে মোটা মানুষের জন্যে সে নয়। এগুলো ৭১৲ টাকায় হয়। জলপানী ‌/০ হিসাবে রোজ, তীর্থস্থানে পৌছলে

১৲ বকশিস, কোথাও একদিন যদি থাকা হয়, তো সেদিনের খোরাকী বাবদে ৸৹ আনা, তা ছাড়া ফিরে এলে বকশিস—সে যার যেমন ইচ্ছা বা সামর্থ্য। ঝাঁপানের আর সবই ডাণ্ডির কুলির সঙ্গে সমান, শুধু ঝাপানগুলির দাম ৭৲ বা ৮৲ টাকা, কখনও ৬৲ টাকাও পড়ে। গাছের ডাল *কেটে দড়ি বেঁধে তৈরি করা ছোট ছোট খাটুলী। আরোহীকে আসন পিঁড়ি হয়ে বসে বসে যেতে হয়।*

ভারবাহী কুলিদের মণকরা ৬৲ টাকা মজুরী স্থির হলো। রাত্রে লক্ষ্মণদাস জেঠিয়ার ধর্ম্মশালার তিনটী ঘর নিয়ে থাকা হলো, ঘেরা উঠানেও ক'খানা খাটিয়া পাওয়া গেল। কিন্তু সেদিন যেসব কুলিদের ঠিক করে গেছলো তারা অন্য যাত্রী নিয়ে চলে গেছে। কুলিরা ভারী গোলমাল আরম্ভ করলে। নূতন লোক মুনিকারেতির আড্ডা থেকে নিয়ে এলো, তাদেরও এরা ভাংচি দিলে। পঙ্কু শেষে তাদের জ্বালায় তিক্ত বিরক্ত হয়ে বল্লে, "যাঃ আমরা ডাণ্ডি নেবো না, হেঁটেই যাব।"—বল্লে "গরজ দেখালে হবে না, চলুন আমরা লছমনঝোলাটা পেরিয়ে যাই।"

আমাদের তো মুখ শুকিয়ে গেল। যদি ওরা না যায়? তখন উপায়?

পঙ্কু বল্লে, "যাবে না আবার? তেরজন যাত্রীকে হাত ছাড়া করবে? না যায় তখন ওপারেই নেওয়া যাবে। ঝাঁপান সর্ব্বত্রেই পাওয়া যায়। আর ডাণ্ডি না হয় কেউ এসে নিয়েও যেতে পারে। একদিন না হয় ওপারেই থাকা যাবে। এখানে সহরে বসে কি হবে?"

আমরাও তাই ভাল মনে করলুম। এখন কোন রকমে বেরিয়ে

পড়তে পারলে হয়। বেরুতে যত দেরি হবে, ফিরতেও তো সেই অনুসারে দেরি। কখন কার কি বাধা পড়ে কে জানে।

দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া করে' ছেলেরা দেরাদুনে ফিরে গ্যালো আজ যেন কড়ির অভাব বেশী করে মনে হচ্ছে। তারা কাছে ছিল বলে মনটা অনেকটা ভাল ছিল। আমরা বিকেল পাঁচটায় এখান থেকে বেরিয়ে মুনিকারেতি হয়ে লছমনঝোলা নৌকায় পার হয়ে ওপারে গিয়ে থাকবো। ডাণ্ডিওয়ালারা যদি ইতিমধ্যে বশে না আসে, অগত্যা কাল ওইখান থেকে আশু বা পরশুকে পাঠিয়ে এপার থেকে ডাণ্ডি নিয়ে যেতেই হবে। 'পাদমেকং ন গচ্ছামি'—আমার তো এই রকমই প্রতিজ্ঞা। অবশ্য পারলে তো ভালই হতো, যেহেতু মসুরী পাহাড়ে উঠতেই দেখেছি পাহাড়ের পথে হেঁটে ওঠাই নিরাপদ; কিন্তু ক্ষমতা চাই হাঁটবার, সে আমরা কোথায় পাবো! কাজেই একটু সন্দিগ্ধ, ঈষৎ ভীত হয়েই যাত্রা করা গেল।—অর্থাৎ যদিই এর পর আর ডাণ্ডি না পাওয়া যায়? ঝাঁপান তেমন স্থবিধে হবেনাতো আমাদের পক্ষে; ইত্যাদি নানারূপ চিন্তা নিয়ে পর্ব্বতলঙ্ঘন করতে বেরুলুম।

মহাদেবচটি

৫

শ্রীমান্ অম্বুজনাথ—কল্যাণবরেষু—

আমরা ২৭শে বুধবার হৃষীকেশ থেকে বেরিয়ে আজ ৪২ মাইলে *(হরিদ্বার থেকে) মহাদেবচটিতে পৌছেচি। আজ শনিবার ৩০শে।*

বুধবার বিকাল পাঁচটার পরে হেঁটে যখন যাত্রারম্ভ করা হল, তখন আমরা মনে করেছিলেম আমাদের হয়ত স্বর্গপথ থেকেই ফিরতে হবে, কারণ ডাণ্ডিওয়ালাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে চটে গিয়ে পঙ্কু পাণ্ডাজীকে শুদ্ধ বলে দিলে যে 'তাঁকে আমাদের দরকার নেই! যাই তো আমরা নিজেরাই যাব।'—পাণ্ডাজী তাঁর তিনজন গোমস্তা নিয়ে এবং বদরীর পাণ্ডার গোমস্তাটী ভয় পেয়ে পিছিয়ে রইল।

গঙ্গা এখানে প্রশস্ত। স্থানটা কতক সমতল বলেই বোধ হয় প্রায় নিস্তরঙ্গ। হৃষীকেশের গঙ্গার সে কি উদ্দাম চপলতা। সারারাত ঘুমের মধ্যেও সেই অফুরন্ত কলনাদ শুনতে পেয়েছি। এখানে কিন্তু তা নেই এঁর সেই স্বভাবপ্রসন্ন শান্ত স্নিগ্ধ মাতৃমূর্ত্তি! পরপারে স্বর্গের মতই শ্রীসম্পন্ন স্বর্গপথে কূল পর্য্যন্ত বাঁধা ঘাটের উপর সুন্দর মন্দির; স্থানে স্থানে ছোট বড় পরিচ্ছন্ন বাড়ীগুলি যেন ছবির মত শোভা পাচ্চে। এদের কারু কারু সঙ্গে ছোট খাট বাগান, কোথাও দেবমন্দিরও দেখা যাচ্ছিল। শুনলেম এগুলির মধ্যে উত্তর পশ্চিমের অনেক রিটায়ার্ড জজ, সবজজ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি তীর্থবাসী হয়ে আছেন।—সাধনের এবং বানপ্রস্থের উপযুক্ত স্থানই বটে!

এপারেও তপোবন নামক পুণ্যস্থলী। কৈলাস-নামক আশ্রমটী একটী রাজপ্রাসাদের মতই বিশাল। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি এবং শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই কৈলাসাশ্রমে দু'টী হাতী দেখেছি। এদের জল খাওয়ানর জন্যে গঙ্গার ধারে একটী পাথরের গাঁথনীতে মোটা শিকল বাঁধা আছে। নতুবা বর্ষার জলস্রোত মত্তহস্তীকেও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। দেখে—ঐরাবতের দুর্দ্দশার কথা মনে পড়লো! হিমালয়জাত

বিশুদ্ধ শিলাজতু প্রভৃতির দোকান এবং রামকৃষ্ণ মিশনের একটী আশ্রম এখানে রয়েছে। ঋষিকুল, মহর্ষিকুল, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, আরও কয়েকটী বিদ্যালয় দেখা গেল। খানিকটা সমতল জমি শ্যামল হয়ে শস্যসম্ভার বুকে ধরে হাসচে। আর তার ওপাশেই গুল্ম-পাদপ-সমাকীর্ণ পর্ব্বতরাজি।

আমরা পথ চিনিনে। পথের মধ্যে একটী দল বাঙ্গালী ছেলে সঙ্গী জুটলো, তাদের অবস্থাও তথৈবচ। কাযেই "অন্ধেনৈব নীয়মানার্যথান্ধাঃ" —গোছের হয়ে আমরা দেড়মাইলটাক পথের বদলে উল্টো পথে তিন মাইল রীতিমত খাড়া চড়াই ও সোজা উৎরাই উঠে নেমে হাঁপিয়ে, ঘেমে, রেগে,—"পারিনা" "পারিনা" করতে করতে অথচ যেন কিসের একটা আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'তে হ'তে লক্ষ্মণ ও ধ্রুব মন্দির দর্শন করে স্বনামপ্রসিদ্ধ লছমনঝোলায় এসে পৌঁছলেম। কিন্তু ঝোলার দর্শন পাওয়া গেল না! ১৩৩১ সালের প্রবল বন্যায় অনেক কিছুর সঙ্গে এই লছমন-ঝোলার পুলও গঙ্গাগর্ভে ভেসে চলে গেছে। উন্নত পর্ব্বত-প্রাচীরের বিরাট স্তম্ভে এখনও তার ভগ্নাংশ দোদুল্যমান থেকে অতীত স্মৃতির সাক্ষ্য দিচ্চে। আমরা নৌকা করে নদী পার হলেম। জলস্রোত খুবই কম। (অথচ এই গঙ্গাই হৃষীকেশে কি লাফানই না লাফাচ্ছিলেন!) জলের রং ঠিক বাঁধা জলের ধরণের—ঈষৎ হরিদ্রাভ নীল। গভীরতা এখানে বেশী তা বেশ বোঝাই যায়। ওপারে পেরিয়ে গিয়ে পুরাতন লছমন ঝোলার পুলের থামটার ধ্বস্ত মূর্ত্তি খানিকটা দেখতে পাওয়া গেল। এর উপর দিয়ে ১৮৮৮ অব্দে তৈরি রায়বাহাদুর সূরযমল ঝুনঝুনওয়ালা তাঁর মায়ের আদেশে বহু অর্থ ব্যয়ে যে লোহার পুল তৈরি করে দেন, সেই পুলটি ছিল।

উত্তরাখণ্ডের পত্র

বিখ্যাত লছমন ঝোলা অনেক দিন আগেই গত হয়েছিলেন। তীর্থভ্রমণ বইখানার বর্ণনায় আছে—

"ঝোলা দেখিয়া সকলে জ্ঞানহত হইল, তাহার কারণ ঐ ঝোলার আকৃতি পাহাড়ের উপর হইতে পাঁচ শত হাত দূরে বিপরীত পারে পাহাড়ের উপর গাছ আছে, তাহার সহিত বন্ধন। এই মত তিন রশি দেওয়া আছে। তিন রশিতে দেড় হাত প্রস্থ; ঐ রশিতে অর্দ্ধ হস্ত অন্তর এক এক খাদি কাষ্ঠের থাক বান্ধা, যেমন সিঁড়ি মই এই মত থাক বান্ধা, দুই পার্শ্বে দড়ির রেল বন্ধ, কোমর পর্য্যন্ত উচ্চ। তাহার উপর দুই পার্শ্বে মোটা দুই রশি আছে, তাহা ধরিয়া ঐ ঝোলার উপর উঠিয়া ঐ খাদি কাষ্ঠের উপর পদক্ষেপ করিয়া, ভীত ব্যক্তিকে উপরের রজ্জু ধরিয়া গঙ্গা পার হইতে হয়। একজন মনুষ্য যাইতে কি আসিতে পারে, যদি কেহ যাইতেছে আর বিপরীত পার হইতে কেহ আসিতেছে, তাহা হইলেই বড় কঠিন হয়। ঝোলার দুই মুখ উচ্চ পৰ্ব্বতের উপর, মধ্যস্থল নিম্ন হইয়া ঝুলিয়া আছে, ঐ স্থলে আসিলে প্রাণ সশঙ্কিত। তাহার কারণ যে, ভাগীরথী ৺গঙ্গা আছেন —তাঁহার জল এমত স্রোতবতী যে, দশ বার শত মণ যে প্রস্তর, তাহাকে ভাঁটার ন্যায় গড়াইয়া, আর বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল দন্তকাষ্ঠের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া স্রোতের দ্বারা দেশ দেশান্তরে ভাসাইয়া লইয়া যায়। জলের শব্দ এমত বিপরীত হইতেছে যে, ঝোলা হইতে হাজার হাত নীচে গঙ্গার জল, তথাচ তাহার কলকল শব্দে কাণে তালা লাগে এবং নিকটের ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতে হইলে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে হয়, তবে বাক্য কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। ঝোলা হইতে এক হাজার হাত এই

বিকট রূপ গঙ্গার জল, তাহাতে ঝোলাতে অর্দ্ধ হস্ত অন্তর অন্তর পদক্ষেপ করিতে হয়। কিছুদূর গমন করিয়া যাইলে ঝোলা হেলিতে দুলিতে থাকে, মধ্যস্থলে আসিলেই আন্দোলিত হয় এবং এক পার্শ্ব উচ্চ এক পার্শ্ব নিম্ন হয়। তৎকালে 'ত্রাহি মধুসূদন' 'ত্রাহি মধুসূদন' এই অন্তর্যাগ হয়। আর এক আশ্চর্য্য এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধুদিগের বাচনিক এমত শ্রুত ছিলাম যে, লছমন ঝোলা পার হইবার সময় দৈববাণী শুনা যায় যে, পক্ষীর ন্যায় শব্দ করিয়া কহে "পন্থি! সাবধান—পগ্ ধ্যান—মুখে বল রাম নাম—হিঁয়া কহি নাহি হ্যায় আপনা।"—এই শব্দ শূন্য পথ হইতে শুনা যায়, তাহা ঝোলাতে উঠিবার সময়ে আপন স্বকর্ণে শুনিয়াছি। তাহার বিশেষ তদারক করিয়া দেখা হইয়াছে, কোন ক্রমে মনুষ্য কি পক্ষী কিছুই নহে, দৈববাণী তাহার সন্দেহ নাই। পরে ঝোলাতে উঠিয়া আপন ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে পার হওয়া হইল।"

সেই ভয়াবহ লছমন ঝোলার হাত থেকে যিনি আত্মপ্রাণের মমতা-ত্যাগী ধর্ম্মপ্রাণ তীর্থযাত্রী হিন্দুকে রক্ষা [illegible]ছেন, তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ! সুরযমল ঝুনঝুনওয়ালার দয়ার দা[illegible]স্তায় আরও অনেক আছে, শুনেছি।

যাহোক আমরা বেশ নিরাপদেই গঙ্গা পার [illegible]ম, কাযেই কোন রকম দৈববাণী আমাদের ভাগ্যে শোনার সুযোগ [illegible] না। কিন্তু মেজাজ তখন আমাদের আরও খারাপ হয়ে এসেচে। আমাদের সাম্‌নেই প্রকাণ্ড উঁচু নীলকণ্ঠেশ্বর পর্ব্বতচূড়া, তার ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষপাদপ-সমাকীর্ণ বিশাল দেহ মেলে অস্ত সূর্য্যের ক্ষীণালোককে সন্ধ্যার অন্ধকারে খুব শীঘ্রই মিলিয়ে যেতে সাহায্য করছিল। দেখতে দেখতে দিবসান্তের শেষ আলোটুকু

উত্তরাখণ্ডের পত্র

পর্ব্বতের ছায়ায় ঢাকা পড়ে গিয়ে গাঢ় অন্ধকারে ভরা অন্ধকার পক্ষের সন্ধ্যাকে আমাদের সাম্‌নে এগিয়ে এনে দিলে। আমরা একটু ভীত হলেম।

চারিদিক প্রায় স্তব্ধ। যাত্রীদল কা'কেও কোথাও দেখা গেল না, পাণ্ডাজীদের সঙ্গে আসতে মানা করে দেওয়া হয়েচে। একেবারে সব কটীই সমান আনাড়ী। আবার সেই খাকী পরা বাঙ্গালী ছেলের দল, তারাও সমাবস্থ! অবশেষে সবাই মিলে যুক্তি করে সামনে একটী আধভাঙ্গা মন্দির দেখতে পেয়ে সেইখানে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া গেল। পূজারী ঠাকুর খুসী হয়েই আমাদের রাখতে রাজী হলেন, কিন্তু তিনিও বল্লেন, যে নীচে এর চেয়ে অনেক ভাল ভাল আশ্রয় আমরা একটুখানি পাশের দিকে গেলেই পেতে পারতুম।

যাহোক ঐ যা পাওয়া গেল, সেই যথেষ্ট! তখন মনে হচ্চে আর কায নেই, রাতটা কোন গতিকে পোয়ালে সকালে উঠেই বাড়ীমুখো হওয়া যাবে। নমুনা দেখেই চক্ষুস্থির হয়ে গেছে! এই [illegible]ন করে অতবড় দীর্ঘ পথ যাওয়া অসম্ভব।

আমরা এঁদোপড়া নীচেতলায় না থেকে ছাদের উ[illegible] আড্ডা করলেম। বেশ ফাঁকা ছাদ, কিন্তু উঁচু নীচু আল পাঁচিলে [illegible] যোগ করা। তা হোক, মন্দ হল না একরকম। নূতনত্ব অন্ততঃ দে[illegible] একটুখানি আছে। ষ্টোভে কিছু এবং আশু বামুন নীচে থেকে কিছু রা[illegible] করে আনলে, পরন্তু বিছানা পাতলে। বৈশাখের এই মাঝামাঝি সময় তোমাদের ওখানে যেমন, তার চেয়ে একটু ঠাণ্ডা, প্রথম বৈশাখের মতই হবে। র‍্যাপার গায়েই চলে। আমরা র‍্যাগ চাপালুম তবুও।

উত্তরাখণ্ডের পত্র

রাত্রে ঘুম হল না। প্রবল স্বরে ঝিঁঝিঁ ডাকচে। চোক চাইলেই মনে হচ্ছে যেন আকাশের গা ঠেলে কতকগুলো বিরাটমূর্ত্তি দানব তাদের মিশ-কালো চেহারা নিয়ে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাথার উপর হাজার হাজার ঝক্ঝকে তারার মালাকে যেন তাদের মাথার চকচকে মাজা শিরস্ত্রাণের মতই দেখাচ্ছিল। অন্ধকার যেন ওদের স্পর্শে নিবিড় হয়ে রয়েচে। সমস্ত প্রকৃতিটাকেই যেন অপরিচিত অনাত্মীয়ের মত বোধ হচ্ছিল। ভারতবর্ষের মধ্য থেকে কোনদিন কোন দেশকে আমি প্রবাস বলতে চাইনি, অনুভবও করিনি। আজ এই রাত্রিকালে হঠাৎ মনে হল, এ যেন কোন্ সুদূর প্রবাসে চির অপরিচিত দেশে এসে পড়েচি। এর সঙ্গে আমার চির-পরিচিত ভারতবর্ষের যেন কোথাও দিয়ে যোগ নেই। মনটা বড়ই ভার বোধ হতে লাগলো।

সকাল হ'ল কিন্তু অতি চমৎকার! সূর্য্য বেশ একটুখানি দেরি করে আমাদের ছাদের উপর দেখা দিলেন, আলোটা তাঁর পাওয়া গেল প্রায় যথা সময়েই। দীপ্তিবিহীন সেই গোলাপী মেশানো সোণালী আলোয় স্নাত হয়ে দুরন্ত প্রকৃতি রম্যতরা হয়ে উঠলেন। অদূরে রক্ষা-প্রাচীরের মতই শ্যামশোভা বিমণ্ডিত পর্ব্বতরাজ নীলকণ্ঠ সূর্য্যালোকে মহিমময় দীপ্তশির উন্নত করে রয়েছেন। এদিকে তীর বালুকার কোলের কাছে মাতা জাহ্নবীর শান্ত পবিত্র নীলধারা, পরপারে আবার সেই হিমরাজের ভীমকান্ত অপরূপ রূপ শোভা। আর আমাদের দক্ষিণেই বড় বড় মন্দির ধর্ম্মশালা জনাবাস। মনে মনে করুণার সঙ্গে হাসিও এল। আমাদের অবস্থা এমনই বটে। শুনেছি আমার পূজ্যপাদ প্রপিতামহ

উত্তরাখণ্ডের পত্র

৺ বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মশাইকে একজন কেউ প্রশ্ন করেছিলেন "মশাই দু'কথায় বুঝিয়ে দিতে পারেন যে, মুক্তিটা কি?"

তাতে তিনি উত্তর দেন, "যেমন কাণে কলম গুঁজে খুঁজে বেড়ান।" অর্থাৎ মুক্তই আছ, শুধু সেটা জানতে পারচো না।

আমাদের কাল রাত্রে কাণে কলম গুঁজে খুঁজে বেড়ানই হয়েচে! এত কাছে অমন সহর, অথচ মনে হচ্ছিল আমরা যেন দণ্ডকারণ্যেই বা বাস করচি!

ডাণ্ডিওয়ালারা সঙ্গ ছাড়েনি তা ঠিকই। সব ঠিক-ঠাক হয়ে গেল। পরশুর সঙ্গে তারা পার হয়ে ডাণ্ডি আনতে চলে গেল। আমরা স্থির করলেম, ওরা ফেরবার আগে হেঁটে একটু এগিয়ে যাই। এমন সকাল, এমন প্রশান্ত প্রকৃতি, একে উপভোগ না করে বসে থেকে লাভ কি?

পথ গঙ্গার ধারে ধারে। দৃশ্য মনোরম! ক্ষণপরিবর্ত্তিত। কিছুদূর বালুচরের উপর দিয়ে চলে অল্প পরে পাহাড়ের গায়ের রাস্তা। পুল তৈরির কাজকর্ম্ম চলচে। কাঠের কড়ি বরগা গঙ্গায় ভাসিয়ে বিস্তর চালান হচ্চে। স্রোতে টেনে নিয়ে যায়, কোথাও আটকে গেলে লোক বন্দোবস্ত আছে ঠেলে সরিয়ে দেয়। কিছুদূর পর্য্যন্ত লোকাবাস। রামকৃষ্ণ মিশন এসে দুঃস্থদের সেবার জন্যে একটা আড্ডা করেচেন। একটা ছাপানো নোটিস দিলেন। ওপারে অনেকদূর পর্য্যন্ত পাহাড়ের গায়ে গায়ে দড়ির টানা রেখার মত গাঁয়ের পথ দেখা যাচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে উঁচুতে নীচুতে ছোট ছোট কুটীরগুলি ছড়ান আছে। গ্রামিকরা কর্ম্মব্যস্ত হয়ে রয়েচে। বেশ ক্ষিপ্রগতিতে ঐ কঠিন পথে যাওয়া আসাও করচে।

আমাদের দেখেই ভয় করছিল যে, আমাদের সামনেই না একটা প'ড়ে মরে!

দু' মাইল পরে গরুড় চটি। স্থানটী পুরাণবর্ণিত তপোবন। কি চমৎকার যে তা' বলতে পারিনে। প্রকাণ্ড উঁচু পাহাড়ের মাথা থেকে গভীর নীচু খড পর্য্যন্ত কলাগাছের বন। তা ছাড়া নানা রকমের গাছপালা ধূসরের মাঝখানে একত্র হয়ে মায়ামন্ত্রপূত শ্যামছবির মতই অনির্ব্বচনীয় শোভার আধার হয়ে রয়েছে। গরুড়ের মন্দিরটী একটী বাঁধান জলাশয়ের মধ্যে। এর মধ্যে কিন্তু শেষশায়ী ভগবানের মূর্ত্তিই মানাতো বেশী এবং মনে হত মা কমলার কোমল করস্পর্শেই বুঝি এই কমলালয়টী এমন দিব্যমূর্ত্তিতে ফুটে উঠেছে!

এখানে জল খেয়ে পুনর্যাত্রা করে আমরা ফুলবাড়ীতে ন'টার মধ্যেই পৌছে গেলেম। সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারীজীর স্থাপিত একটী বড় গোছ ধর্ম্মশালা এখানে আছে, তাতে দেবমন্দির আছে। পূজাপাঠ আরতি বেশ আড়ম্বরেই হয়। আমরা চটিতেই রইলেম। চটি গঙ্গার উপরেই, বেশ দৌড়দার লম্বা দালান। দুপাশে দুটি ঘর, একটীতে চটিওয়ালার দোকান, তাই থেকে চাল ডাল, আলু কুমড়া না কিনলে চটিতে থাকতে দেয় না। ঘিটাও কেনা দরকার, যেহেতু আমরা যে চটিতে থাকি সেখানে আর কারু স্থান সঙ্কুলান তো হয় না, তাই এর লোকসানিটা পুষিয়ে নেওয়া ওর চাই। আর এটা খুব অসঙ্গতও নয়। আ[illegible]দের সঙ্গে গাওয়া ঘি, কিছু তেল, মাথার তেল, মেওয়া মিছরি, ইষপগু[illegible], চিনি, রান্নার গুঁড়ো মশলা প্রভৃতি এবং পাণ মশলা, অল্প সল্প সুজি, আমসত্ত, তেঁতুল, পাঁপর, কলের ময়দা, তৈরি মিষ্টি যতটা সম্ভব নেওয়া হয়েছিল। পথে

এসব আগে পাওয়াই যেত না। এখন নাকি স্থানে স্থানে মেওয়া, চিনি, মিছরি পাওয়া যায়। হয়ত সবই যেতে পারে, তবে সর্ব্বত্র নয়। মূল্য যদিও অগ্নির সঙ্গে তুল্য তথাপি বেশী মোট নেওয়াও খুব ভুল। কুলি-ভাড়াও তো ৬০৲ টাকা মণ। তাছাড়া ঘি নুন এসব না নিলে চটিওয়ালা রীতিমত কোঁদল করে। মশলা গুঁড়ো, বড়ি, পাঁপর, তেঁতুল, আমসত্ত্ব, আচার, হিঙ্ এসব না নিলে দীর্ঘ দিনে অরুচি ধরে যায়, এই দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখা ভাল।

গঙ্গায় পরিতোষপূর্ব্বক স্নান ও আহারাদি সেরে আমরা সাড়ে চারটেয় রওয়ানা হলেম। এর মধ্যে ডাণ্ডি করে' (পঙ্কুর সেজ বোন ও ভগ্নীপতি) সেজদি ও সেজদা এসে পৌছলেন। পাণ্ডাজীও তাঁর সঙ্গের চারজন লোকও এল।

সব মিটমাট হয়ে গিয়ে যাত্রা শুভ হল। দেখা গেল যে ডাণ্ডিওয়ালা-দের গর্ব্ব নিরর্থক নয়, এবং পাণ্ডাজীদের সাহায্যও কত বেশী প্রয়োজনীয়!

ডাণ্ডি অবশ্য সব পাওয়া গেল না। পঙ্কু ও ফণিবাবু এবং আর ক'জন হেঁটে যাবার গৌরবে ঝাঁপানও নিলেন না। আবার ডাণ্ডিগুলি জুটলো এমনই মজবুত! একখানা স্বর্গপথ থেকে আসতে (ওঁরা দুজনে ডাণ্ডি এলে আসবেন বলে' সকালে সেইখানেই ছিলেন) এবং একখানা ফুলবাড়ী থেকে নাইমোহনে আসতে (হিউল নদীর পুলের কাছে) সেজদার ডাণ্ডি দুখানা দুবারে ভাঙ্গলো। প্রথমখানা তাঁর কুলিরা বদলাতে ফিরিয়ে নিয়ে গেছলো, শেসখানা আর এখান থেকে কে নিয়ে যায়? ওর বদলে ৭৲ টাকা দিয়ে এক ঝাঁপান কেনা হল। রাত্রি নাইমোহনে কাটান গেল।

উত্তরাখণ্ডের পত্র

সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মশালার পাশেই একখানা মোটা শালের খুঁটির
তৈরি দোতলা লম্বা ঘর পেয়ে তোমার সেজ মাসিমা খুব স্ফূর্তি করে ত
উপর আমাদের ক'জনকার বিছানা করালেন। কাঠের খাড়া সি
দিয়ে উঠতে হয় বলে একটু আপত্তি ছিল ; ছাড়লে না, অগত্যা সেইখা
রাত কাটানো গেল। মধ্য রাত্রে আমাদের পাশে একটা প্রকাণ্ড পাহ
কুকুর শুয়ে আছে দেখা গেল। আমাদের প্রথমটা মনে হয়েছিল বুঝি
এক বাঘের বাচ্চা! পঙ্কুর কাছে একটা গুলিভরা পিস্তল ছিল।
কুকুরটাকে যে শিকার করা হয়নি, সেই ভাল। এগুলি চটির প্র
কুকুর, এদের রূপ গুণ দুই আছে।

সকালে ছোট বিজনী হয়ে তিন ... লম্বা খাড়া চড়াই চড়ে
চটিতে দুপুর কাটিয়ে ফের চড়াইএর শেষ ও ... মান মাপের উৎর
নেমে বৈকালে বন্দরমেলে পৌঁছিলাম। এ রকম চড়াই শুনলেম এ প
এখন আর প্রায় নেই। অর্থাৎ এক সঙ্গে এত বেশী। উপরে উঠে চা
পাশের দৃশ্য অতি চমৎকার দেখায়। নাইমোহন পেরিয়ে হিউল নদী
গর্ভটা খুব প্রশস্ত—বিশেষ যেখানে গঙ্গার সঙ্গে এর সঙ্গম হয়েছে সে
খুবই চওড়া। এখন জলাভাবে প্রস্তর কঙ্কালে জীর্ণ হয়ে রয়েচে, হা
চওড়া মানুষ রোগা হলে যেমন দেখায়, তেমনি দেখাচ্চে। পাহাড়ে
গায়ে মাথায় গ্রামগুলি স্থানে স্থানে বেশ সুদৃশ্য দেখাচ্ছিল। এতক্ষণকা
কুটীরগুলিকে পর্ণকুটীর বলা যেত, এখন এরা রূপ বদলালো! পর্ণে
বদলে এদের প্রস্তর-কুটীর বলা উচিত, যেহেতু এদের মাথায় মাথায় শ্লে
পাথরের ছাউনি। ঠিক রাণীগঞ্জের টালীর মতন, শুধু রংটা কটাসে
কালো। এই কুটীরগুলি দেখতে বেশ সুশ্রী। গায়ে গেরুয়ার রং, তা

মধ্যে মধ্যে অভ্র গুলে বাহার করা, তাতে চূণকাম করার মত দেখাচ্চে, অথচ চকচকেও বেশ। কোনটায় সাদার মধ্যে মধ্যে গৈরিক বা এলা-মাটীর হলদের বাহার দেওয়া। চটিগুলিও প্রায় তাই। কুণ্ড ছিল উঁচু পাহাড়ের মাথায়, তাই জলাভাব সেখানে খুব। একটি ক্ষীণধারা, তাও খড়ের মধ্যে। উপরে ফার্লং দুই তফাতে একটা ছোট ঝরণা ছিল, সেখানে ভিড়ও খুব বেশী এবং তার জলেরও খুব অভাব। তেমনই জলের সুখ হলো এই বন্দরমেলে। গঙ্গার ঠিক উপরেই, আর এই এত নীচুতে; কিন্তু ভোরের বেলা যখন বেরুনো হলো, তখন শীত করছিল, তাই গঙ্গাস্নান আর কপালে হলো না। না হোক তবু দেখেও চোক জুড়ালো! গম্ভীর কল-কলনাদ, দূর থেকে মনে হয় যেন দু'তিনখানা ট্রেণ পাশ াশি আসচে। উদ্দাম জলস্রোত নিশ্চয়ই কোথাও বিশেষ বাধা পাচ্ছিল, সেটা আমরা পাহাড়ের বাঁকে দেখতে পাচ্ছিলুম না, শব্দটাই শুনতে পাচ্ছিলুম। গঙ্গা এখানে বেশ প্রশস্ত। চটিটিও খুব বড়, এরই একটা শাখা, নদীর ওধারে পাহাড়ের তলায় দেখা যাচ্ছিল। পাহাড়ের গায়ের উপর একটি সংস্কৃত পাঠশালা আছে, তার আলো এখান থেকে দেখা যায়। একটি অধ্যাপক চাঁদা নিতে এলে আমরা অনেকেই কিছু কিছু দিলুম। পথ এবার গঙ্গার ধারে ধারে যেন পাহাড়ের পোস্তা গাঁথা। সঙ্কীর্ণ পথে প্রায়ই একটু উঁচু পাঁচিল দেওয়া।

সকালে বেরিয়ে সের্ম্মল হয়ে এই মহাদে: এসেছি। চটির পাশেই একটি মহাদেবের মন্দির আছে তাই এই নাম। এ চটিটা তেমন ভাল নয়। বড় নীচু চাল, মাথায় ঠেকে। ফণিবাবুর ও আমার মাথা ঠুকে গেল। একটা ধারা থেকে পাইপ এনে কল করেচে। তেমন সুখ নেই

জলের। যাত্রী অনেকগুলি এসে পৌঁছেছে। অবশ্য চটিতে অনেক দোকান, স্থানাভাব নেই। তা ছাড়া আমাদের একজন গোমস্তা আগে চলে' গিয়ে সব ঠিক ঠাক করে রাখে। সঙ্গেও বিস্তর লোক রয়েচে। এ পথে যতটা সুবিধা হ'তে পারে তা' হয়। দুপুর বেলাতেই একটুখানি ঝড় উঠে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। ভাল হল, পৃথিবী যেন ফাটছিল।

কুলিরা বল্লে 'বাবুজী! আপলোক বড়া ভাগবন্ত হ্যায়, এক বরিস পানী নেহি হুয়া।'

ক'দিন পাহাড়ের মাথায় গায়ে আগুন জ্বলতে দেখেছি, ওরা বলেছে ও সব দাবানল। বৃষ্টি না হওয়ায় শুকনো কাঠে কাঠে ঠেকে আপনি আগুন ধরে যাচ্চে।

আমরা যতটা এসেছি তার চটির একটা হিসেব দিলাম। হৃষীকেশের এক মাইল পরে রামাশ্রম, ছোট চটি গঙ্গাতীর। ২ মাইলে লছমনঝোলা, বড় চটি, গঙ্গাতীর। ৪ মাইলে খৈরাড়ী, ছোট চটি, গঙ্গাতীর। ৩॥ মাইলে ফুলবাড়ী, বড় চটি, গঙ্গাতীর। ১ মাইলে ঘটগাউ, ছোট চটি। ১মাইলে নাইমোহন, বড় চটি, হিউল নদী। ১ মাইলে ছোট বিজ্‌নী, ছোট চটি, ধারার জল। ২॥ মাইল বড় বিজ্‌নী, বড় চটি, ধারার জল। ১ মাইলে কুণ্ড, ক্ষুদ্র ঝরণা। ৬ মাইলে বন্দরমেল, বড় চটি, গঙ্গাজল।

শীত এখনও পাই নি। র‍্যাপার ও সাদা জামাতেই চলে যাচ্চে। তোমাদের জন্য মনটা উদ্বিগ্ন রয়েচে। স্বর্গপথ থেকে কতবার মনে হয়েচে যে, ফিরে যাই। যিনি তাঁর অদৃশ্য স্নেহহস্তে এমন করে টেনে এনেচেন, তিনি এখন শেষরক্ষা করলেই বুঝতে পারি।

(৬)

শ্রীনগর

শ্রীমান্ অম্বুজনাথ—কল্যাণবরেষু—

মহাদেব ছেড়ে অপরাহ্নে আমরা কাণ্ডিচটি পৌঁছ্লাম। এ আবার এক নূতনতর দৃশ্য! আমের মুকুলে ভরা শাখাপত্রে গৌরবান্বিত আমের গাছের ঝোঁপে ঝোঁপে পাখীরা আনন্দ কলরব করচে। ঝর্ ঝর্ শব্দে পাশ দিয়ে ঝরণা বয়ে চলেচে, তারই আশেপাশে বেশ অনেকখানি জমি নিয়ে অনেকগুলি দোতলা সুপরিচ্ছন্ন মাটীর বাড়ীর শ্রেণী। এর আগে এরকম চটি একটিও আমরা পাই নি। পাহাড়ের অনেক উঁচুতে এ ধরণের গ্রাম দেখেছি। সজ্জনানন্দের ধর্ম্মশালা, গোপাল মন্দির, কালী-কমলীর সদাব্রত এবং সদাব্রত-ফণ্ডের ঔষধালয় এখানে আছে।

পরদিন ভোরে উঠে কাণ্ডি চটি থেকে বেরিয়ে রওনা হলেম। পঞ্চু প্রভৃতি পায়ে হাঁটার দল আগেই বেরিয়েছিল, পথে দেখা হলো। এক-জনের পায়ে হোঁচট লাগায় তোমার সেজ মাসিমা তার ডাণ্ডিতে তুলে দিলে। এ পর্য্যন্ত আমরা পথ ভালই পাচ্ছি। তৃতীয় দিনের সেই ভীষণ চড়াই উৎরাইএর পর আর যা কিছু, তাকে এ পথের পক্ষে খুবই কঠিন বলা চলে না। আজকের পথে স্থানে স্থানে একটু চড়াই পাওয়া গেল। রাস্তা কোথাও কোথাও ৬।৭ ফিট চওড়া, কোথাও ৮ ফিটও আছে, আবার ৪।৫ ফিটও সরু। তবে বেশীর ভাগই ৬ ফিটের কম নয়। এই প্রশস্ততর সুখসেব্য পর্ব্বতমার্গটী, মাত্র বৎসর তিন-চার পূর্ব্বে তৈরি

হয়েছে। পুরাতন পথের চিহ্ন কোথাও কোথাও দেখতে পেলেম—সেটা নূতন রাস্তার কোথাও অনেক উপর দিয়ে কোনখানে নীচে দিয়ে গিয়েছিল। ও রাস্তা নূতনের চাইতে অনেক সঙ্কীর্ণ এবং চড়াইও ওতে ঢের বেশী উঠতে হতো। মানুষের যাত্রাপথ ক্রমেই সহজতর হয়ে উঠেছে কিন্তু সংসারের যাত্রাপথ মনে হয় যেন ক্রমেই আরও সঙ্কটময় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আজকের রাস্তা ভালই ছিল, কিম্বা হয়ত একটু অভ্যাস হয়েও আসছে। *ডাণ্ডিতে বসে প্রাণটি হাতে নিয়ে দুর্গানাম জপতে হয়নি। যেদিন পথ ভাল থাকে, সে দিন একটা উলের মাফ্‌লার বুনি। আজ কাগজ পেনসিল নিয়ে বসলেম, কিন্তু চলন্ত ডাণ্ডিতে লেখা চলে না।* যখন ওরা বিশ্রাম নিতে ডাণ্ডি থামায়, সেই সময় খানিকটা করে লিখে ফেলি। চটিতে গিয়ে স্নানাহারের পর সব দিন লেখা ভাল লাগে না। আর চটিতে মাছির বড়ই উপদ্রব। আমরা একটা ক'রে নেটের মুখঢাকা ক'রে এনেছি, মুখে চাপা দিয়ে শোওয়া বসা যায়, কিন্তু লেখা যায় না।

সে দিনের সেই বৃষ্টির পর সমস্ত পার্ব্বত্য প্রকৃতির শোভা ফিরে গ্যাছে। তার আর সেই শুষ্ক রুক্ষ রুদ্রমূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে না, বড়ই শান্ত স্নিগ্ধ ভাব ধারণ করেছে। আকাশ পরিষ্কার, বাতাস জলকণাস্নিগ্ধ নাতিশীতোষ্ণ, চড়াই পাখীর আনন্দ-কলরব শ্রুত হচ্ছিল। পথের দু'পাশেই জুঁই ও চামেলীর মিশাল আকার বকুলগন্ধী একপ্রকার কাঁটাগাছের ফুলের গন্ধে চারিদিক মেতে গেছলো। নিচে ভাগীরথীর সঙ্কীর্ণধারা কোথাও পর্ব্বতমালার অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আবার সহসাই পরিদৃশ্যমান হয়ে পড়ছে। গিরিতরঙ্গিনী আমাদের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে

যেন লুকোচুরি খেলা করেছেন, মনে হচ্ছিল! দৃশ্য বা অদৃশ্য যেমনই থাকুন, অদৃশ্য জাহ্নবীর কলকল স্বর শ্রবণকে পরিতৃপ্ত এবং পরিদৃশ্যমানাবস্থায় তাঁর তরঙ্গভঙ্গলীলা আমাদের চক্ষুকে পরিতৃপ্তি প্রদান করছিল। ইনি এখন আমাদের নিত্যসঙ্গিনী পথপ্রদর্শিকা।

দুই এক জায়গায় রাস্তাটি কিছু সঙ্কীর্ণ। সেইখানে ধারের দিকে এক হাত উঁচু পাথরের পাচিল বেঁধে যাত্রীদের পতনভয় নিবারণ করা হয়েছে। শুনলুম দেবপ্রয়াগ হয়ে শ্রীনগর পর্য্যন্ত যাত্রাপথ এই ভাবেই গেছে।

বেলা সাড়ে আটটায় ব্যাসঘাটে পৌছলাম। এর কিছু আগে থেকেই আমাদের অপর পারে (গঙ্গার ধারের দিকেই পাহাড়ের গা দিয়ে পথ) কোটদ্বারের রাস্তা গিয়াছে। ঐ পথে আট মাইল গিয়ে কোটদ্বার রেল ষ্টেশন। বিস্তর মিউল ভার বোঝাই নিয়ে ঐ পথ দিয়ে আসছে দেখা গেল। পথেও আমরা ভারবাহী মিউলের খুব ভিড় পেতে লাগলুম। এই সঙ্কীর্ণ পথে সে এক মহামারি ব্যাপার! ডাণ্ডিওলারা বিব্রত হয়ে পড়ে, আমরা তো ডাণ্ডিতে বসে দুর্গানাম একমনেই জপছি, জপের সংখ্যা বেড়ে যায়। গঙ্গা এখানে স্থানে স্থানে খুব চওড়া, আর চারিদিক থেকে ছোট বড় নানা আকারের নানা নামের নদী লাফালাফি করতে করতে ছুটে এসে এরই মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়চে। জল অবশ্য এখন সর্ব্বত্রই কম। পাহাড়ে যত বরফ গলবে, বর্ষা নামবে, এই সব সঙ্কীর্ণ জলস্রোত ততই স্ফীতবক্ষ হয়ে উঠবে। এমন কি, মধ্যে মধ্যে এত চওড়া নদীগর্ভেও ওদের তখন স্থান সঙ্কুলান হয়ে উঠবে না।

এ পথে প্রায়ই নদী পার হতে হচ্ছে। আগে এ সবই দড়ির পুল ছিল, এখন পুল সবই লোহার দোলা পুল। পুলের উপর বেশী ভিড়

করা সঙ্গত নয়, তাই ডাণ্ডি থেকে নেমে হেঁটেই পার হওয়া নিয়ম। এখানের পুলটি বেশ বড়। ব্যাসগঙ্গা এসে আসল গঙ্গার সঙ্গে মিশেছেন। ব্যাসগঙ্গার জল ঘোলাটে, তরঙ্গও বেশী। গঙ্গার ধারা এখানে সঙ্কীর্ণ, নদীর মাঝখান দিয়ে বইছে। বেলা প্রায় আটটার সময় ব্যাসগঙ্গার পুল পার হয়ে প্রায় আধমাইল দূরে ব্যাসগঙ্গা ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল ব্যাস-চটিতে পৌছান গেল। ব্যাসঘাটের কিছুদূরে নয়ার বা নবালিকা নদী গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে, এই যায়গাকে ইন্দ্রপ্রয়াগ বলে। কথিত আছে, ইন্দ্র বৃত্রাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে এইখানে মহাদেবের উদ্দেশ্যে তপস্যা করেন, ও তাতে উপাস্যের দ্বারা বিজয়ী হওয়ার বর প্রাপ্ত হন। সেই জন্য এই স্থান ইন্দ্রপ্রয়াগ নামে প্রসিদ্ধ। গঙ্গার ওপারে দক্ষিণ ভাগে ব্যাসের তপস্যা-স্থান ও ব্যাসেশ্বর শিবের মন্দির আছে। দর্শনে সমস্ত অন্তর যেন একটা অননুভূতপূর্ব্ব ভাবে পূর্ণ হয়ে উঠলো। স্থানটি বড় মনোরম। দুদিক দিয়ে দুটি ধারা বয়ে যাচ্ছে। চারিদিকে ছোট বড় নুড়ি পাথর ও শুভ্রবালুকার প্রশস্ত চরভূমি। নদী-সঙ্গমস্থলটী এখন শুষ্ক, বর্ষায় সংযুক্ত হবে। এইস্থান মহাভারতকার ব্যাস অথবা বেদের সঙ্কলনকর্ত্তা জানিনা কোন সে ব্যাসদেবের পুণ্যাবস্থানের গরিমা বহন করেছিল! তিনি এর মধ্যের যিনিই হোন বিশ্বের বরেণ্য তাতে কোনই সংশয় নেই। ব্যাসচটিতে দোকান পসার মন্দ নেই। ডাকঘর আছে। বাজারের মধ্যেই বেদব্যাসের মূর্ত্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। অন্য চটিতে চাল ডাল আটা আলু ঘি নুন কোথাও কুমড়া, এ ছাড়া বড় একটা কিছু পাওয়া যায়নি। ছোলাভাজা ও ক্ষীরের পেঁড়া দু এক জায়গায় দেখেছি মাত্র। এখানে আবশ্যক অনেক দ্রব্যই আছে, অনাবশ্যক বস্তুজাতও যথা, নকল

পলা এবং নকল মুক্তার মালা ইত্যাদিও কিছু কিছু এসে পৌঁছে গ্যাছে।

বেলা সাড়ে দশটার সময় আমরা উমরাসু চটিতে পৌঁছলাম। উমরাসুতে বিশেষত্ব কিছুই নেই। চটি বেশ বড়, প্রায় সব শুদ্ধ ১০।১২টি দোতলা বাড়ী আছে। গঙ্গার উপরেই, কিন্তু গঙ্গায় নামা একটু কঠিন। স্থানটী অনেকখানি খাড়া চড়াইএর উপর।

গত মধ্যাহ্নে মেঘ জমে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। আজও টিপিটিপি একটুখানি হলো। এখান থেকে দেবপ্রয়াগ পর্য্যন্ত চার মাইল পথের মধ্যে বৃষ্টিতে কষ্ট পেতে হয় নি।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা দেবপ্রয়াগে পৌঁছে গেলাম। এই চার মাইল পথের মধ্যে সৌড়ি বলে একটি চটি ও একটী বিশ্রামস্থানও আছে। সৌড়ী চটিটি ছোট হলেও স্থানটী বড় সুরম্য, অনেকটা আমাদের দেশের মতন। গরুড় চটির মত অত না হলেও, কলাগাছের সারি গঙ্গাতীর দিয়ে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমবাগান আছে। আতা ও জাম গাছ মাত্র এইখানেই দেখলাম। স্থানটী ছায়া-স্নিগ্ধ ও শ্যামল।

দেব-প্রয়াগ বহু দূর হতেই দেখতে পাওয়া গেল, বেশ একটি বড় পার্ব্বত্য সহর। সহরটী অলকানন্দার উভয় তীরে বিভক্ত। এর মধ্যে দক্ষিণ অংশটী ইংরাজরাজের, উত্তর ভাগটী টিহিরী রাজ্যের। মধ্যে দুই পারের দুইটী সহরের একটী সংযোজক লৌহসেতু আছে। সেতুটি ২৮০ ফুট দীর্ঘ। আমরা পদব্রজে পুল পার হয়ে টিহিরী রাজ্যে প্রবেশ করলেম। দেব-প্রয়াগে বদরীর পাণ্ডাদের অধিকার। সঙ্গে তাঁদের একজন গোমস্তা ছিল। পাণ্ডার লোকরা এসে আমাদের নিয়ে গেলেন।

চক বাজারের আগেই একটি খুব সুন্দর ও সুসজ্জিত ত্রিতল গৃহ আমাদের থাকবার জন্য দিলেন। যত্নেরও কোন ত্রুটি হলো না।

এখানে থানা, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ-অফিস, হাঁসপাতাল বৃটিশ সাম্রাজ্য-ভুক্ত এবং তীর্থীভূত সঙ্গমস্থল ও দেবালয়াদি টিহিরী রাজ্যের অন্তর্গত। বাজার দুদিকেই আছে, তবে উত্তর দিকেই চকবাজার বা বড়বাজার। হিমাচল যাত্রীর আবশ্যক এবং সৌখীন গৃহস্থের উপযোগী সকল দ্রব্যই এই বাজারে প্রচুর রূপে পাওয়া যায়। রবার শোল জুতা, ভাল অয়েল ক্লথ, ঔষধের ও খুচরা শিশিপত্র রাখার জন্য ছোট টিনের বাক্স ও ব্যাগ, থলির জন্য মোটা দেশী ছিট, পেটি কোটের জন্য এবং চাকর বামুনের জন্য কিছু ফ্লানেল, সঙ্গমতীর্থের জল রাখার জন্য স্ক্রু দেওয়া জার্ম্মাণ সিলভারের ঘটি, নোটবুক, পেনশিল। যা কিছু দরকার মনে হলো আমাদের কেনা-কাটা হলো। দাম কিন্তু এত দূরের এই দুর্গম পথেও অন্যায় মনে হলো না। মসুরী দেরাদুনে গরম কাপড় যে দরে কেনা গেছে, হিমালয়ের অভ্যন্তরে মিউলে বাহিত হয়ে এসেও তার যে মূল্য পরিবর্ত্তন হয়নি, এটা বিস্ময়ের বিষয় বই কি! এলুমিনমের বাসনের দাম সেই ৫১৫ পয়সা ভরি। ভাল চাল এখানে ৷৷০ সের, সরিষার তেল, কানপুরী ময়দা, চিনি, মিছরী সবই এখানে ভাল। বাজারে মিষ্টান্ন পাকও নানা রকমের হচ্চে। যাত্রী আসা আরম্ভ হতেই নীচের থেকে হালুইকর ও ব্যবসায়ীরা এসে দোকান-পাট খুলে বসেছে। তরি-তরকারির কিন্তু সেই অভাবই রয়ে গেল। সেই যথাপূর্ব্ব আলু-কুমড়ো আর কুমড়ো-আলু। তবে আমাদের বদরীর পাণ্ডা এক কাঁদি কাঁচকলা এবং আমের, আখের, আমলকীর প্রভৃতি অনেক রকমের আচার এবং মোরব্বা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এখানের বাড়ীগুলির অবস্থান বড় সুন্দর—বিরাট উচ্চ পর্ব্বত প্রাচীরের গায়ে মাথায়, কোলের কাছে, পায়ের তলায় থাকে থাকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখা বা ছড়িয়ে দেওয়া। প্রায়ই তিনতলা বাড়ী, সামনে কাঠের কাযের রেলিংদেওয়া অথবা খোলা বারান্দা। পাশের দিকে হলদে বা গেরুয়া রং, সামনেটি সাদা চূণকাম করা ; এবং মাথায় শ্লেট-পাথরের সেই পরতওয়ালা হাল্কা কালো টালি। বারান্দায় গামলা করে গাঁদা, তুলসী, কোথাও অর্কিড ও খাঁচায় টিয়া চন্দনা পাখী ঝোলান। ছবি আর কাকে বলে ! রাস্তা পথ পাথরের নোড়ায় বাঁধান, যেমন হরিদ্বার ও হৃষীকেশে।

দেবপ্রয়াগ উত্তরাখণ্ডের পঞ্চম প্রয়াগের (দেবপ্রয়াগ, রুদ্র প্রয়াগ, কর্ণ প্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ এবং বিষ্ণু প্রয়াগ) মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে' কথিত হয়। এই স্থান সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ২০০০ ফিট উঁচু। হরিদ্বার থেকে ৭৩ মাইল, কোটদ্বার রেলষ্টেশন থেকে ৯৩ মাইল, কেদার থেকে ৯৩ মাইল এবং এখান থেকে বদরীনাথের দূরত্ব ১২৬ মাইল। এখানে গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমের নিকট দুটি কুণ্ড আছে, তাদের নাম ব্রহ্মকুণ্ড ও বশিষ্ঠকুণ্ড। সঙ্গমস্থলে যাবার পাথর কেটে প্রশস্ত সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে এবং দুটী মোটা মোটা লোহার শিকল ঝুলান আছে, তাই ধরে যাত্রীরা সাবধানে স্নান করে। সঙ্গমস্থল খুবই ভয়-সঙ্কুল ! অলকানন্দা কল-কল্লোলে তরঙ্গ তুলে বিশৃঙ্খল বেশে নাচতে নাচতে ছুটে চলেছেন, তার মধ্যে একবার পড়লে আর রক্ষা নাই ! মা গঙ্গার মূর্ত্তিতে তবু মায়ের মত শান্ত ভাবটা কিছু বজায় আছে। তবে তিনি তো এখন শুধু মা নন, সখীর সঙ্গে মিলে মিশে কৌতুক রঙ্গে রঙ্গময়ী হয়ে রয়েছেন কিনা, তাই একটুখানি উচ্ছৃঙ্খল ! এই ভৈরব মূর্ত্তি নদীস্রোতের মধ্যে বিচিত্র বর্ণের পুচ্ছ বিস্তার

করে প্রকাণ্ডাকার মৎস্যকুলের নির্ভীক বিচরণ দেখবার মত বটে! হরিদ্বারে, হৃষীকেশে, এখানে—মাছেদের সেই একই ভাব! লাফিয়ে গায়ের উপর চলে আসে।

এখানে বদরীনাথের পাণ্ডাদের স্থায়ী [illegible]ল। বদরীতে শীতের জন্য বৎসরের মধ্যে ৭।৮ মাস তো লোক থাকে না। পাণ্ডারা ৫০০ ঘর আছেন। এখানের প্রসিদ্ধ রঘুনাথজীর মন্দিরের দক্ষিণে ও বামে এবং নিচে গঙ্গার বামে ও অলকানন্দার দক্ষিণ তটের উপর এই সব পাণ্ডাদের বাসগৃহ। এঁদের মধ্যে কর্ণাটি, দ্রাবিড়ী প্রভৃতি দক্ষিণী ব্রাহ্মণই বেশী। চেহারাগুলি ব্রাহ্মণোচিত বটে! ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের দেখলে কোলে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করে। যেমন রূপ, তেমনই স্বাস্থ্য।

দেবপ্রয়াগে রঘুনাথ কীর্ত্তি-মহাবিদ্যালয় নামে একটি সংস্কৃত পাঠশালা আছে। সেখানে পাণ্ডা এবং স্থানীয় ব্রাহ্মণ বালকগণ পাঠ করে। এর পরিচালনা-জন্য কোন স্থায়ী ধনভাণ্ডার নাই, সেই জন্য এর অবস্থা প্রায় শোচনীয়। বর্ত্তমান সময়ে তীর্থ-পুরোহিত পাণ্ডাদের মূর্খতায় তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে অনেক সময় ক্ষুব্ধ এমন কি মর্ম্মাহত হ'তে হয়েছে। এই মূর্খতা দূর করে সুবিদ্বান ও সংযতচরিত্র পাণ্ডা মোহান্ত পূজারীর আবার ব্যবস্থা হলে, হিন্দুধর্ম্মের একটা মহা কলঙ্ক ক্ষালন ও অভাব বিদূরিত হয়। এর দিকে যদি দেশের ধনী ও ধর্ম্মাত্মারা লক্ষ করেন, তাহলে অনায়াসেই এ রকম প্রতিষ্ঠানগুলি জীবন্ত হয়ে উঠে—কত অন্ধ জনে আলো বিতরণ করিতে পারে। কেউ কি এ সব দিকে লক্ষ্য করবেন না?

টিহিরী দরবার থেকে এ পারেও এক ঔষধালয়, থানা [illegible]ং ডেপুটি কালেক্টরের কাছারী আছে। ধনী দাতাদের দেওয়া কয়েকটি ধর্ম্মশালাও

আছে শুনলুম। দেবপ্রয়াগে ভাগীরথীর উপরে একটি দড়ির পুল আছে, তার ওপারে একটি ক্ষীণধারা নদী দেখা যায়, তাকে শান্তা নদী বলে। দশরথ-পর্ব্বতোৎপন্না এই নদীটি গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

দেবপ্রয়াগে প্রয়াগসঙ্গমে স্নান করে পিতৃগণকে পিণ্ডদান ও তর্পণ করতে হয়। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ ; মাতামহ, প্রমাতামহ, এবং শ্বশুরকুলের অপগত সকল পূজ্যজনকে ভক্তিভরে আহ্বান করে এনে যথাশক্তি পূজা করবার এ অধিকার লাভ করে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে হলো। এই বৈশাখের শুক্লপক্ষই আমার চিরস্নেহময় ভূ-দেব পিতৃ পিতামহের মহাপ্রয়াণের পুণ্যতিথি। তাঁদের সেই দিব্য তেজোময় জ্যোতির্ম্মণ্ডিত মূর্ত্তি, সমুজ্জ্বল ভাস্কররূপে মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে' এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাবাবেশে দেহ মনকে যেন অভিভূত করে তুল্লে। সমস্ত জীবনব্যাপী দুঃখসুখের সকল স্মৃতিই যেন আজ এই দেবপ্রয়াগের সঙ্গমতীর্থে পূজার আসনে বসে একসঙ্গে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। যে সব প্রাণাধিক প্রিয়তমদের হাতে করে গড়ে তুলে আবার নিজের হাতেই বিসর্জ্জন দিয়েছি, তারা আজ আমার অনেক উর্দ্ধে। তারা আজ শুধুই আমার স্নেহের নয়, আমার শ্রদ্ধারও পাত্র। তাই তাদেরও উদ্দেশে আমার তপ্তঅশ্রুপূত সুগভীর বেদনাভরা শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ করলুম। তারা আজ সংসারের সকল সুখদুঃখ দেনা পাওনার অতীত হলেও আমার সুখদুঃখ ও দেবার আকাঙ্ক্ষা দিয়ে আজকের দিনে এই পার্ব্বতীয়া পুণ্য-তরঙ্গিণীদের কোলের কাছে, হিন্দুর এই বহু আকাঙ্ক্ষিত পুণ্যতীর্থে বসে তাদেরই একবার স্মরণ করবার লোভ ছাড়া যায় কি? স্মৃতির মন্দিরে যাদের নিত্যপূজা নিয়তই চল্‌চে এ শুধু তাদের নিমেষের জন্য বাইরে

।লয়ে আসা যাএ! মন্দির-দেবতারও তো মধ্যে মধ্যে অঙ্গরাগ করে নিতে হয়।

হিন্দুর এই পিতৃ-পূজার মত বড় জিনিস আর কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। বিশ্বের দেবতাকে আমরা কতটুকু জান্‌তে পারি? কিন্তু আমাদের এজীবনের প্রত্যক্ষ দেবমূর্ত্তির আরাধনায় তো কোন রকম প্রতীকের দরকারই হয় না। এ তো মাত্র ধ্যানগম্য মূর্ত্তি নয়, এ যে আমাদের জাগ্রত দেবতা!

স্নান, পিণ্ডদান, তর্পণ, ভোজ্যোৎসর্গ সমাধা ক'রে রঘুনাথমন্দির দর্শন করতে যাওয়া হলো। হিমালয়ের বুকের উপর যেমনটী হ'লে মানায়, ঠিক তারই যোগ্য সিঁড়িটী! সাত আট বার বসে বসে মধ্যে মধ্যে দাঁড়িয়ে কোন গতিকে প্রশস্ত মন্দির-চত্বরে পৌছলাম। প্রশস্ত চতুষ্কোণ চত্বরের মধ্যে উচ্চ মন্দির। ভিতরে শ্যাম-পাষাণময় ছয় ফিট আকারের শ্রীরামচন্দ্র মূর্ত্তি। মূর্ত্তির অঙ্গে মণিরত্ন ও পীতবাস। মন্দির প্রাচীন, শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত বলে শোনা গেল। গড়বাল রাজবংশ এই মন্দিরের অধিকারী, তাঁরাই মন্দির সংস্কার ও পূজার ব্যবস্থা প্রভৃতি করতেন। বিক্রমীয় ১৯৩০ সম্বতের প্রবল ভূমিকম্পে যখন এই মন্দির প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়, তখন গড়বাল-রাজ পরাজিত দশায় থাকায় গোয়ালিয়রের দৌলত রাও সিন্ধিয়া মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করে কীর্ত্তিমান্ হয়েছিলেন। দেব-প্রয়াগের পুরাতন বস্তিও পূর্ব্বোক্ত ভূমিকম্পে এবং ১৯৫১ সম্বতের বিরহীতালের যে বন্যা অলকানন্দায় আসে, তাতেই ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্ত্তমান সহরটী নব নির্ম্মিত।

রঘুনাথ মন্দিরের গড়বাল রাজবংশ প্রদত্ত কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি

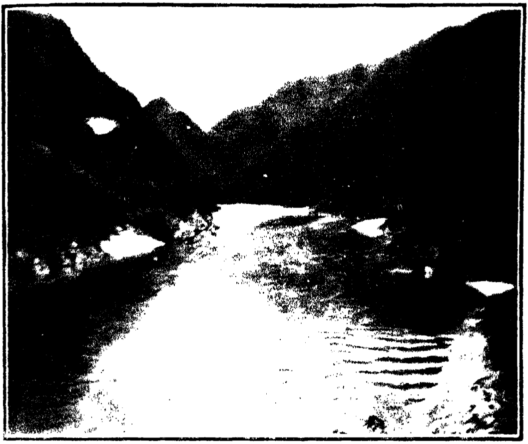
আছে; তদ্ভিন্ন ভেট, পূজা প্রভৃতি থেকেও কিছু আয় হয়। পাণ্ডাদের মধ্য হতে নির্ব্বাচন করা একটী পঞ্চায়েত সভা আছে। এর আয় ব্যয় প্রভৃতির হিসাব এই সভাই রাখেন এবং টিহিরী দরবারে নকল পাঠান হয়। এখানকার ডেপুটী কলেক্টর এই সভার সভাপতি। মন্দির সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের শেষ নির্দ্ধারণ মহারাজই করে থাকেন। বসন্তপঞ্চমীর দিন রঘুনাথজীর উৎসবমূর্ত্তি মহাসমারোহে শোভাযাত্রার সহিত বাহির করা হয়। সে দিন এখানে খুব ধুমধাম হয় ও একটী বড় রকম মেলা বসে।

কিম্বদন্তী বলে, রাবণবধে শ্রীরামচন্দ্রকে ব্রহ্মবধজনিত পাপ স্পর্শ করে, (রাবণ ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন) সেই পাপ মুক্ত হবার জন্য তিনি এইখানে তপস্যা করেন এবং পাপ হতে মুক্ত হ'ন। তদবধি তিনি এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এইখানে দেবশর্ম্মা নামক মুনি ভগবান্ বিষ্ণুকে আরাধনা করে বরলাভ করেছিলেন বলে' মুনির নামে এই প্রয়াগ-ক্ষেত্র দেবপ্রয়াগ নামে বিখ্যাত হয়েছে। দেবপ্রয়াগের এই পৌরাণিক বৃত্তান্ত। রঘুনাথমন্দিরের রূপার পাতমোড়া কপাটখানিতে যে সাল লেখা রয়েছে সে কতকটা আধুনিক, সম্ভবতঃ গোয়ালিয়রের দান। এই মন্দিরের কিছু উপরের পাহাড়ে দুর্গামায়ী, বিশ্বেশ্বর, ক্ষেত্রপাল, প্রভৃতির মন্দির আছে। রঘুনাথের মন্দিরের বাহিরে বাহন গরুড় যে আছেনই তা বলাই বাহুল্য। থাকা উচিত ছিল হনুমানের। তা কিন্তু নাই।

সেদিন এখানেই থাকা হলো। পূর্ব্বেই লিখেছি, ক'দিন থেকে এ প্রদেশে বর্ষা নেমেছে। এ কিন্তু বর্ষার সেই মেঘময়-বেণী এলায়িত সবুজসাড়ী পরা অঙ্গনাদের চেলা রূপ নয়! রাশি রাশি কাপাস তুলো যেন ধুনারীর ধুনন্‌যন্ত্র থেকে সদ্য মুক্তি পেয়ে গগনস্পর্শী বিশাল পর্ব্বতের

চূড়ায় চূড়ায় ছড়িয়ে গিয়ে জড়িয়ে গেছে এবং ক্রমশঃ ধাপে ধাপে তার বুকের উপর দিয়ে, কোলের মধ্য দিয়ে মর্ত্ত্যের অভিমুখে নেমে আসতে আরম্ভ করেচে। অমন যে অভ্রভেদী গিরিরাজি তাদের যেন এই কাপাস-বুড়ী আঁচলঢাকা দিয়ে ফেল্লে! গাছপালা বাড়ীঘর সমস্তের উপরেই ঐ লঘু ও শুভ্র আচ্ছাদনী দেখতে দেখতে বিস্তৃত হয়ে গেল। আমরা চিরদিনের মর্ত্ত্যবাসী, আজ মেঘরাজ্যের অধিবাসী হয়ে ইন্দ্রজিতের মত মেঘের মধ্যে লুকিয়ে রইলেম!

বৈকালে খানিকক্ষণের জন্য থেমে থেকে আমাদের সহর দেখার সুযোগ করে দিয়ে রাত্রে আবার বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করলে। আমরা পুল পেরিয়ে ইংরেজাধিকৃত "বা" সহরে পৌঁছে এলেম। এইখানে যাদের যানবাহন ছিল না—অর্থাৎ পদব্রজের যাত্রী ছিলেন,—তাদের যান-বাহন নেওয়া হ'ল। আমরা সর্ব্বশুদ্ধ কেদার-বদরী যাত্রী তের জন বেরিয়েছিলুম লিখে থাকব বোধ হয়? পঙ্কু, সেজদা, ফণীবাবু, আমি, তোমার সেজ মাসিমা, সেজদি, সুজুর মা ছাড়া বাকি ক'জনকে কর্ণ এবং পঞ্চপাণ্ডব বলেই নামকরণ করে নেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান পাণ্ডব, মধ্যম পাণ্ডব, কর্ণ এবং নকুল এঁদের হাল্কা শরীরের সাহায্যে কাণ্ডির আরোহী হলেন। তা' আর কি করা যাবে? ওঁরা তো আমরা —অত বড় যে মহামহাবীর সেই পাণ্ডবেরাও পদব্রজে বদরীনাথ যেতে সমর্থ হননি। তাঁদেরও আমাদের মত বাহক স্কন্ধে যেতে হয়েছিল। ঘটোৎকচপ্রমুখ রাক্ষসগণ তাঁদের বহন করে নিয়ে যায়। এই রাক্ষসগণই আধুনিক তিব্বতীয় ও ভূটানীদিগের আদিপুরুষ কি না, তা কে বলবে? মহাভারতে আছে—



দেবপ্রয়াগের পথে—গঙ্গার উপর এক দৃশ্য।



উত্তরাখণ্ডের পত্র

"ঝটিকানিবৃত্তির পর ক্রোশমাত্র পথ গিয়া দ্রৌপদী সৌকুমার্য্য ও ক্লান্তিবশতঃ মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়েন!"

"ক্রোশমাত্রং প্রযাতেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
পদ্ভ্যামনুচিতা গন্তং দ্রৌপদী সমুপাবিশৎ॥ ১
শ্রান্তা দুঃখপরীতা চ বাতবর্ষেণ তেন চ।
সৌকুমার্য্যাচ্চ পাঞ্চালী সম্মুমোহ তপস্বিনী॥ ২

(বনপর্ব্বম্ ১৪৪ অধ্যায়)

দ্রৌপদীর মূর্চ্ছাপগমের পর যুধিষ্ঠির বল্লেন,—

"বহবঃ পর্ব্বতা ভীম বিষমা হিমদুর্গমাঃ।
তেষু কৃষ্ণা মহাবাহো কথং নু বিচরিষ্যতি।

(বনপর্ব্বম্ ১৪৪।২২)

—"হে ভীম! পথিমধ্যে হিমদুর্গম ও সমবিষম বহুসংখ্যক পর্ব্বত আছে, দ্রৌপদী কি প্রকারে সে সকল অতিক্রম করিবেন?"

ভীমসেন নিজপুত্র ঘটোৎকচকে আহ্বান ক'রে তাঁকে দ্রৌপদীকে বহন করে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন। ঘটোৎকচও তাতে সম্মত হলেন। তাঁর সমভিব্যাহারী রাক্ষসগণ আর সকলকে বহন করবেন স্থির হ'ল।

"এবমুক্ত্বা ততঃ কৃষ্ণামুবাহ স ঘটোৎকচঃ।
পাণ্ডুনাং মধ্যগো বীরঃ পাণ্ডবানপি চাপরে॥ ৮
লোমশঃ সিদ্ধমার্গেন জগামানুপমদ্যুতিঃ।
স্বেনৈব স প্রভাবেণ দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ॥ ৯
ব্রাহ্মণাংশ্চাপি তান্ সর্ব্বান্ সমুপাদায় রাক্ষসাঃ।

নিয়োগাদ্রাক্ষসেন্দ্রস্য জগ্মুর্ভীমপরাক্রমাঃ ॥ ১০
এবং সুরমণীয়াণি বনান্যুপবনানি চ।
আলোকয়ন্তস্তে জগ্মুর্বিশালাং বদরীং প্রতি ॥ ১১
তে ত্বাশুগতিভির্ব্বীরা রাক্ষসৈস্তৈর্ম্মহাজবৈঃ।
উহ্যমানা যযুঃ শীঘ্রং মহদধ্বানমল্পবৎ ॥ ১২

"এই বলিয়া ঘটোৎকচ পাণ্ডবগণের মধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণাকে বহন করিতে লাগিলেন, অপরাপর রাক্ষসগণ পাণ্ডবগণকে বহন করিয়া লইয়া চলিল। লোমশ নিজ প্রভাপ্রভাবে দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় অন্তরীক্ষে সিদ্ধগণের মার্গে গমন করিলেন। রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচের আদেশানুসারে ভীমপরাক্রম রাক্ষসগণ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে বহন করিল। এইরূপে সুরম্য বন উপবন সমূহ দর্শন করিতে করিতে তাঁহারা বদরীবিশালা অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। আশুগতি, মহাবীর রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া তাঁহারা শীঘ্রই দীর্ঘপথ অল্পপথের ন্যায়ই অতিক্রম করিলেন।"—

তবেই দেখচো, আমাদের ডাণ্ডি চড়ে যাওয়াটা কিছুই অন্যায় হচ্ছে না। দ্বাপর যুগের লোকেরাই যখন পারেনি, তখন ঘোর কলির মানুষ আমাদের আর দোষ কি ? এ অবস্থা ঘটবে জানতুম বলেই আমরা ক'জনে প্রথমথেকেই ডাণ্ডি নিয়েছিলুম।

পরদিন অর্থাৎ ৩রা মে মঙ্গলবার বেলা আড়াইটার সময় আমরা দেবপ্রয়াগ ছেড়ে এলাম। এখানে এমন একটী ঘটনা ঘটল যে, এদিনের যাত্রাতে আমাদের মনে একটা তীব্র ব্যথা বেজে রইলো। মন নিরানন্দে ভরে গেল। সেজদি (পঙ্কুর সেজ বোন) আমরা দেরাদুনে আসার পর কুম্ভস্নানের আগের দিন দেরাদুনে এসে পৌছেন এবং তাঁর

আর চার বোনের মত তিনিও এই বদরী যাত্রায় যোগ দেন। তাঁর স্বামী গিরীন বাবুর কিন্তু আগাগোড়াই তেমন মত ছিল না, অথচ হুজুকে পড়ে এগিয়েও চলেছিলেন। ক'দিন থেকে সেজদি অসুস্থ থেকে এখানে এসে জানা গেল, তাঁর গায়ে কিছু বেরিয়েছে। এখানে একজন আগ্রার পাস ডাক্তারকে এনে দেখানো হলো। ভিতরে কোন দোষ নেই. জ্বরও ছেড়েচে, কিন্তু এ অবস্থায় তাঁকে আর বেশীদূরে নিয়ে যাওয়ার সাহস ওঁরা করতে পারলেন না। বিশেষ গায়ের ওগুলো যে কি দাঁড়াবে তাও ঠিক বোঝা যাচ্চে না তো! অগত্যা দু'তিন দিনে কিছু সুস্থ হলে ওঁরা স্বামী-স্ত্রীতে দেরাদুনে ফিরে যাবেন এই স্থির ক'রে, তার সমস্ত বন্দোবস্ত করে এবং এখানের পাণ্ডাজীদের তাঁদের ভার দিয়ে আমরা নিতান্ত দুঃখিত-চিত্তে ওঁদের কাছে বিদায় নিলেম।

দেব প্রয়াগের দেব-নিবাস তুল্য দৃশ্যশোভা চিরদিনই মনে থাকবে। ভৈরবী তরঙ্গমালিনী অলকানন্দা এবং নির্ম্মল শান্তসলিলা দেবী জাহ্নবী, তাঁদের উচ্চ তটভূমে অঙ্কিত চিত্রবৎ সুপরিচ্ছন্ন ঘরদ্বার, বৃক্ষ বাজার পরিশোভিত অনতিবৃহৎ সহরটী, সবই আমাদের কাছে অপরিচিত ও অতীব বিস্ময়কর।

দেবপ্রয়াগ হ'তে বেরিয়ে আন্দাজ আধমাইলটাক এসেছি, পথে এক জটাধারী কৌপীনবন্ত আমাদের ডাণ্ডিগুলিকে লক্ষ্য করে সহাস্য আস্যে উপহাস করে উঠলেন,—

"রাম নাম সত্য হ্যায়,
দু'চারকে মৃত্যু হ্যায়।"

সন্ন্যাসী-পুঙ্গবের আশীর্ব্বচন শুনেই তো চক্ষুস্থির! দু'চার জনের মৃত্যু!

ঈশ্বর জানেন—তা'ও তো আর এমন কিছু অসম্ভব নয়, হ'লেই হলো বিশেষতঃ যে পথের পাশে পাশে মৃত্যুর দূত আমাদের ঠিক সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

সাত মাইল পথ এসে বৈকালে রাণীবাগ চটিতে পৌঁছে সেইখানে রাত্রিযাপন করা গেল। সকাল বেলা তিন মাইলে রামপুর চটিতে বিশ্রামাদি সেরে আবার অগ্রসর হলেম। এই রাস্তাটী যেমন প্রশস্ত তেমনই সুন্দর! কিছুদূর এসে চারিদিকের পর্ব্বত প্রাচীরের মধ্যে একটা প্রশস্ত সমতল ভূমি, শস্যসম্ভারে অন্নপূর্ণার অন্নথালির মতই ক্ষুধিতের দৃষ্টি ক্ষুধা সার্থক করে তুল্‌ছে দেখতে পাওয়া গেল। এর মাঝখানে একটা সুদৃশ্য গ্রাম। গ্রামের নাম মুলাসু। ইহার অনতিদূরেই অলকানন্দা। অলকানন্দার পরপারে গাড়োয়াল ষ্টেটের রাস্তাটি গঙ্গাদেবীর জন্মভূমি গোমুখী ও গঙ্গোত্রীর পথ নির্দ্দেশ করছে। নদীর পরপার থেকে টিহরী-গাড়োয়াল, এ পারে ব্রিটীশ গাড়োয়াল। অলকানন্দা এই দুই রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করে দিচ্ছেন।

এরই কাছাকাছি অনেকগুলি গ্রাম দেখলুম। এদের একটির নাম দিগোলী, একটির নাম জেলৎ। এখান থেকে শ্রীনগর পর্য্যন্ত প্রায় সমতলের উপর দিয়েই যেতে হয়। মধ্যে মধ্যে গ্রাম ও সুপ্রচুর শস্যক্ষেত্র এখনও এখানকার পূর্ব্ব রাজধানীর বিগত বিভবের সাক্ষী আছে। একদা এই শ্রীনগর স্বাধীন গাড়োয়ালের রাজধানী ছিল, এখন ব্রিটীশ গাড়োয়াল তাকে এই গৌরব থেকে বঞ্চিত করে, ওখান থেকে আট মাইল দূরে পাহাড়ের উপর পৌড়িতে রাজধানী করেছে। ব্রিটীশ গাড়োয়ালের ডেপুটি কমিশনর সেই খানেই থাকেন, তথাপি তার অতীত গৌরবগাথা

বহন করে’ শ্রীনগর আজও গড়োয়ালের মধ্যে প্রধান সহর হয়ে রয়েছে।

সেদিন ভীল্লকেশ্বরে আমাদের মধ্যাহ্ন যাপন হলো। অলকানন্দা এখানে অনেকখানি চওড়া এবং গভীরতাও তাতে বেশী, কারণ তাঁর উদ্দাম চপলতা এখানে অনেক খানিই কম। ঢুণ্ঢান্ নদীর উপর লোহার পুল পার হয়ে ভীল্লকেশ্বর শিবমন্দিরের অনতিদূরে নদীর উপরেই চটিগুলি অবস্থিত। কাণ্ডি চটি থেকেই এদিকের সমুদয় চটিই দ্বিতল এবং অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। ঘরদ্বার, রান্নার জায়গা, সমস্তই লেপা মোছা তক্‌তকে অবস্থায় পেয়েছি, প্রত্যেক দল যাত্রীর জন্যেই এরা যেন সর্ব্বদাই প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। এদিকের এই যে নিয়ম, এ বড় চমৎকার! এর জন্য রোগ অনেক কম হয়, সুবিধার তো কথাই নেই। এই সব লক্ষ্য করবার জন্য হেল্‌থ্ অফিসর, স্যানিটারী ইনস্‌পেক্টারের রীতিমত ব্যবস্থা আছে। পথে স্থানে স্থানে তাঁরা এসে পঙ্কু ও ফণি বাবুকে জিজ্ঞাসা করে গেছেন যে, কোনও চটিতে আমরা অপরিচ্ছন্নতা দেখেছি কি না? এই সব পুণ্যেই ইংরেজ আমাদের মাথার উপর বস্‌তে অধিকার পেয়েছে! পাশেই গাড়োয়াল ষ্টেট, তার পথ ঘাট চটির ব্যবস্থা কিছুই নাকি এ রকম নয়। আমরা ফেরবার সময় টিহরী দিয়ে যাবার কথা বলাতে কুলীরা এবং পাণ্ডাজীরা বল্লে, “সে পথের অসুবিধে আপনারা কি সইতে পারবেন? তার মেরামতের এমন ব্যবস্থাও নেই, তৈরিও এত ভাল নয়। বিশেষ চটি প্রভৃতি এরকমেরই নয়। ধর্ম্মশালা আছে ১০।১২ মাইল অন্তর, জলকষ্ট খুবই বেশী।” শুনে মনটা দমে গেল। আমার নিজের দেশের লোক, স্বধর্ম্মী রাজার রাজ্যের ব্যবস্থা বিধর্ম্মী ও

বিদেশীর চাইতে ভাল, এই কথাটা শুন লে মনে কতই না সুখ পেতাম!

তোমায় আগে লিখেছি বোধ হয়, এপ র চটির সঙ্গেই চটি-ওয়ালার দোকান। চটিতে থাকার জন্য ঘর ভাড়া দিতে হয় না, খদ্দের দোকান থেকে জিনিস কিনলেই থাকতে পায়। অবশ্য খাবার জিনিসের দামে ওরা বেশ পুষিয়ে নেয়। তা' নেবে নাই বা কেন? চটিগুলি প্রত্যেক বছর হয় তৈরি, না হয় মেরামত করতেই হয়। এদের কায তো এই ক'টী মাসেই শেষ। এর মধ্যে যতটুকু যা করে নিতে পারে। সমস্ত বৎসর তো বেকার হয়ে বসেই থাকতে হবে। ভাল চাল, মুগের ডাল, উত্তম ঘৃত, দুগ্ধ, এ প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যাচ্ছে, উপরন্তু এখানে সিম ও বেগুণ পাওয়া গেল। পাহাড়ী আলু।৵০ সের, বেগুণ।/০। নিকটবর্ত্তী কয়েকটা গাছে মোটা সোটা সজিনা খাড়া ঝুলে আছে দেখে আমরা লুব্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ চাকর পাঠিয়ে পাড়িয়ে আনালুম, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা রান্নার পরে মিষ্টরসের পরিবর্ত্তে রীতিমত তিক্ত রসই পরিবেশন করলেন! পাহাড়ী খাড়া যে এমন খাঁড়াধরা হবেন, তা জানলে ওর জন্যে অত হাঙ্গামায় কে' পড়তে যেত? মাঝে থেকে আমাদের দুটোর মধ্যের একটা ব্যঞ্জনই নষ্ট হয়ে গেল।

অলকানন্দায় স্নান করে ভিল্লকেশ্বরের মন্দিরে প করতে যাওয়া হলো। *পুরাতন ও ক্ষুদ্র হলেও মন্দিরটি নির্জ্জন ও পরিচ্ছন্ন। মন্দিরের মধ্যস্থলে তামার বেড়ের মধ্যে শিবলিঙ্গ। মা র উপর রূপার ছাতা, রূপার একটি কারুকার্য্যকরা চক্রাকৃতি চালচিত্র। প্রাচীরের গায়ে তক্তার* উপর কলসীতে জল রেখে একটি চেরা বাঁশের সাহায্যে সেই জলকে সরু

ধারায় ঠাকুরের মাথায় ঢালা হচ্ছে। আমাদের দেশে যেমন ঝারা দেওয়া হয়, সেই রকম বৈশাখী জল-ঝারা সম্পন্ন করার রীতি এদেশে আর কোথাও কিন্তু দেখি নি।

মন্দিরের বাইরেই একটি শেষশয়ান মূর্ত্তি। পাশের দিকে কয়েকটি মূর্ত্তিকে দ্রৌপদী ভীম প্রভৃতি ব'লে দেখানো ও পয়সা আদায় করা হয়। আমার মনে হল, এগুলি যেন বৌদ্ধ মূর্ত্তি। তারা দেবী, মঞ্জুশ্রী, প্রভৃতির মূর্ত্তি কোনও বৌদ্ধ ভগ্নস্তূপ হতে আনীত হয়ে থাকবে। সম্ভবতঃ নিকটবর্ত্তী প্রাচীন রাজধানী শ্রীনগরের ধ্বংস হ'তেই এসেছে। একখানি পাথরের উপরে একটি বিরাট পদচিহ্ন। এটি নাকি অর্জ্জুনের! বৈশালীর নিকটবর্ত্তী কলুয়ার অশোকস্তম্ভটিকে ওদিককার লোকেরা ভীমের লাঠি বলে শুনে থাকবে? ভীম না কি বাঁকে করে মাটি নিয়ে যাচ্ছিলেন, পথে বাঁক ভেঙ্গে যাওয়ায় মাটি দু'ঝুড়ি দুটি স্তূপ ও বাঁকের লাঠিটি স্তম্ভ হয়ে আছে! এত দিন যা কিছু বড়সড় তাই ঐ ভীমেরই একচেটিয়া ছিল, —তা কি বরেন্দ্রের কৈবর্ত্তরাজ ভীমের কীর্ত্তি, আর কি সারা ভারতবর্ষময় সম্রাট অশোকের। উত্তরাখণ্ডে তপস্যা করতে এসে অর্জ্জুনেরও যে পদ-বৃদ্ধি হয়ে গিছলো সে খবরটা কিন্তু এতদিনে জানতে পারা গেল! হ'তে পারে, আশ্চর্য্য নয়! হিমালয়ের হাওয়া খেয়ে যক্ষ্মা রোগীর রোগ সারে, আর অত বড় জঙ্গী জোয়ান ... পুরুষটার ওটুকু আড়ন বাড়বে না?

বিল্লকেদারের আসল নাম হচ্ছে, ভীল্ল-কেদার। কিরাতরূপী পশুপতি অর্জ্জুনের এই তপস্যা-ক্ষেত্রেই নাকি তাঁকে ছলনা দ্বারা পরীক্ষান্তে অবশেষে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেছিলেন।

উত্তরাখণ্ডের পত্র

এখানে বসে বহু দিন পরে গীতা পাঠ করলেম। অর্জ্জুনের স্মৃতিই হয়ত বা আমায় ঐ কার্য্যে প্ররোচিত করে থাকবে! কত সূক্ষ্ম ভাবেই যে আমাদের মনের উপর ক্রিয়া হয়, প্রথম সেটা যখন জানতে পারা যায় হঠাৎ নিরতিশয় বিস্ময়ের সঙ্গে একটা আনন্দও জেগে ওঠে। মহাভারতের কাল আর বনপর্ব্বটা, সমস্ত এক সঙ্গে মনে জাগ্রত হয়ে উঠলো। এই অলকানন্দার নির্ম্মল তরল প্রবাহরাশি, এই লতায় পাতায় বিজড়িত সরলোন্নত বৃক্ষ-সমূহ, মধ্যাহ্নের নাতিপ্রখর স্নিগ্ধোজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ-ধারায় অভিষিক্ত হয়ে সদ্যস্নাত ভারত যুদ্ধের ভবিশ্য মহা নায়ক হয়ত কোন্ সেই সুদূর দিনে আমাদেরই মত এমনই সময়ে ভক্তিপরিপ্লুতচিত্তে এই শান্তরসাস্পদ বনভূমির এইখানে তাঁর মৃগচর্ম্মখানি বিস্তৃত করে অভীষ্ট দেবতার ধ্যানে আত্মহারা হয়ে বসেছিলেন, আর যাঁর স্তুতিগান সেই ভক্ত হৃদয়ের প্রশস্ত অন্তস্তল হতে উৎসারিত হয়ে এই স্তব্ধ বিজন বনস্থলী পরিপূরিত করছিল, সেই তিনিই তখন কিনা ছদ্ম কিরাতরূপ ধরে তাঁকেই ছলতে আসচেন! এ দেবকৌতুক মন্দ না! অতীত গৌরবের এই জীর্ণ সমাধি নর-নারায়ণের প্রেমপাত্র অর্জ্জুনের স্মৃতিপূত ক্ষুদ্র ভীল্লকেদার আমার মনে একটা গভীর চিহ্ন অঙ্কিত রেখে দিলে। এর মধ্যে উচ্চ সাধনার, চরম সিদ্ধিলাভের একটুখানি নীরব ইঙ্গিত যেন মনের ভিতর থেকে অনুভব করে পাওয়া যায়।

আমাদের বিশ্রামাবসরে হঠাৎ ঘোর রবে ভৈরবের বিষাণ বেজে উঠলো! হা অদৃষ্ট! আমরা তো আর অর্জ্জুন নই যে, কিরাতরূপে ভগবান আমাদের দেখা দিতে আসবেন! দেখা গেল গাঢ় ঘন নীল রঙে পশ্চিমের পাহাড় গুলিকে ছুপিয়ে দিয়ে তরতর করে প্রকাণ্ডকায় মেঘের

উত্তরাখণ্ডের পত্র

পাহাড় পূর্ব্বাভিমুখে দ্রুত ছুটে আসছে। কালবৈশাখীর ঝড় জল একসঙ্গে এসে পৌঁছে গেল, ইচ্ছা হয় এদেরই কিরাত ও কিরাতিনী বলতে পারো। এ কিন্তু দেবপ্রয়াগের সেই পুঞ্জিত সজ্জিত কার্পাস-শুভ্র মেঘের স্তূপ নিয়ে নয়, নিকষ কালো অশনিবর্ষী কালমূর্ত্তি ধরে রুদ্রের প্রচণ্ড বিষাণ বাজিয়ে বাজিয়ে পুরাণের সেই কিরাতরূপেই এক মুহূর্ত্তে সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশটাকে যেন লণ্ড ভণ্ড করে দিলে। দেখতে দেখতে বড় বড় গাছ পাথর উপড়ে গিয়ে ত্রিপুরাসুরের মত চৌচাপটে শুয়ে পড়লো, শাখা পত্র সব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে দেহাংশের মত চারি দিকে ছড়িয়ে পড়লো, পথের উপর পাহাড়ের হুড়হুড়ে পাথর সব গড়গড় করে গড়িয়ে গেল।

মনে হয়েছিল, আজ আর আমরা এখান থেকে বেরুতেই পারবো না, কিন্তু খানিক পরেই বৃষ্টি থেমে গেল। স্ফুরিতবিদ্যুদ্বর্ষী কালো মেঘ পূর্ব্বাভিমুখী না হয়ে হঠাৎ উত্তরের দুরূহ পথ ধরেনিলে। আমরা এখন পূর্ব্বাভিমুখে, কাযেই আমাদের গতিপথে আর কোনই বাধা রইল না। অতি সুরম্য ও জলধৌত দিব্য যান দিয়ে আমাদের এবার শুভযাত্রা আরম্ভ হলো। আমার হঠাৎ মনে পড়লো 'মধুবাতা ঋতায়তে,—মধুমৎ পার্থিবং রজঃ"—মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ—এ' ও যেন তেমনই চারিদিক সুপ্রসন্ন ও মধুময়! জলধৌত বৃক্ষ লতায় স্নিগ্ধ সূর্য্যালোক ঝিলমিল করে উঠছে, দেবদারুর সরু পাতা সজল হাওয়ায় থর থর করে আনন্দে কম্পিত হচ্চে। নদীর জলে একটা মধুর মৃদু কলতান শ্রুত হচ্চে, চারিদিকেই মাধুর্য্যের ছড়াছড়ি,—মধু যেন সর্ব্বত্র থেকেই ক্ষরিত হচ্ছিল।

এই যে চারটি মাইল পথ, এ রাস্তাটির পরিসর স্থানে স্থ ১০ ফুট হওয়াও অসম্ভব নয়! এক ধারে আর সেই ৩০০, ৫ ফিটের, হাজার দেড়হাজার ফিটের পাতালস্পর্শী খাদ নেই। সুপ্রশস্ত সমতলের কোথাও তামাক ক্ষেত, কোথাও শাক সব্জী বে ও কপি, আর মাইলের পর মাইল ধরে পক্ক গোধূমের স্বর্ণও শীর্ষরাজী মন্দ অতিমৃদু অনিলভরে আন্দোলিত হচ্চে। ভীল্লকেদার থে শ্রীনগর পর্য্যন্ত এই ভূভাগটির সমস্তটাই প্রায়শ বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ জ অধিবাসিত গ্রাম ও উপনগরে পরিপূর্ণ। ভীল্লকেদারের পরপা অলকানন্দার একটী জলস্রোত এসে মিশেছে, তার নাম মার্কণ্ডে গঙ্গা। সেদিন সেখানে বোধকরি কোন যোগ ছিল, অনেক স্ত্রী পুরুষ স্নান করতে এসেছেন দেখা গেল। এপার থেকে ওপারে যাবার জন্য একটী লোহার পুল আছে, আর তার অল্প দূরেই টিহরী ষ্টেটের একটি সবডিভিসন কীর্ত্তিনগর। এখানে একজন ডেপুটি কলেক্টর থাকেন। ক্ষুদ্র সহরটির চুণকামকরা বাড়ীগুলি জলধৌত শুভ্র শুক্তির মতই, চিক্কণ শ্যাম গাছ পালার মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে দেখা যাচ্ছিল।

শ্রীনগরের প্রায় এক মাইলের কিছু আগে কমলেশ্বরের মন্দির। আসন্ন মেঘের ভয়ে আমাদের এখানে নামা হলো না, ফেরবার সময় হয়ত হবে। নদী-তীরে শ্রী-পীঠ বিরাজিত। এই শ্রীপীঠ বা লক্ষ্মীপীঠ থেকেই সহরের এই নামকরণ। শ্রীনগরের এই শস্যভাণ্ডারটিই যতদূর মনে হলো যেন এই দুর্গম বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রধান সম্বল। পাহাড়তলীর এই সহরটীও এ প্রদেশের পক্ষে যথেষ্ট সমৃদ্ধিসম্পন্ন।

উত্তরাখণ্ডের পত্র

বড় বড় বাঁধান রাস্তা, দু'সারি পণ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ ক্রয়বিক্রয়-সম্পন্ন বিপণিশ্রেণী, রাস্তায় জলের কল, আলো, পুলিস-পাহারা, বড় বড় বাড়ী, আধুনিক প্রথায় প্রস্তুত করা হাঁসপাতাল, স্কুল—সহরোচিত সমস্ত চিহ্নেই এ সহরকে চিহ্নিত দেখতে পেলেম। বাজারে তামা ও পিতলের বড় ঘড়া, স্নানের প্রকাণ্ড টব, বৃহৎ গামলা, থালা নূতন গঠনের তৈজসপত্র অনেক কিছুই দেখা গেল। এ সমস্ত এখানেই তৈরি হয়। তোমার সেজ মাসিমার একটা বড় ঘড়া সেই উমরাস্থ চটিতে দেখে অবধি কেনবার ইচ্ছা। তোমার মেসোমশাই ফেরবার পথে কিনে দেবেন প্রতিজ্ঞা করে তবে নিষ্কৃতি পেলেন। ঘড়াগুলির গড়নে একটু পাহাড়ী বিশেষত্ব আছে অবশ্য, তবে ১৫৲ টাকা কুলি ভাড়া দিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং আবার আনার মতন তেমন কিছুই নয়। জর্ম্মাণী ও জাপানী খেলনা, সিল্ক, মোজা, রঙ্গীন সুতি-কাপড় এ সবও দেখছি এই দুর্গম পাহাড়কেও কোন রকমে বঞ্চিত করতে পারেনি! সহরবাসিনীরা ছিটের সাড়ী জামা পরে খুব স্ফূর্ত্তি করে বেড়াচ্চেন। গলায় ঝুটা পলার মালার রাশও উঠেছে। ছোট ছেলে মেয়েরা দেবপ্রয়াগের পর থেকেই নেচে গেয়ে একটি পাই-পয়সা ভিক্ষে করে বেড়াচ্চে, সংখ্যা ক্রমেই বাড়চে। সহরের মধ্যেও এদের সংখ্যা কম নয়। প্রবেশোন্মুখ যাত্রীরাই এদের লক্ষ্য। একবার সহরে ঢুকে বাসা নিয়ে বসলে আর তাদের কিছু বলে না। সামান্য একটী পয়সা বা আধ পয়সা একটা পেলেও এরা সন্তুষ্ট। সবাই একই গান বা ছড়া আওড়ায় না, কেউ কেউ বলে,—

"মুনি মুনি যোগী করে রামজীকে সেওয়া, (সেবা)
পাথরমে পানি পড়ে রোজে না ভিজে
খাওয়ত ঘিউ খিচড়ী বাতাওয়ে মেওয়া"

কেউ বলে—

"রাজা চলে হাথি ঘোড়া পাল্কি সাজায়কে,
আর, যোগী চলে নেংটী পিন্‌হা চিম্‌টা বাজায়কে।"

এদিককার পাহাড়ে পাহাড়ী বলতে আমরা সাধারণতঃ যা বুঝি, সে রকম জাতের লোক বড় নেই। গাড়োয়ালীরা সাধারণতঃ উত্তর-পশ্চিমেরই অধিবাসী। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চতুর্ব্বর্ণভুক্ত। আমাদের ৫৬টা কুলির মধ্যে বেশীর ভাগই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। চেহারাও এদের বেশীর ভাগই উচ্চশ্রেণীর চেহারা। গায়ের রং এত কষ্টেও কারু কারু বেশ ফরসা। উঁচু গাঁয়ের ভদ্র নর ও নারীদের মুখও রং দু'ই চমৎকার। মুখের কাটুনী আর্য্য ছাঁদের, চোক নাক বেশ টিকোল। ভাষা পরিষ্কার হিন্দী। তবে আপনাদের মধ্যে যখন কথা কয়, তখন পাহাড়ী-মেশান ভাষায় কয়। "ঠিঠি" "ঠং ঠং" এই রকম একটা ঠকারের টঙ্কার শুনতে পাওয়া যায়। শূদ্ররা এদেশে জলচল নয়, তারা পাহাড়ী।

কালী-কমলীর ধর্ম্মশালার দুটি প্রকাণ্ড বাড়ীর একটীর দ্বিতলে দু'খানি ঘর ও রাস্তার উপরেই একটী রেলিং ঘেরা বারান্দা আমরা পেয়েছি। রান্নাঘর নীচের তলায়। সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে জলের কলে দিন রাত মোটা ধারায় জল পড়চে। এখানে এসে আমাদের সঙ্গে হৃষীকেশে পরিচিত এবং পূর্ব্বপরিচিত অনেকগুলি বাঙ্গালী যাত্রীর সঙ্গে দেখা হলো। এঁরা আমাদের এক দিন পরে বেরিয়েও আমাদের দেবপ্রয়াগে

বিলম্ব হওয়ার সুযোগে আমাদের সঙ্গ ধরে ফেলেছেন। দেবপ্রয়াগে ব্রিটীশ অধিকৃত পারে বা সহরে সে দিনের সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে এসে এঁদের কারু কারু সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এখানেও আবার হলো।

রুদ্রপ্রয়াগ

শ্রীমান্ অশোকনাথ—কল্যাণবরেষু—

তোমার "দাদি"কে লেখা পত্রে আমাদের শ্রীনগরে পৌঁছান খবর দিয়েছি, আজ আমরা শ্রীনগরেই থেকে গেলুম। তোমার সেজ মাসিমার আর পঙ্কজদিদির শরীর খারাপের জন্য আজ বেরুনো হলো না। হাঁসপাতাল থেকে ডাক্তারকে ডাকান হয়েছিল, একটু সাবধানে থাকা ও ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা করে গেলেন, ভয়ের কোনই কারণ নেই।

"শ্রীনগর" নামটী ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের রাজধানীর তা' জান তো? এ শ্রীনগরও এক সময় অ-বিভক্ত গাড়োয়ালের রাজধানী ছিল। অলকা-নন্দার বাম তটে এবং সমুদ্র পৃষ্ঠ হ'তে এর উচ্চতা আড়াই হাজার ফিট। এক মাইলের কিছু বেশী বিস্তৃত সমতলের উপর সহরটী অবস্থিত। এই শ্রীনগরটীও বেশ একটী শ্রী-সম্পন্ন নগরী। অলকা এর কিছু আগে খুব চওড়া হয়ে গেছেন, এখানেও এঁর বিস্তৃতি নেহাৎ কম নয়; তবুও ১৯৫১ সম্বতের বিরহীতালের বন্যায় এই শ্রীনগর প্লাবিত হয়ে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গ্যাছে। এখন যা দেখছি, এটা সম্পূর্ণ রূপেই নূতন তৈরি নগর এবং তা' চোকে দেখলেই জানতে পারা যায়। এখানে আসবার দুটী পথ প্রধান,—এক যে পথ দিয়ে আমরা আসছি, আর একটী কোটদ্বার রেল ষ্টেশন থেকে আধুনিক ব্রিটীশ

উত্তরাখণ্ডের পত্র

গড়বালের রাজধানী পৌড়ী হয়ে। হরিদ্বার থেকে শ্রীনগর ৭৫ মা কোটদ্বার থেকে ৫৭ মাইল, পৌড়ী এখান থেকে ৮ মাইল ম শ্রীনগর থেকে বদরীনাথ ১০৮ মাইল, কেদারনাথ ৭৫ মাইল, গঙ্গো ১৬০ মাইল, যমুনোত্তরী ১১০ মাইল। এখানে মনুষ্য সংখ্যা ন্যূনা তিন হাজার। এখানে সকল বর্ণের লোকই আছে, তবে বৈশ্য ব এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ী লোকের সংখ্যাই বেশী। এইটী ব্রি গড়বালের বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে তৈরি জিনিষের মধ্যে পিত্তল তামার বাসন প্রচুররূপে দেখলুম। সমস্ত চটিতেই এদের মূর্ত্তি দে এসেছি, এই বাসন চালান নেওয়া মিউলের জ্বালাও পথে পথে অনে ভুগতে হয়েছে। শুনলুম পাথরের মূর্ত্তিও এখানে নাকি তৈরি হয়, কি বাজারে একটাও দেখতে পেলুম না। পুরাকালে নাকি এখা চিত্রকরও যথেষ্ট ছিল, এখন বড় একটা নেই, তবে তাঁদের আঁকা ছ এখনও টিহরী দরবারে এবং সম্ভ্রান্ত লোকেদের বাড়ীতে রক্ষিত আছে এখানে হলদে সাবরের জুতাও তৈরি হয়। আমি এক জোড়া বে মজবুত জুতা ১।০ দিয়ে কিনেছি, মুচি বল্লে এ জুতা সমস্ত পাহা ঘুরে বেড়িয়ে ফিরে গিয়েও দু'বৎসর পরা চলবে, এবং শ্রীনগরের মুচিকে মনে পড়বে। তোমার পায়ের মাপ থাকলে এক জোড় কিনে নিতুম। কোন জুতাই তো তোমার পায়ে টেঁকে না,—শ্রীনগরের মুচির শক্তির তাহলে অগ্নি-পরীক্ষা হয়ে যেত!

এখানে সরকারী হাই স্কুল, হাঁসপাতাল, ডিস্পেন্সরী, পুলিস ষ্টেশন, ডাকখানা, তারঘর, সদাব্রত ফণ্ডের ঔষধালয় এবং কুলী এজেন্সী আছে। অনেকগুলি স্বেচ্ছা-সেবক যাত্রীদের সুখ-সুবিধার জন্য যথাশক্তি সাহায্য

চেষ্টায় নিরত রয়েছে। তাদেরই একটী ছেলে আমাদের সন্ধ্যার পর রাস্তায় দেখে সঙ্গে থেকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেল, বল্লে, "এখানে বিচ্ছুর বড্ড ভয়, সাবধানে রাস্তা পথে চলবেন।" এ "বিচ্ছু" বিছে কিন্তু নয়, বিছুটী! পথে ঘাটে যত্র-তত্র ঝোঁপ হয়ে জন্মায়, জ্বালা নাকি জীবন্ত জীববিশেষ বিচ্ছুর কামড়ের সমানই।

ধর্ম্মশালার পিছন দিকে আনুমানিক দেড়শো ফিট নীচে অলকানন্দার প্রবাহ। নদীর দুটী ঘাট আছে, একটি জৈন মন্দিরের কাছে বাঁধা, একটি কাঁচা। 'কালী কমলীর' ধর্ম্মশালা নামে খ্যাত কলিকাতার 'শেঠ'দের দ্বারা নির্ম্মিত এই বৃহত্তর ধর্ম্মশালা দুটির কিছু দূরে হনুমানজীর ক্ষুদ্র মন্দির। কিছু দূরে গৈরোলা মঠ বা বিষ্ণুমন্দির। এর সঙ্গেও একটি ধর্ম্মশালা আছে। অদূরে একটি সংস্কৃত পাঠশালা ও নাগেশ্বর মহাদেবের মন্দির। ধর্ম্মশালার পশ্চাতে জৈনদের একটি সুবৃহৎ মন্দির আছে। পূজারীর কাছে খবর নিয়ে জানলেম, ঋষভদেবের পুরাতন মন্দিরটি অলকানন্দার পূর্ব্বোক্ত বন্যায় ধ্বংস হয়ে গেলে পদ্মনাথ মনোহরলাল জৈনী এই নূতন মন্দির তৈরি করিয়েছেন। মন্দিরের আশে পাশে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করা ভাঙ্গা পাথরের রাশি পড়ে আছে,—পুরাতন মন্দিরের শেষ-চিহ্ন! এ ভিন্ন লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির ও হরিশর্ম্মা মুনিজীর ধর্ম্মশালা, সন্তলালের ধর্ম্মশালা ও বিষ্ণু-মন্দির গণেশ-মন্দিরসহ এক ধর্ম্মশালা ইত্যাদি বহুতর দেবায়তন ও ধর্ম্মশালা এখানে আছে। বিরহীতালের উপর পাহাড় ধ্বসে পড়ে ১৯৫১ সম্বতে অলকানন্দায় যে বন্যার সৃষ্টি করে, তাতে সমস্ত শ্রীনগরকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। পুরাতন শ্রীনগরের কোন কিছুই সেই ভীষণ বন্যার নির্ম্মম

হাত থেকে মুক্তি পায়নি, পেয়েছে শুধু কমলেশ্বরের মন্দির ও সেখানকার মোহন্তর প্রাসাদ প্রভৃতি। কমলেশ্বরে গোস্বামী-সম্প্রদায়ের লোকরাই পূজারী। প্রধান যিনি তাঁকে মোহন্ত বলা হয়। গড়বাল-নরেশের প্রদত্ত কিছু ভূ-সম্পত্তি দেওয়া আছে। বৈকুণ্ঠ চতুর্দ্দশীর দিন এখানে মেলা হয়, সন্তানেচ্ছু নারীরা জ্বলন্ত দীপ হস্তে সারারাত্রি মহাদেবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন। কমলেশ্বরের সিকি মাইল উত্তরে কংসমর্দ্দিনী দেবীর পীঠ বা মন্দির। কমলেশ্বরের এক মাইল পশ্চিমে অলকানন্দার তটভূমে শঙ্করমঠ নামক ধর্ম্মায়তন। বিরহীতালের বন্যায় এর সংশ্লিষ্ট ধর্ম্মশালা ও ঘর-বাড়ী সমস্তই ভেসে গেছে, এখনও জীর্ণোদ্ধার হয়ে ওঠে নি। ধর্ম্মাত্মা ও ধনীদের এই শুভাবসর! পুরাণে এখানকে অশ্বতীর্থ বা ধনুষ্‌ক্ষেত্র বলে উল্লেখ আছে। এরই কাছে অলকানন্দার গর্ভে শ্রীযন্ত্র নামক শিলা বিরাজিত। ভীল্লকেদার থেকে তিন মাইলে একটি রাস্তা এই দিকে আসবার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। শঙ্করমঠে বিষ্ণু-ভগবানের নিত্য পূজা বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণেই করে থাকেন। গড়বাল-রাজের প্রদত্ত কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি এখানেও দেওয়া আছে। এই পার্ব্বত্য প্রদেশ এখন যেটা জেলা গড়বাল ও টিহরী গড়বাল রূপে বিভক্ত হয়ে ব্রিটিশ ও স্বাধীন গড়বাল নামে ভূগোল ও ইতিহাসে স্থান পেয়েচে, শ্রীনগর সেই সংযুক্ত গড়বালের রাজধানী ছিল। এখানের রাজারা চন্দ্রবংশীয়। সর্ব্বপ্রথম এই রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা কনকপাল বিক্রমীয় ৬ শতাব্দীতে ধারা নগর (উজ্জয়িনী) থেকে এখানে আগমন করেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম নিজ রাজধানী ডিলংয়ে স্থাপন করেন। তার পর গড়বাল রাজধানী কিছু দিনের জন্য চন্দ্রপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উত্তরাখণ্ডের পত্র

অবশেষে চৌদ্দ শতাব্দীতে মহারাজ অজয়পাল এই শ্রীনগরে রাজধানীকে উঠিয়ে নিয়ে আসেন। অজয়পালের প্রতিষ্ঠিত শ্রীনগর বর্ত্তমান শ্রীনগরের এক মাইল পশ্চিমে অলকানন্দার উপরেই ছিল। অর্থাৎ যেখানে পৌরাণিক কালের উল্লিখিত শ্রীযন্ত্র নদীগর্ভে বর্ত্তমান, সেইখানেই অজয়পাল নিজ রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ স্থানে পুরাণোক্ত কালে রাজা সত্যসন্ধ ভগবতী দুর্গার আরাধনা করে বরলাভ করেন, ঐ স্থান শ্রীক্ষেত্র নামে বিখ্যাত। সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অজয়পাল নিজ রাজধানীর নাম রেখেছিলেন শ্রীনগর।

যেদিনে গড়বাল-রাজ শ্রীনগরে বাস করতেন, তখন অখণ্ডিত সম্পূর্ণ গড়বাল, মসুরী পাহাড় এবং দেরাদুন জেলা সমস্তই গড়বাল-নৃপতির অধীনে ছিল। সেদিনে—প্রথম ইংরেজ রাজ্যের সেই সূত্রপাতের দিনে সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপ্ত করে স্বজাতি-বিদ্বেষের ও প্রতিবেশী-পীড়নের নীচ স্বার্থপরতার এবং নির্ম্মম প্রতিহিংসার একটা অতি জঘন্য ঘৃণ্য অভিনয় চলছিল। মাৎস্যন্যায়ে দেশ উৎসন্নে যেতে বসেছিল। সবলেরা দুর্ব্বলকে লুণ্ঠন, এবং দুর্ব্বলেরা নিজেদের মধ্যে সহসাগত মিষ্ট হাসিও বাক্‌চাতুর্য্য সম্পন্ন বৈদেশিকদের সহায়তায় অত্যাচারীকে প্রতিশোধ দিতে গিয়ে ফলে সেই একই প্রকার হৃত-সর্ব্বস্ব, পরন্তু নিজের দেশেরই সর্ব্বনাশ সাধন করছিল। এই পার্ব্বত্য প্রদেশও সে যুগের ভারতবর্ষীয় রক্তের এই ক্ষুদ্রাশয়তা পরিত্যাগ করতে সমর্থ হয় নি। রক্তের দোষ গুণ যে হিমালয়ের গগনস্পর্শী পর্ব্বত চূড়ায় আর মহাসমুদ্রের তটপ্রান্তে সমানই ফলপ্রসূ হয়, আমাদের দেশের জাতীয় ইতিহাস তারস্বরেই তা' ঘোষণা করচে। এখানেও সে নীতির ব্যতিক্রম ঘটেনি।

সেদিনে এই পার্ব্বত্য রাজগণের মধ্যেও পরস্পরের প্রতি আ
ও প্রতি-আক্রমণ চলছিল। কখনও কুমায়ুনের রাজা (আলমো
গড়বালের উপর চড়াই করে তার খানিকটা অংশ নিজের মধ্যে
নিলেন, কখনও তার প্রতিশোধে গড়বাল কুমায়ুনকে পরাস্ত করে
একটা কেল্লা দখল করে বসলেন। এই রকম আপসে লড়ালড়ি ক
করতে দুজনেই যখন বেশ একটু কাহিল হয়ে পড়েছেন, তখন নেপা
গোর্খারাজ প্রথমে কুমায়ুনকে অধিকার ও তারপর গড়বালের উ
আক্রমণ করলেন। সম্বৎ ১৮৬০ অব্দে এখানের রাজা প্রদ্যুম্নশাহ গোর্খা
সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। তখন তাঁর পুত্র সুদর্শনশাহ নিতান্ত অল্পবয়
সেই হেতু যুদ্ধ নির্ব্বাহ সম্পূর্ণরূপে করতে না পারায়, গোর্খারা গড়বা
একটা প্রকাণ্ড অংশ অর্থাৎ প্রায় অধিকাংশ ভাগই অধিকার ক
ফেললে। অতঃপর মহারাজ সুদর্শনশাহ প্রাপ্তবয়স্ক হয়েই ইংরেজের স
মিত্রতা স্থাপন কল্লেন, তাদের সাহায্যে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করালেন; কিন্তু ঐ মিত্রতা এবং উপকার ঋণের পরিশোধার্থ গড়বালের অর্দ্ধাংশ এবং সারাংশ তাঁদের দান করে তবেই তিনি ঋণ থেকে মুক্তি পেলেন। এখন দেরাদুন, মসুরী আর হৃষীকেশ থেকে নীতিপাশ পর্য্যন্ত সমস্তই ব্রিটিশ গাড়োয়াল। গাড়োয়ালরাজ আর এখন গড়বালের রাজা নন, তিনি টিহরীরাজ। সুদর্শনশাহ তাঁর পিতৃমৃত্যু-প্রদ শ্রীন[illegible]কে অশুভ মনে করে নিজ রাজধানী টিহরীতে নিয়ে গেছেন। সেই থেকেই তাঁর রাজ্য টিহরী রাজ্য নাম ধারণ করেছে। ইংরেজাধিকৃত গড়বালকে জেলা গড়বাল বলা হয়। এই অংশেই কেদারনাথ, বদরীনাথ, যোশী বা জ্যোতির্ম্মঠ সমস্ত পুরাণেতিহাস প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। গঙ্গোত্তরী এবং

যমুনোত্তরী এই দুটী মাত্র টিহ্‌রী রাজ্যের ভিতরে। শ্রীনগর প্রথমদিকে ইংরেজ-রাজেরও রাজধানী ছিল। এখন ডেপুটী কমিশনর প্রভৃতি পৌড়ীতে বাস করেন। তার কারণ, শ্রীনগর জায়গাটা অধিত্যকা নয়, উপত্যকা। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে এখানে নাকি গ্রীষ্ম খুব প্রবল হয়। সেইজন্য পাহাড়ের উপর যেখানে শীতের প্রকোপ বেশী সেইখানেই শীতপ্রধান দেশের লোক নিজেদের আরাম বজায় রাখার ব্যবস্থা করেছেন। এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

মহারাজ অজয়পালের প্রতিষ্ঠিত পুরাতন শ্রীনগরে অলকানন্দার তীরে রাজপ্রাসাদ, গৈরৌলামঠ, শঙ্করমঠ, বদরীমঠ, কেশোরায়ের মঠ, জৈনী মন্দির, কংসমর্দ্দিনী প্রভৃতি দেবদেবীর মন্দির, ধর্ম্মশালা, সরকারী বাড়ী ঘর, বড় বড় সম্পন্ন গৃহস্থ ও ধনীদিগের আবাস ভবন বর্ত্তমান ছিল। ১৯৫১ অব্দে অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের এক আধিদৈবিক ঘটনায় সে সমস্তই নষ্ট ভ্রষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। বিরহীতালের যে বন্যার কথা তোমাদের বারে বারেই লিখেছি, তার আসল ব্যাপারটা এই ;— শ্রীনগর থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল উপরে বিরহীগঙ্গা নামে অলকানন্দার একটী উপনদীর সঙ্গমস্থান। ঐ নদীসঙ্গমের ৫।৬ মাইল উজানে একটী প্রকাণ্ড পাহাড় ধ্বসে পড়ায় ১৮৯৩ সালের অক্টোবর মাসে জলস্রোত রুদ্ধ হয়ে যায়। নালা কেটে ঐ জলস্রোতকে বার ক'রে দেবার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিস্তর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পাহাড়টা নিরেট পাষাণময় হওয়ায় তাঁদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল। আবদ্ধ স্থানে প্রচণ্ড জলস্রোত ক্রমশঃ স্ফীত হয়ে জমে উঠ্‌ছিল। ওরই দাপে সহসা পর্ব্বত-গাত্র বিদীর্ণ হ'লে নদীতীর-বাসীদের সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে, এই ভয়ে

গবর্ণমেণ্ট নোটিস দিয়ে অধিবাসীদের নদীতীর থেকে সরিয়ে দে
চেষ্টাও করেন। পাহাড়ভেদ হ'লে খবর দে'বার জন্য টেলিগ্রাফের
বসানও হয়। এদিকে ১৮৯৪ অব্দে ২৫শে আগষ্ট রাত্রিবেলা সহসা
বেগে জলস্রোত পাহাড় ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়ে' নদীর দুকূল ভা
নিয়ে ভৈরবী মূর্ত্তিতে ছুটে চল্লো। গবর্ণমেণ্টকৃত পূর্ব্ব সাবধান
অধিকাংশ লোকেরই জীবন রক্ষা হলো বটে, কিন্তু গ্রাম নগর সম
একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে শেষ হয়ে গেল। সেই হতে বহুদিনের সুস
এবং অধুনা পরিত্যক্ত পূর্ব্বতন রাজধানী শ্রীনগর সম্পূর্ণরূপেই শ্রী
শ্মশানে পরিণত হয়ে গেল।

আমরা (১৮৯০ খৃষ্টাব্দে) শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের "হিমালয়ে"—এবং তারও আটত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ১২৫৯ সালে ৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের তীর্থদর্শনে শ্রীনগর সম্বন্ধে দেখতে পাই—"এখানে টেরির রাজার কেল্লা আছে, এক্ষণে কোম্পানীর জেলখানা। আমাদের বাস জেলখানার উপরের ঘরে, এক্ষণে কয়েদী সেখানে কেহ থাকে না।" (তীর্থদর্শন")

"পুরাতন রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখতে গেলেম। গিয়ে দেখি সে এক লঙ্কাদগ্ধের ব্যাপার! সেই নীরস অনাবৃত পাহাড়ের বুকে ভগ্ন প্রাসাদের বড় বড় দেওয়ালগুলো হাঁ করে রয়েছে। তার খানিকটা তফাতে একটা প্রকাণ্ড পাথরের সিংহদ্বার। একটা চক এখনও বর্ত্তমান আছে। * * * চকের সম্মুখেই নহবতখানা এখনও ঠিক আছে, কোনদিক এখনও ভেঙ্গে পড়েনি।" ইত্যাদি,—("হিমালয়")

সেদিনে "হিমালয়ের" পর্য্যটক যখন লিখে রেখেছিলেন,—যে "আর

যদি দুএক বছর পরে কোন পর্য্যটক এখানে আসে ত এই স্তূপীকৃত ইট পাথরকে সুশ্যামল শৈবালসজ্জিত দেখে একটা ছোটখাট গিরিশৃঙ্গ মনে করবে।"—তখন হয়ত তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে, তাঁর ঐ লেখার পঁইত্রিশ বৎসর পরে একদল পর্য্যটক এসে ঐ 'ছোটখাট' গিরিশৃঙ্গের কোন চিহ্ন রেখাটিও আর খুঁজে পাবে না। পুরাতন শ্রীনগর তার সমস্ত অতীত স্মৃতিগৌরব ও লজ্জাস্কর বর্ত্তমানকে নিঃশেষ করেই অলকানন্দার প্রবাহ মধ্য ধুয়ে যেতে দিয়ে আবার নূতন হয়ে জন্ম নিয়েছে। এই নবকলেবরে এখনও তার কৈশোরই শেষ হয়নি।

শ্রীনগরের পরও অনেকদূর অবধি লোকালয় ও আবাদী সমতল ক্ষেত্র পাওয়া যেতে লাগলো। শ্রীনগরের একটী লক্ষ্মী-শ্রী সম্পন্ন উপনগর আছে তার নাম শ্রী-কোট। গড়বালের এই উপত্যকাটি বাস্তবিকই "শ্রী"নামের যোগ্য! আমগাছগুলি মুকুলে ভরা, তারই সুগন্ধে চারিদিক আমোদ করচে, মৌমাছিদের মৃদুগুঞ্জনের পরিসীমা নেই। চারিদিক দিয়েই ধনধান্য যেন উথলে পড়চে।

শ্রীনগর থেকে রৌদ্রকরোজ্জ্বল পরিষ্কার আকাশ দেখে যাত্রা করা স্বত্বেও অল্প পরেই মাথার উপর নিকষ কালো মেঘের ভীষণ ঘনঘটা লাভ করে আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেম। পথ এ দিনেও বেশ ভাল ছিল। বাহকরা যথাসাধ্য দ্রুতই চল্লো। দুপাশের গাছপালা ঝড়ের হাওয়ায় উদ্দাম হয়ে নৃত্য করচে, চামেলী জাতীয়, বকুল-গন্ধী সেই অসংখ্য ফুলের তীব্রগন্ধে বাতাস যেন আরও মেতেই উঠছিল। এদিনের পাহাড়ের পাদমূল থেকে আরম্ভ করে, মাথার উচ্চচূড়া পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই চিড় বা একজাতীয় দেবদারুতে ভরা ছিল। সেই গাছগুলোকে যেন পেখম-

গবর্ণমেণ্ট নোটিস দিয়ে অধিবা... নদীতীর থেকে সরিয়ে (চেষ্টাও করেন। পাহাড়ভেদ হ'লে ...'বার জন্য টেলিগ্রাফের বসানও হয়। এদিকে ১৮৯৪ অব্দে ২৫শে আগষ্ট রাত্রিবেলা সহসা বেগে জলস্রোত পাহাড় ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়ে' নদীর দুকূল ভা নিয়ে ভৈরবী মূর্ত্তিতে ছুটে চল্লো। গবর্ণমেণ্টকৃত পূর্ব্ব সাবধা অধিকাংশ লোকেরই জীবন রক্ষা হলো বটে, কিন্তু গ্রাম নগর স একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে শেষ হয়ে গেল। সেই হতে বহুদিনের সু এবং অধুনা পরিত্যক্ত পূর্ব্বতন রাজধানী শ্রীনগর সম্পূর্ণরূপেই শ্রী শ্মশানে পরিণত হয়ে গেল।

আমরা (১৮৯০ খৃষ্টাব্দে)শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের "হিমালয়ে এবং তারও আটত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ১২৫৯ সালে ৺যদুনাথ সর্ব্বাধি মহাশয়ের তীর্থদর্শনে শ্রীনগর সম্বন্ধে দেখতে পাই—"এখানে টে ...জার কেল্লা আছে, এক্ষণে কোম্পানীর জেলখানা। আমাদের জেলখানার উপরের ঘরে, এক্ষণে কয়েদী সেখানে কেহ থাকে না (তীর্থদর্শন")

"পুরাতন রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখতে গেলেম। গিয়ে দে সে এক লঙ্কাদগ্ধের ব্যাপার! সেই নীরস অনাবৃত পাহাড়ের বু ভগ্ন প্রাসাদের বড় বড় দেওয়ালগুলো হাঁ করে র... । তার খানিক তফাতে একটা প্রকাণ্ড পাথরের সিংহদ্বার। একটা চক এখনও বর্ত্তমা আছে। * * * চকের সম্মুখেই নহবতখানা এখনও ঠিক আছে কোনদিক এখনও ভেঙ্গে পড়েনি।" ইত্যাদি,—("হিমালয়")

সেদিনে "হিমালয়ের" পর্য্যটক যখন লিখে রেখেছিলেন,—যে "আর

যদি দুএক বছর পরে কোন পর্য্যটক এখানে আসে ত এই স্তূপীকৃত ইট পাথরকে সুশ্যামল শৈবালসজ্জিত দেখে একটা ছোটখাট গিরিশৃঙ্গ মনে করবে।"—তখন হয়ত তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে, তাঁর ঐ লেখার পঁইত্রিশ বৎসর পরে একদল পর্য্যটক এসে ঐ 'ছোটখাট' গিরিশৃঙ্গের কোন চিহ্ন রেখাটিও আর খুঁজে পাবে না। পুরাতন শ্রীনগর তার সমস্ত অতীত স্মৃতিগৌরব ও লজ্জাস্কর বর্ত্তমানকে নিঃশেষ করেই অলকানন্দার প্রবাহ মধ্য ধুয়ে যেতে দিয়ে আবার নূতন হয়ে জন্ম নিয়েছে। এই নবকলেবরে এখনও তার কৈশোরই শেষ হয়নি।

শ্রীনগরের পরও অনেকদূর অবধি লোকালয় ও আবাদী সমতল ক্ষেত্র পাওয়া যেতে লাগলো। শ্রীনগরের একটী লক্ষ্মী-শ্রী সম্পন্ন উপনগর আছে তার নাম শ্রী-কোট। গড়বালের এই উপত্যকাটি বাস্তবিকই "শ্রী"নামের যোগ্য! আমগাছগুলি মুকুলে ভরা, তারই সুগন্ধে চারিদিক আমোদ করচে, মৌমাছিদের মৃদুগুঞ্জনের পরিসীমা নেই। চারিদিক দিয়েই ধনধান্য যেন উথলে পড়চে।

শ্রীনগর থেকে রৌদ্রকরোজ্জ্বল পরিষ্কার আকাশ দেখে যাত্রা করা স্বত্বেও অল্প পরেই মাথার উপর নিকষ কালো মেঘের ভীষণ ঘনঘটা লাভ করে আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেম। পং এ দিনেও বেশ ভাল ছিল। বাহকরা যথাসাধ্য দ্রুতই চল্লো। দুপাশের গাছ[illegible] ঝড়ের হাওয়ায় উদ্দাম হয়ে নৃত্য করচে, চামেলী জাতীয়, বকুল-গন্ধী সেই অসংখ্য ফুলের তীব্রগন্ধে বাতাস যেন আরও মেতেই উঠছিল। এদিনের পাহাড়ের পাদমূল থেকে আরম্ভ করে, মাথার উচ্চচূড়া পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই চিড় বা একজাতীয় দেবদারুতে ভরা ছিল। সেই গাছগুলোকে যেন পেখম-

ছড়ান ময়ূরের মত দেখাচ্ছিল। ওদের এক একটা শাখা একটা করে ময়ূরপাখা। মনে হলো আকাশের কালো মেঘের চেয়ে চেয়ে যেন সমস্ত পর্ব্বতভূমে লক্ষ লক্ষ ময়ূর নৃত্য করে বেড়া ঝাউএর ঝুরঝুরে ঝুরির শেষে অল্প লাল ও ঈষৎ পীতাভ ফুলের ঝুরি থাকায় ঐগুলি যেন ময়ূরপাখার অধিক সাদৃশ্য লাভ করে ছিল।

মেঘের ভীষণ গর্জ্জন পর্ব্বতের ক কন্দরে প্রতিধ্বনিত হ লাগলো। টেলিগ্রাফের তার থেকে এক তীব্র মধুর ধ্বনি বে যাচ্ছিল। অতিদ্রুত ধাবনে পশ্চিমাকাশ হ'তে পূর্ব্বাকাশে সেই ঝটিক বিদ্যুৎ-বাহী মেঘের রাশি ছুটে আসতে লাগলো। দেখতে দে প্রচণ্ড ঝড় উঠলো।

শ্রীনগরের পাঁচ মাইল পরে শুকবৃতা চটি। এখানে নাকি জন্ম-বৈ জাতিস্মর ব্যাসাত্মজ শুকদেবের তপস্যাভূমি ছিল। চটি কিন্তু বে অল্প-পরিসর। এর নীচে দিয়ে যে পথ গিয়েছে, সেখানে বারাহু একটী গ্রাম আছে। পূর্ব্বকালে এক সময় এইখানে পরশুরাম ত করেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ঝড়ের বেগটা কাটিয়ে নিয়ে আমা বাহকেরা অগ্রসর হতে লাগলো। এইখানে থেকে ত্যকা ভূমি শেষ আবার অলকানন্দার ধার দিয়ে দিয়ে উঁচু াড়ের গায়ের রা আরম্ভ হলো। যেমন শ্রীনগরের পূর্ব্বে একবা তেমনই এইখানে আ অলকানন্দা যেন আটগুণ করে চওড়া হয়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘুরে গেছে এর সর্ব্বত্র জল না থাকলেও এর শুধু বিস্তৃত বালুচরে স্রোতোহত অস নোড়ানুড়ি এর সমস্তটাতেই বর্ষাবারির পূর্ণ প্লাবন সূচিত করছে। ম হলো এইখানে খানিকক্ষণ বসে থেকে একে ভাল করে দেখি!

এইখানে পৌঁছবার পরেই বাতাস আবার জোর করে এল, বেশ এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। ডাণ্ডিতে অয়েলক্লথ ঢাকাই থাকে, সঙ্গে ছাতাও ছিল। বৃষ্টিতে আমাদের পায়ে চাপা র‍্যাপারখানা এবং জুতা মোজা ভিজে গেলেও গায়ে মাথায় জল লাগেনি। এইখানে বলে রাখা ভাল যে এ পথের যাত্রীদের সঙ্গে সর্ব্বদাই একখানা অয়েলক্লথ বা রবরক্লথ এবং একজোড়া অতিরিক্ত জুতা থাকা উচিত। কখন যে বৃষ্টি আসে, তার কিছু ঠিক থাকে না। ঝাঁপান ও কাণ্ডির যাত্রীদের অথবা পাদচারিগণের বৃষ্টিতে ভেজার ভয় ডাণ্ডির যাত্রীদের চাইতে অনেক বেশী। ছাতা ও অয়েলক্লথ দিয়ে কোন রকমে আত্মরক্ষা করতে হয়।

পাহাড়ে ঝড় বৃষ্টিতে কবিত্ব যথেষ্ট, কিন্তু এর দ্রষ্টা হওয়াই ভাল, ভোক্তা হওয়ায় কোনই সুখ সুবিধা নাই। কড়্ কড়্ ঘড়্ ঘড়্ মেঘের ডাক, চারিদিকের পর্ব্বত গুহা থেকে তারই ভীম গম্ভীর নাদে প্রতিধ্বনি, ঝক্‌মকে বিদ্যুতের লক্‌লকে ছুরির মত লেলিহান শিখা, ঘন কালো মেঘের বুকের উপর ভৈরবের অট্টহাস্যের মতই ক্ষণ-চকিত হয়ে উঠছিল। বামপাশে প্রশস্তিভূতা ঝটিকা-তাড়িতা অলকানন্দার তীব্র আকুল আর্ত্তনাদ, বায়ুস্রোতোহত হয়ে আরও তীব্রতর ভাবে কাণে আসতে লাগলো। তার সঙ্গে ঝড়ের হাওয়ার উদ্ধত তর্জ্জন, অশান্ত বায়ুবেগে গগন-চুম্বিত গিরিশেখর হ'তে পর্ব্বতপদতল পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষরাজির শন্ শন্ ধ্বনি ও ক্বচিৎ তাদের মড়মড় শব্দে ভেঙ্গে যাত্রাপথের উপরে গড়িয়ে পড়া, গিরি-শিলার মধ্যে মধ্যে বায়ু তাড়িত হয়ে হুড়মুড় শব্দে নিম্নাবতরণ, এ সবই হয়ত লাগে ভাল, যদি না এর সঙ্গে জলে ভিজে রোগ হওয়ার, জিনিস-পত্র ভিজে বিপর্য্যস্ত হওয়ার, বাতাসের বেগে

ছাতি ও ডাণ্ডির টঙ্গগুলো উড়ে যাওয়ার, বৃষ্টির বেগে মাথার উপ
পাহাড় থেকে পাথর পড়ার, ঝড়ের হাওয়ায় ঘাড়ের উপরে চৌচা
শিথিলিতমূল গাছ পড়ার, এবং পথের পিছলে কুলিদের পা পি
খড়ে পড়ার ভয় না জড়িয়ে থাকে।

মহাভারত বনপর্ব্বে ১৪৩ অধ্যায়ে পার্ব্বত্য ঝঞ্ঝাবাতের একটি ?
হৃদয়গ্রাহী চিত্র দেখা যায়। এই বিবরণটি এমন স্বাভাবিক ও বিশদ
স্পষ্টই মনে হয় যে লেখক নিজের অভিজ্ঞতা হতেই সেটি ব
করেছেন। পর্ব্বত প্রদেশে ঝটিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ব্যতিরে
মাত্র কল্পনার আশ্রয়ে এরূপ চিত্র অঙ্কন সম্ভবপর বলে বোধ
না। এই বর্ণনাটি আমাদের অবস্থার প্রতীক হবে বলে এটি এখ
তুলে দিলুম,—

"এক প্রচণ্ড বাত্যা সমুত্থিত হইল এবং বহুল পত্রসঙ্কুল ও ধূলি
সমাকীর্ণ করত এককালে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ আকাশ আচ্ছন্ন করি
নভোমণ্ডল ধূলিকণায় আবৃত হওয়ায় আ ছুই পরিদৃষ্ট রহিল
তখন পাণ্ডবগণ প্রস্তরচূর্ণযুক্ত বায়ুতাড়িত হই এবং অন্ধকারাবৃত
হইয়া পরস্পরের বাক্য শ্রবণ বা পরস্পরকে সন করিতে সমর্থ হই
না। বাতভগ্ন ও ভূতলে পতিত বৃক্ষসমূহের অন্যান্য মহীরূহ সমূ
ভীষণ শব্দ অনবরত শ্রবণ-গোচর হইতে লাগিল। তাঁহারা অতিমাত্র
বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, আকাশ কি নিপতিত হইতে
অথবা ভূমি বা পর্ব্বত বিদীর্ণ হইতেছে?

"প্রচণ্ড বায়ুবেগে ভীত পাণ্ডবগণ অনন্তর পথ-পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষ
উন্নত বা অবনত বল্মীক-স্তূপসমূহ হস্তদ্বারা সন্ধান করিয়া লইয়া তাহা

অবলম্বন করিলেন। মহাবল ভীমসেন কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রৌপদীকে ধারণ করতঃ এক পাদপ আশ্রয় করিয়া রহিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ধৌম্য এক মহাবনে এবং সহদেব অগ্নিহোত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পর্ব্বতে আশ্রয় লইলেন। নকুল, লোমশ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ এক এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া সন্ত্রস্ত ভাবে রহিলেন।

"পবনবেগ মন্দীভূত ও ধূলিজাল অপসৃত হইলে মুষলধারে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল। চটচটা শব্দসহকারে ভীষণ বেগে মুহুর্ম্মুহু বজ্রধ্বনি ও আকাশ-পথে মেঘমালা মধ্যে ঘনঘন চঞ্চলার আবির্ভাব হইতে লাগিল। অনন্তর প্রবল বায়ুপ্রেরিত বারিধারা করকাসহিত চারিদিক সমাচ্ছন্ন করিয়া নিরবিচ্ছিন্ন রূপে পতিত হইতে লাগিল। তখন নদীসকল কলুষযুক্ত, ফেনবতী ও সর্ব্বত্র সমাকীর্ণ হইয়া মহীরুহগণকে আকর্ষণ করিয়া মহাশব্দে ভীষণবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই শব্দ উপরত, বায়ু শান্তভাব-প্রাপ্ত ও জলসমূহ নিম্ন স্থানে পতিত ও দিবাকর প্রাদুর্ভূত হইলে তাঁহারা আশ্রয়স্থান হইতে বহির্গত হইলেন এবং সকলে একত্র হইয়া পুনরায় যাত্রারম্ভ করিলেন।"

একটা ছোট পশলা বর্ষণের পরেই আমরা ভ[illegible]রা চটিতে পৌছে গেলাম। আমাদের লোকেরা আগে গিয়েই ক[illegible] কিনে গরম জল, আগুন প্রভৃতি করে রেখেছিল। যদিও এর একটা অংশের তলায় দোকানীর একখানি ছোট-খাট দোকান আছে, তথাপি একে দোতলা চটি বলতে পারলুম না, রাত্রে একটা চটি ভিন্ন বরাবরই আমরা দোতলা ঘর পেয়ে এসেছি, তাই এ রাতটায় একটু অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। বিশেষতঃ আমাদের গাইড বুকে একখান থেকে উপর দিকের কতকগুলো

স্থানকে ন’ ভ’ ব’ভ’ বা “নরভক্ষক ব্যাঘ্রভীতি” শব্দে চিহ্নিত ক রেখেছে। তাই মনে একটু ভয়ের ছায়াও যে পড়ে নি, তা’ ব যায় না। পঙ্কু সহজে ভয় পায় না, তবু রিভলবারটা খোঁজ ক বালিসের তলায় রেখে দিলে।

আমরা অবশ্য শ্রীনগরেই শুনে এসেছি যে, কয় বৎসর এই ব্যাঘ্রপু নিরীহ তীর্থযাত্রীদের উপর যথেষ্ট উপদ্রব করবার পর, তাকে অে চেষ্টায় শিকার করা হয়েছে। এলাহাবাদ থেকে কে’ একজন জে (জেনারেলই সম্ভব) সাহেব এবং টিহ্‌রী ষ্টেটের কেউ কেউ—এম দেশী বিলাতী অনেক জনে মিলে অনেক চেষ্টা করে, দু’তিন বৎসে যত্নে গত বৈশাখে সেই গুরুভোজন পরিপুষ্ট প্রকাণ্ড বাঘটিকে নিঃ করেছেন। তথাপি রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যেতেই সেই পূর্ব্বশ্রুত ব্যা কাহিনী মনে পড়ে গেল। আমাদের সঙ্গে ৫৬টি কুলি, পাণ্ডার চাক গোমস্তা ও আমাদের চাকর-বামুনে ৭।৮ জন, পিস্তলও ভরা থাবে তবু ‘নরভক্ষকব্যাঘ্র’ শব্দটাও তো তুচ্ছ নয়! বিশেষ সে নাকি তি বৎসরে ৩০০ জনকে খেয়েছে। তা’ তার বাচ্চাগুলিও তো আবা এতদিনে বড়সড় হলো! বাঘিনীটিও তো কাছাকাছি কোথাও ঝোঁে ঝাপে আছেন! তবে যদি বিধবা হয়ে তিনি এক্ষ মাংসাহার ছেে দিয়ে থাকেন তো সে অবশ্য আমি বল্‌তে পারিনে।

অতি প্রত্যুষে উঠে এদিন (৬।৫।২৭) খুব সকাল সকালই বেরুনে গেল। ভট্টিসেরা চটির পাশ থেকেই খুব উঁচু একটা দু’মাইলের খাড় চড়াই। পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে চোক যেন হঠাৎ ঝল্‌সে গেল ধবলাগিরির সহসা দৃষ্ট অস্পষ্ট ছবি নয়! সেই প্রভাত-সূর্য্যকিরে

উত্তরাখণ্ডের পত্র

কোটী কোটী মণ পালিশকরা খাঁটি রূপার পাতকে ঔজ্জ্বল্যে পরাস্ত করে দিয়ে কেদার ও তার পিছনকার মহাপথগিরিচূড়া প্রথম দৃষ্ট হলো। এ শোভা অনির্ব্বচনীয়! এর তুলনা যে কোথায় আছে, খুঁজতে গিয়ে আমি দিশাহারা এবং প্রকাশ করতে গেলে ভাষাহারা হবো। স্পষ্ট পরিষ্কার অনেক নিকটে উচ্চাবচ চিরতুষারাবৃত বিশাল পর্ব্বতমালা আমাদের বিস্মিত দৃষ্টিকে চমৎকৃত করে তুলে স্থির গম্ভীর মূর্ত্তি ধরে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। যতই দেখি, মনে একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ এবং বুকে একটা অনিশ্চিত ভয় এক সঙ্গেই যুগপৎ জেগে উঠতে লাগলো। ভয় হচ্ছে এই ভেবে যে, ওরই উপর নাকি আমাদের যেতে হবে! কেমন করে যাব? পারবো ত? কেদার এখনও সম্পূর্ণরূপেই বরফাবৃত। তার কোনখানেই বরফ গলার কৃষ্ণচিহ্নটী পর্য্যন্ত দেখা গেল না। আর আনন্দ? এই অপরূপের—এই নূতনতর অপ্রত্যাশিত অজানিত রূপের রাশি দর্শনের! সুন্দরের নূতন নূতন সৌন্দর্য্যে দৃষ্টি-ক্ষুধা যেন মিটে যাচ্চে, মনের মধ্যে সুধার স্রোত যেন জমে উঠছে। মনে হচ্চে, আহা! কে কোথায় আছিস, তোরা দেখে যা! এই শান্ত গম্ভীর চিরস্থির, চিরোজ্জ্বল হিমায়তন দেখে আজ "কুমার-সম্ভবের" সেই শ্লোকটি হঠাৎ মনে পড়ে গেল :—

"অনন্তরত্নপ্রভবস্য যস্য
হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্।
একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃকিরণেষ্বিবাঙ্কঃ॥"

আমার মনে হয়, হিম এঁর দোষ নহে, পরন্তু তাই এঁর প্রধান বিশেষত্ব

ও প্রকৃষ্ট গৌরব! ভারতে অতুলনীয় এই হিমসম্পদই তো এঁর দর্শনকে এত লোভনীয় করে রেখেছে। নতুবা বিন্ধ্যগিরি দেখেই তো পাহাড় দেখার সাধ মিটে যেতে পারত।

আচ্ছা, এই প্রভাত-অরুণ-রাগে অনুরঞ্জিত দীপ্তিমান হিমগিরির সমুন্নত-চূড়া, এর সঙ্গে কিসের তুলনা দিব?

"রজতগিরিনিভং"—এই পদটী মন্দ হয় না, না? কিন্তু তাই বা বলি কি করে? পালিশ-করা রূপার পাত দিয়ে যদি কেউ এই গিরি-শৃঙ্গকে মুড়ে দিত, সেও কি এতটাই সাদা হতে পারতো? এ যেন আরও শুভ্র, আরও উজ্জ্বল, সমধিক নেত্রতৃপ্তিকর! হীরার পাহাড়? হবেও বা! ডবল কাটের কমলহীরার সঙ্গে হয় ত বা কিছু মিল থাকতেও পারে। তবে গোষ্পদ থেকে সমুদ্রের ধারণা করা তো সহজ নয়, তাই বলতে পারলেম না যে, অতবড় একটা হীরার পাহাড় যদি কোনও দৈত্যমায়ায় দৈবাৎ কখনও সৃষ্ট হয়, তাহলে এর সঙ্গে তার বা তার সঙ্গে এর তুলনা করা চলবে কি চলবে না! আকাশের পুঞ্জিত নবরবি-কিরণ-রঞ্জিত শুভ্রমেঘও যেন এর কাছে হার মেনেছে! তাই বলি, এই সমুন্নত, সমুজ্জ্বল, চিরশুভ্র, সার্থক-নামা হিমগিরির নীলাকাশ-চুম্বিত তুঙ্গ শৃঙ্গ এ অনির্ব্বচনীয়! এর সম্বন্ধে স্তব্ধ বিস্ময়ে শুধু বলতে হয় —"তোমারই তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে।"

ভট্টিসেরা থেকে এদিনে আমরা এই পথ দিয়ে এগার মাইল অতিক্রম করে বেলা সাড়ে এগারটায় রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছলাম। বাঘের ভয় লেখা চটিগুলিতে রাত কাটাতে ভরসা নেই, তাই এবেলা বেশী চলিয়ে ওবেলা আজ বাহকদের ছুটি দেওয়া হবে স্থির হলো।

এই পথটীতে চড়াই উৎরাই খুব বেশী বেশী পাওয়া গেল। এক মাইল চড়াই তো দেড় মাইল উৎরাই। ফের এক মাইল চড়াই তো এক মাইল উৎরাই, এই রকমই বেশার ভাগ। সোজা রাস্তাও মধ্যে মধ্যে আছে, না হলে লোকে পারবে কেন?

প্রয়াগে পৌঁছবার প্রায় আধ মাইল আগে একটী ছায়াবহুল আম্র-বাগানের মধ্য দিয়ে রাস্তা ও অদূরে কতকগুলি চূণকাম করা ঘর বাড়ী দেখা গেল। দুটী পথের একটীতে ইন্‌স্‌পেকসন্ বাংলোর পরিচয় সাইন বোর্ডে দেওয়া আছে। অপর রাস্তাটিতে একটি সংস্কৃত পাঠশালার খবর পাওয়া গেল। আমাদের বাহকেরা এই খানকেই রুদ্রপ্রয়াগ মনে করে ডাণ্ডি নামাচ্ছিল।

লোহার পুল পেরিয়ে রুদ্রপ্রয়াগে ঢোকা গেল। পুলের গায়েই লেখা আছে, কেদারনাথ এখান থেকে ৪৮ মাইল।

রুদ্র প্রয়াগ

শ্রীমতী নলিনী দেবী—কল্যাণবরাসু,

বউমা, ইতিহাস ভূগোলে, ভারতবর্ষের মানচিত্রে উত্তরাখণ্ডের সংবাদ কিছু কিছু পেয়েছ। রামায়ণ মহাভারতেও এদিকের অনেক খবর আছে। তার উপর তুমি সিমলা পাহাড়ে বহুকালই বাস করেছিলে, এ দিককার অনেকটাই তুমি বুঝতে পারবে। আর আজকালকার দিনের ছেলেমেয়েদের ভিতর উত্তরাখণ্ডের নাম শোনেনি, এমন ক'জন আছে! এই হিমবন্ত প্রদেশের স্বচ্ছ স্ফটিক সদৃশ সুশোভন এবং সমুজ্জ্বল হিমাচ্ছাদিত সমুচ্চ শিখরসমূহ—এর গগনস্পর্শী মেঘমালা-মণ্ডিত বিশাল

বিরাট বপুদেহ।—এর সুদূর-বিস্তৃত সঘনবনরাজি যাতে কোথাও অম্বর চুম্বিত সুদীর্ঘ দেবদারু প্রভৃতি, কোথাও অসংখ্য নর-প্রয়োজনীয় অমৃত এবং বিষ-স্বরূপ ওষধি তরুগণ, কোথাও সুস্বাদু দুষ্প্রাপ্য ফলবৃক্ষাদি এবং সুপ্রচুর ও প্রচুরতররূপে সুগন্ধিত ও সুদৃশ্য পুষ্পতরু ও অজস্র লতাকুঞ্জ-সমাকীর্ণ পাদপরাজি। এই দেবভূমি অসংখ্য জলস্রোতকে নিজের উদার বক্ষে ধরে স্বচ্ছ সুস্বাদু সুনির্ম্মল জলধারাকে ধরণী-বক্ষ শোভিত করতে স্নিগ্ধ করতে পাঠিয়েছে। জাহ্নবী যমুনা প্রভৃতি প্রায় সমুদয় লোকবিখ্যাত নদ-নদীর জনক এই পর্ব্বতরাজ হিমালয়। হিমালয়ের গিরিগহ্বরে এখনও কতশত পবিত্রচেতা, সর্ব্বত্যাগী মহা তপস্বী নরদেহেই দেবতাত্মতা লাভ করে ধরণীকে পবিত্র ও জননীকে ধন্যা করছেন। এই রত্ন-প্রসূতা ভূমিভাগে বহু ধাতুপ্রস্তরাদির সমাবেশে এঁকেও "রত্নাকর" আখ্যায় আখ্যায়িত করতে সমর্থ। এই তপোভূমির দুর্গম গিরিকন্দরে যুগযুগান্তরাবধি কত শত-সহস্র মহর্ষি ও মহারাজাধিরাজগণ তাঁদের তপস্যাপূত পবিত্র জীবনের অবসান করে আজও সেই পুণ্যসৌরভে এখানে পবিত্রতার সমাবেশ করে রেখেছেন। এই দিব্য স্থানে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ও শরীরে নবীন স্ফূর্ত্তি ও বলপ্রদানের যোগ্য কত বিশুদ্ধ জল-বায়ুযুক্ত স্বাস্থ্যনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হয়েচে এবং আরও কত হবে, তার ইয়ত্তা নেই। এই সুরম্য ভূমির সংস্পর্শে একাধারে দেহ মন একাগ্র, সুপ্রসন্ন, পবিত্র এবং প্রশান্ত হয়ে উঠে। বিমল আনন্দ এবং কঠোর বৈরাগ্য একত্র পাশাপাশি হয়ে যেন শুধু এই চিরবৈরাগী ও চিরানন্দময়,—যুগযুগান্তর-প্রসিদ্ধ সিদ্ধ-চারণ-নিষেবিত, ভাবুক-কবিজন-বিহারিত এই হিমাচল-বক্ষেই বাস করচে। মানবের ক্ষুদ্র চিত্ত এখানে এলে যেন

উত্তরাখণ্ডের পত্র

মহতের সংসর্গেই মহত্তর ও উদারতর হয়ে ওঠে। এই জন্যই চাণক্য বলেছেন—"*সমশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টশ্চ বিশিষ্টতাম্*"। উচ্চ *পর্ব্বত-নিবাসী ও পর্ব্বতান্তর প্রবাসী মেঘদূতের যক্ষও নিজ জীবনে এই* অলঙ্ঘ্য প্রভাব অনুভব করেছিল।

ভারত বিখ্যাত বদরীবন, যেখানে নরনারায়ণ সাংসারিকগণের জন্য তপস্যা মার্গ প্রবর্ত্তিত করে গিয়েছিলেন, তাই বদরীনাথ নামে বিখ্যাত। জগৎপ্রসিদ্ধ কৈলাস পর্ব্বত এবং মানস-সরোবর এরই শেষে। জগজ্জননী মহামায়া ভগবতী এই স্থানেই গিরিরাজ-তনয়ারূপে পার্ব্বতী আখ্যা লাভ করেছিলেন, আবার এইখানের পুণ্য তপোবনে তপস্যা করে জগৎপাতাকে পতিলাভ করেন।

সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার, নারদ, বৃহস্পতি, ভৃগু, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, জমদগ্নি, অত্রি, গৌতম, মার্কণ্ডেয়, দুর্ব্বাসা, পরাশর, পরশুরাম, ব্যাস, শুকদেব, বিশ্বামিত্র, সগর, ভরত, ভগীরথ, ধৃতরাষ্ট্র ইত্যাদি অনেকানেক দেবর্ষি, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি এবং রাজর্ষি এই দিব্যভূমিতে তপস্যা করেছিলেন। পঞ্চ পাণ্ডবের জন্মস্থান এবং শৈশব-ক্রীড়া-ভূমি এবং তাঁহাদের স্বর্গগমনের পথও এইখান দিয়েই।

আবার পুরাণাদিতে যেমন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগাদির ঋষি-মুনিদের তপোভূমি বলে উত্তরাখণ্ডের প্রসিদ্ধি, কলিযুগের মহাত্মাগণের সম্বন্ধেও তেমনই ঐতিহাসিক প্রমাণে জানা যায় যে শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, তুলসীদাস, সমর্থ স্বামী, রামদাস প্রভৃতি এই পুণ্যভূমিতেই তপঃসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই দেবভূমি যুগযুগান্তর হতে অদ্যাবধি ভক্ত

উত্তরাখণ্ডের পত্র

মানবকে দেব-সান্নিধ্য প্রদান করণের প্রধানতম সহায় হয়ে আ
এইখানে তাই এঁর সেই "দেবতাত্মা" নাম সার্থক হয়ে উঠে
কালিদাস তাঁর 'কুমারসম্ভবে' লিখেছেন,—

"অস্ত্যোত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।"—

এই উত্তরাখণ্ডের সর্ব্বত্র এখনও অনেকগুলি পুরাণোক্ত এবং ইতিহ
প্রসিদ্ধ প্রথিতযশা তপস্বীর তপঃসিদ্ধিভূমি তাঁদের নামে প্রসিদ্ধ হ
আছে। এই উত্তরাখণ্ডের তীর্থসমূহ ভারতবর্ষের অপর সকল তীর্থ
হতে প্রাচীনতর। এর উদাহরণে এই কথা বল্লেই যথেষ্ট হবে যে দ্বার
অযোধ্যা, মথুরা, বৃন্দাবন, এই সকল স্থান শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণা
আবির্ভাব-কাল হ'তে বা তিরোভাবের পর হতে তীর্থীভূত হয়েচে, বি
*ঐ সকল যুগেও পুরাণাদিতে বদরীনাথ প্রভৃতিকে প্রাচীন তীর্থরূপে গ
করা হয়েছিল। এই সকল তীর্থমহিমা পুরাণাদিতে সবিস্তারে লিখি
আছে। কবির ভাষাতেও ইনি ভারতবর্ষের ললাটদেশ, এবং এঁর চূড়
তাঁর মস্তকের কিরীট-ভূষণ—*

"অম্বর চুম্বিত ভাল হিমাচল,
শুভ্র তুষার কিরীটিনী—" রবীন্দ্রনাথ।

এঁকে অন্যত্র পৃথিবীর মানদণ্ড রূপে কল্পনা করা হয়েছে, "স্থিতঃ পৃথিব্যা
ইব মানদণ্ডঃ।"—কলিদাস।

মহাভারত বনপর্ব্বে ৯০ অধ্যায়ে উত্তরাখণ্ডের তীর্থসমূহের এই
পরিচয় আছে।—

গন্ধর্ব্বযক্ষরক্ষোভিরপ্সরোভিশ্চ সেবিতম্।
কিরাতকিন্নরাবাসং শৈলং শিখরিণাং বরম্॥ ২০

উত্তরাখণ্ডের পত্র

বিভেদ তরসা গঙ্গা গঙ্গাদ্বারং যুধিষ্ঠির।
পুণ্যং তং খ্যায়তে রাজন্ ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্ ॥২১
সনৎকুমারঃ কৌরব্য পুণ্যং কনখলং তথা।
পর্ব্বতশ্চ পুরুর্নাম যত্র জাতঃ পুরূরবাঃ ॥২২
ভৃগুর্যত্র তপস্তেপে মহর্ষিগণসেবিতে।
রাজন্ স আশ্রমঃ খ্যাতো ভৃগুতুঙ্গো মহাগিরিঃ ॥২৩
যঃ স ভূতং ভবিষ্যচ্চ ভবচ্চ ভরতর্ষভ।
নারায়ণঃ প্রভুর্ব্বিষ্ণুঃ শাশ্বতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥২৪
তস্যাতিযশসঃ পুণ্যাং বিশালাং বদরীমনু।
আশ্রমঃ খ্যায়তে পুণ্যাস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥২৫
উষ্ণতোয়বহা গঙ্গা শীততোয়বহা পুরা।
স্বুবর্ণসিকতা রাজন্ বিশালাং বদরীমনু ॥২৬
ঋষয়ো যত্র দেবাশ্চ মহাভাগা মহৌজসঃ।
প্রাপ্য নিত্যং নমস্যন্তি দেবং নারায়ণং প্রভুম্ ॥২৭

"যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের কর্ত্তা, শাশ্বত, পুরুষোত্তম, প্রভু, বিষ্ণু, নারায়ণ অতিযশা, তাঁহার ত্রিলোকবিশ্রুত পুণ্য আশ্রয় বদরী বিশালায় অবস্থিত। সেই স্থানের পূর্ব্বে শীতলজলবাহিনী গঙ্গা নদী উষ্ণজলবাহিনী ও সুবর্ণসিকতা হইয়া প্রবাহিতা। মহাভাগ ও মহাতেজস্বী দেবতাগণ ও ঋষিগণ প্রতিনিয়ত সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক প্রভু দেব নারায়ণকে প্রণাম করেন।"

এই উত্তরাখণ্ড তাই আমাদের কাছে মহামহিমান্বিত পূর্ব্বপিতৃ-পিতামহগণের মতই সশ্রদ্ধ ভক্তি-সম্ভারে চির পূজনীয়। ফিরে গিয়ে

তোমাদের সঙ্গে এই সকল ইতিহাস পুরাণোক্ত মহাপুরুষদের আলোচনা করবার ইচ্ছা রইলো।

বেবেঙ্গচটি

শ্রীমান্ অম্বুজনাথ—কল্যাণবরেষু—

অমি,

আমরা ৭।৫।২৭ তারিখে দুপুরবেলার কাছাকাছি রুদ্রপ্রয়াগে (করলেম এই খবর আগের চিঠিতে দিয়েছি।

এইখান থেকে কেদারের রাস্তা আরম্ভ হবে। এত দিন ত পূর্ব্বাভিমুখী ছিলেম, এইবার উত্তরগামী হবো। আজ সকালে হিমা চিরতুষারাবৃত উচ্চ চূড়া দেখে নয়ন মন জুড়িয়ে গেছে,—মনে হচ্চে শ্রম যেন সার্থক হ'য়ে গেল! সাধ করে কি আর সেই আবহমান ধরে শত শত ঋষি তপস্বী মহাত্মা মহাপুরুষরা অসহ্য শৈত্য ও অ ক্লেশ স্বীকার করেও এই হিমবন্ত প্রদেশকে তাঁদের সাধনার করেছিলেন! এঁকে না দেখলে পৃথিবীর মস্ত একটা ঐশ্বর্য্যকেই হয় না। আজ শয়নে স্বপনে কেবল সেই বিরাট বিপুল শুভ্র সুন্দর মনে জাগচে। সে যেন আমাদের সেই চির উপাস্যেরই মূর্ত্তরূপ যাঁ আশৈশব থেকেই মনে মনে ধ্যান করে আসচি,—

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাব ংসং,

রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং—" ব'লে।—সেই "রজতগিরিনিভ", সেই-"রত্নকল্প-উজ্জ্বলাঙ্গ"কেই যেন আজকের এই বৃষ্টি-ধৌত সুপ্রসন্ন প্রকৃতি পরম পরিতোষের মধ্যে, শিশু-তপনের রক্তোজ্জ্বল স্বর্ণচ্ছটায় অভিনন্দি হতে দেখলেম। এই প্রথম দেখা অপরূপকে কখনও ভুলতে পারা যা

না। এ আমার মনেও হচ্চে না হিমালয়ের চূড়া, আমি যেন তাঁকেই দেখলুম, যাঁকে কোথাও কোনদিন দেখতে পাইনি !

রুদ্র প্রয়াগ দেখে ক্ষুব্ধ হ'তে হলো। দেবপ্রয়াগের মত মোটেই নয়। একটী বড়গোছের চটি বল্লেই হয়। ধর্ম্মশালা, সদা-ব্রত সেবাশ্রমের ক্যাম্প, (এখানেও সেবা-সমিতির ছেলেরা খুব খাটচে, সকল বড় জায়গাতেই তারা তাদের সেবাব্রত পালন করচে। দেখে সুখ এবং গৌরব দুই সমান হয়। এইসব কৃচ্ছ্রসাধনকারী পরার্থে আত্মসুখ বিসর্জ্জনদাতা দেশের সুপুত্ররা অধিকার পেলে কোন্ মহত্তর কার্য্য না সাধন করতে পারবে ? স্বরাজ পাবার যোগ্যতা তো এই রকম করেই অর্জ্জন করতে হয়।) সামান্য দু'চারখানা দোকান, তার একখানাতে গোটাকতক বাজে ছাতা ও কম্বল ঝুলছে, দু'খানায় ঠক্‌ঠকে ক্ষীরের পেঁড়া ও কতকালের বাসি ছোলা ভাজা সাজান রয়েচে। গুড়ের রসে কেউ কেউ জিলিপি পাক ও করছে। আর চালডাল নুন তেল আলু ও ঘি ছাড়া কিছুই নেই। স্নানের ঘাট ও রুদ্রনাথের মন্দির এই নিয়েই রুদ্র-প্রয়াগ।

ওপারে এপারের চাইতে দোকান পসার বেশি ও সহরও বড়। যেসব যাত্রীরা সোজা বদরী যাত্রা করে, তারাই ওপারে বাসা নেয়, কেদারের যাত্রাপথ এপার দিয়ে—মন্দাকিনীর তীরে তীরে। এই ঘাটের সিঁড়ি যেন স্বর্গ হতে সোজা পাতালে নেমে গেছে। এর দুপাশ খোলা, এক একটী ছোটখাট পাহাড়ের মতনই উঁচু উঁচু ধাপ। তবে কিছু চওড়া আছে, তাই যা রক্ষা ! মন্দাকিনীর জল কিছু তবু শান্ত আছে, (দেবপ্রয়াগের গঙ্গার মত) অলকানন্দায় যেন দিনরাত জাহাজের পিছনকার চাকা সজোরে চলছে ! উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত মথিত জলরাশি যেন পাঁচশোটা ধুনারির

ধুনন্ যন্ত্র হতে সদ্য বিমুক্ত পুঞ্জিত কার্পাসের মতই চারিদিকে f
ছিটকে পড়ছে, তরঙ্গের উপরে কখনও ধোঁয়ার মত দেখা য
হাজারিবাগ রামগড়ার রাজরূপার যেখানটায় দামোদরে ভেরা নদী প
সেই রকমই কতকটা বলা যায়, তবে রাজরূপার সে প্রশস্ততা ও
অনৈসর্গিক সৌন্দর্য্য এখানে নেই। এ রুদ্র-প্রয়াগ যেন এই
সূর্য্য কিরণে, রুদ্রের সংহার মূর্ত্তির মতই প্রচণ্ড তেজে জ্বলছে।
প্রয়াগকে এতেই কিন্তু সার্থকনামা মনে হলো!

জলে নেমে স্নান করতে ভরসা হলো না। তীরে জল তুলে
করা গেল। আমার ইচ্ছা ছিল, এখানের পঞ্চপ্রয়াগেই পিতৃগণের
তর্পণ করে কৃতার্থ হবো, কিন্তু এখানে এসে সে আশা বাধ্য হয়ে ত
করলেম। এখানের ঘাটে একটী মাত্র ঘেটেল ব্রাহ্মণ সঙ্কল্প মন্ত্র
করিয়ে পয়সা কুড়োচ্চে, শ্রাদ্ধ দূরের কথা তর্পণমন্ত্রও তার অজ্ঞ
নিজেই যথাজ্ঞান সামান্য কিছু করে নিলাম। কিন্তু দেব-প্রয়াগে
তৃপ্তি লাভ করেছিলেম, এখানে তা পেলেম না।

ঘাটের খানিকটা উঠে ক্ষুদ্রগৃহে সিন্দুর লিপ্ত একটী ছোট্ট দেবীঁ
উপরে কতকগুলি সিঁড়ি চড়ে রুদ্রনাথের মন্দির। মন্দিরে এব
গেরুয়াধারী সাধুর সঙ্গে ফণীবাবু কথা কইছেন দেখে আমরা ?
সাঙ্গ করে বাসায় ফিরলেম।

গতরাত্রে একজন নিরীহ যাত্রীকে পুলিসে সন্দেহ করে চোর ব
ধরায় সেবাসমিতির ছেলেরা তাকে পুলিসের হাত থেকে ছাড়িয়ে এ
ধর্ম্মশালায় রাখে। লোকটী কি ভেবে,—বলা যায় না,—হয়ত পুলি
হাতে পুনর্নিগৃহীত হওয়ার ভয়েই,—রাতারাতি যাত্রারম্ভ করে এবং পাহ

সঙ্কীর্ণ পথে পদস্খলিত হয়ে পড়ে যায়। কিছু বেলায় ঐ সেবাশ্রমের লোকেরাই খবর পেয়ে তাকে তুলে এনে শ্রীনগর হাঁসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করছিল।

পঙ্কুর কাছে হোমিওপ্যাথি ও স্বস্লারের দু'বাক্স ওষুধ আছে। কুলির দল, দোকানদার, যাত্রীরা গ্রামিকেরা যার যখনই দরকার জানা যাচ্চে, সে চার বেলাই ওষুধ বিলোতে বিলোতে চলেচে, এতে তার আলস্য নেই। এই আহতটীকে আর্ণিকা খাওয়ালে ও টিঙ্কার আইডিন দিয়ে ধোবার ব্যবস্থা করে দিলে। তাকে পাঠানর খরচের জন্যে চাঁদাও আমরা ক'টাকা দিলাম। আমাদের সামনাসামনি সেবাশ্রমের ক্যাম্পেই তাকে রাখা হয়েছিল। তাকে কিছু খাওয়াবার চেষ্টা করা হ'লো, খেতে সে পারলে না। আঘাত খুবই গুরুতর লেগেছে, কোন কথাই সে কইতে পারছেনা। হয়ত দায়িত্বহীন পুলিসের মিথ্যা সন্দেহে একটী জীবন অনর্থক নষ্ট হয়ে গেল। দেশে হয়ত তার আত্মীয়জনেরা তার এই শোচনীয় অকাল মরণের খবরটাও পাবে না।

রুদ্রনাথে দৃষ্ট সাধুটীর নাম শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী। রুদ্রপ্রয়াগের অপর পারে, অলকার উত্তর ধারে, যে সাইনবোর্ডওয়ালা বাড়ীখানা দেখে এসেছিলেম, ঐ বাড়ীতে একটী সংস্কৃত পাঠশালা এই স্বামীজী এদেশীয় ছেলেদের জন্য স্থাপন করেছেন। আমরা কিছু কিছু চাঁদা দিলাম। ফণীবাবু সম্ভবতঃ আমার সম্বন্ধে তাঁকে কিছু বলে থাকবেন, যে লোকটী চাঁদা নিতে এসেছিল, সে বল্লে, স্বামীজী আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে ইচ্ছুক। আমি যাবো অথবা তিনিই আসবেন জিজ্ঞাসা করলে, আমি যাবার কথাই দিলাম।

সন্ধ্যার সময় পঞ্চু ও ফণীবাবুর সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে স্বামীজীর সাক্ষাৎ করা গেল। স্কুলটির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা হ এ অঞ্চলে এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানের আবশ্য অবিসম্বাদী রূপে স্বীকার্য্য। আমি ফেরবার পথে স্কুলটি দেখে কিছু সাহায্য করবো, এবং ফিরে গিয়ে অপরকেও এ বিষয়ে জা প্রতিশ্রুতি দিলাম। স্বামীজী বল্লেন, ক্রমে এটীকে কলেজে প করবার বিশেষ ইচ্ছা আছে। এখন ৩০টি ছাত্র এখানে পড়চে, পু পাঠশালা প্রণালীতে পড়ান হয় বলে, বেশি মাষ্টারের দরকার হয় অর্থাভাবও মাষ্টার সংগ্রহের পক্ষে যথেষ্ট বাধা। অন্যান্য কথাবার্ত্তা শাস্ত্র সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচনা হলো। বিদ্বান, জ্ঞানী এবং স্বভাব। এতদূরে এই সার্থকনামা-রুদ্রমূর্ত্তি রুদ্রপ্রয়াগে, এই সৌম সাধুর সঙ্গ বড়ই প্রীতিপ্রদ বোধ হ'লো।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন ক বল্লেন, "মা, দান ধর্ম্ম দয়া যত করতে পার ততই ভাল, কিন্তু সব মিঠি বুলি (মিষ্ট বাক্য) বলায় পরিশ্রম ও অর্থব্যয় কিছুই নাই, সস্তাতেই এটা হতে পারে। এইটিই সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করবে। কায়ম বাক্যে কারুর মনে কষ্ট দেবে না, এইটিই সকল ধর্ম্মে প্রধান ধর্ম্ম!"

উপদেশটি মিষ্টই লাগলো, কিন্তু সম্পন্ন করা সহজ নয়! আত্মাহঙ্কা বিমূঢ় আমরা অন্যের মনের কথা কতটুকু ভেবে চলি।

ভোরের সময় উষার আলো ভাল করে ফুটে ওঠবার আগেই আম রুদ্রনাথের মন্দিরের নীচে দিয়ে, মন্দাকিনীর তীর ধরে উত্তরাভিমু হলেম। কেদারের পথে যাত্রারম্ভ হলো। কেদার পথ সম্বন্ধে আগ

গোড়াই অনেক ভয়ের কথা শুনে এসেছি। যে কেউই কেদার গিয়েচেন, এই পথের দুর্গমতা মুক্তকণ্ঠেই ব্যক্ত করেচেন। কুলিদের তো কথাই নেই! মসুরী থেকে সকল কুলিই কেদার-পথের কঠোরতা সম্বন্ধে শতমুখ হয়ে রয়েচে, আজও তার বিরাম দেখছিনে। জানি না যিনি আমাদের নিয়ামক, তাঁর মনের মধ্যে কি আছে। এবার পূর্ণ ভাবেই তাঁর উপরে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছি। দেখা যাক, কি করেন।

আজকের সারা পথটিই কিন্তু সুন্দর! শুধু সুন্দর নয়,—অতি সুন্দর! নেহাৎ অপ্রশস্ত নয়। ৪।৫ ফুট চওড়া হবে। স্থানে স্থানে কিছু সঙ্কীর্ণ হ'তেও পারে। সে রকম ও দিকেও ত আছে। মধ্যে মধ্যে সামান্য চড়াই ও উৎরাই, সেটা পার্ব্বত্য পথের পক্ষে একেবারেই অপরিহার্য্য। এ ছাড়া তিন ভাগই সমতল। সারাক্ষণই মন্দাকিনী সঙ্গে সঙ্গে কল্লোল তুলে হিল্লোলিত হ'তে হ'তে বয়ে চলেচেন।

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মশাইএর বদরী-কেদার ভ্রমণে এই মন্দাকিনীর উল্লেখে লিখেছেন "ইহার নাম কল্লোলিনী থাকিলেই ঠিক হইত।" সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। বাস্তবিক কল্লোলিনীই বটে! কি অশ্রান্ত কল কল নাদেই এই মন্দাকিনী নামধারিণী সারা পার্ব্বত্য প্রদেশকে মুখরিত করে বয়ে চলেছেন! বড় বড় পাথরে সংহত হয়ে সলিল রাশি প্রায় সর্ব্বত্রই সমুদ্র তরঙ্গের ম[illegible] তরঙ্গিত হতে হতে নৃত্য করতে করতে চলেছে। নৃত্য-নিপুণা নটীর মত ভঙ্গীভরা চরণক্ষেপের তালে তালে যেন ঘন নূপুর ধ্বনিত হচ্চে। আবার রূপটিও এঁর যেন অপরূপ! স্বর্গবাসিনীর অনুরূপ বটে! গঙ্গা অলকানন্দাও এইরূপ কলনাদিনী এবং রূপসীও বটেন। তবে অলকা ও গঙ্গাদেবীকে যতটা দেখে এসেছি তার

মধ্যের অনেক স্থানে সঙ্কীর্ণ গিরি-সঙ্কটের মধ্যে ক্ষীণ-ধারা হয়ে প্রায় নি শঙ্কিত চরণক্ষেপেই চলতে বাধ্য হয়েচেন, যেন নূতন শ্বশুর আসা কনে বউটি! জল সেই সকল স্থানে অস্বচ্ছ, ঈষৎ পী কুণ্ডের জলের মত। অবশ্য প্রয়াগ সঙ্গমে আবার সে এক বিপরীত যেন দনুজ-দলনীরই প্রতিরূপা তা'ও দেখেছি।

৭ই মে ২২শে বৈশাখ শনিবার কেদার পথের প্রথম যাত্রার আমরা সকালের দিকে সাত মাইল এসে, মঠ-রামপুরে মধ্যাহ্ন সম্পন্ন করলেম। রামপুরে আমাদের এক তলার ঘরেই থাক হলো। অনেক যাত্রী এসে পড়ায় একটু ভিড় হ'তে আরম্ভ হয়েচে গোড়ার দিকটা বেশ নিরিবিলিতে যাওয়া যাচ্ছিল। দেব-প্রয়াগে পর থেকেই সহযাত্রীর সংখ্যা বৰ্দ্ধিত হচ্চে। আমাদের সঙ্গে এক মাত্র বাঙ্গালী পরিবারের তিনটি মাত্র নর-নারী চলেছে, তা' ছাড়া আ সব মাড়োয়ারী, কাশ্মীরী, বেহারী, মহারাষ্ট্রীয় এবং এক-আধ জন সি বা দক্ষিণীও আছেন। সমস্ত ভারতবর্ষ শুধু এই একটি স্থানে ধর্ম্ম-সূত্রের বন্ধনেই এক প্রাণ এক মন এবং একই পথের সহযাত্রী এঁদের দেখি, আলাপ করি, আর মনে পড়ে যায়;—

"পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা, দ্রাবিড় উৎকল, বঙ্গ,
সিন্ধু হিমাচল যমুনা গঙ্গা—উচ্ছল জলধি তরঙ্গ,
—তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশীষ মাগে;—"

এবং মনে পড়ে,—

"পুরব পশ্চিম আসে, তব সম্মিলন আশে,
প্রেম-হার হয় গাঁথা—"

উত্তরাখণ্ডের পত্র

হে মহা-ভারতের ভাগ্য-বিধাতা! হে কেদার-বদরী মূর্ত্তিদ্বয়ের অন্তরস্থ বিশ্বনাথ! বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন ভারতকে এক মহাসম্মিলনে কত দিনে তুমি সম্মিলিত করে দেবে? হে দেব! যারা ধর্ম্মে এমন করে সম্মিলিত হতে পারে তারা কর্ম্মে সম্মিলিত কেনই বা না হ'বে? যদি তোমার ইচ্ছা হয়,—যদি তেমন কোন যুগ-পুরুষের আবির্ভাব হয় নিশ্চিতই পারবে। বাস্তবিক সাধারণের যেমন বিশ্বাস ভারত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। ধর্ম্মে আচারে ভারতীয় হিন্দু এখনও সর্ব্বত্রই এক। তাকে শুধু সেইটুকু বুঝাইবার প্রয়োজন আছে মাত্র! আর তার সেই ধর্ম্ম জ্ঞানকে প্রনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করার অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিন্দু হিন্দুথাকতে সম্পূর্ণরূপে ডুবতে পারবে না।

রামপুর চটির কিছু আগে থেকেই ভিক্ষার্থী বালক-বালিকারা নেচে গেয়ে পয়সা আদায় করছিল। তাদের মধ্যের দু একটির গলায় বেশ মিষ্টি স্বরও পাওয়া গেল। সম্পূর্ণ গান এরা কেউই গায় না, জানেও না, দু একটা চরণ মাত্র আউড়ে পয়সা চেয়ে বেড়ায়। বেশি গাইতে গেলে পয়সা আদায়ের দেরি হ'য়ে যাবে, তাছাড়া, যাত্রীর দলের সবাইকার তো আর আমার মত গান শোনবার ধৈর্য্যও নেই!

এখানে তীরে নামার পথ বেশ সহজ. তীরভূমিও সুপ্রশস্ত। স্নানের সুখটা ভালই ছিল। ফিরে এসে দেখি. চুন্নরী ছিটের ঘেরদার পেসোয়াজ, লাল সালুতে হলদে সবুজ ন্যাকড়ার টুকরা বসিয়ে বিচিত্র করা আঙ্গিয়া পরা, আর কালো পাজামার চুড়িদার পায়ের উপর পর্য্যন্ত ঘুমুরের গোচ্ছা বাঁধা এক নর্ত্তকী এসে উপস্থিত। আমরা গান শুনতে চাইলে, নর্ত্তকীর সঙ্গিনী ঢোল্‌কীকে ডেকে নাচ গান জুড়ে

দিলে। নর্ত্তকীর কাণে একরাশ সোনার মাকড়ি, নাকে একটা নথ, গলায় কাঁড়ি খানেক নকল পলার মালা, মাথায় একটী লম্বা বেণী। ভঙ্গী চাহনী নর্ত্তকী-জনোচিত আর্ট বা কলাকুশলতা সবই আ গানটা লিখে নিতে গিয়ে দেখা গেল, এ সেই সকালবেলার ছে দলেরই অসমাপ্ত গান! এবারেও এটা ঠিক সমাপ্ত হলো না। দু এক লাইন অবান্তর বোধে বাদ সাদ গিয়ে এইটুকু মোট দাঁড়ালো—

"তুমে জপো কেদারনাথ, পাঁও দরশন তেরা—
উপর শোভে কল্‌কা দাণ্ডা, মন্দিরে শোভে ধ্বজা,
দচ্ছিন দরওয়াজাপর শোভে ভীমসেনকি গদা।
ডিম্ ডিম্ ডিম্ ডিম্ ডমরু বাজে, জটা ত্রিশূল সাজা—
নাওয়ে তপ্ত কুণ্ডমে গোপী চন্দনকে টিকা
ধর্ম্মী ধর্ম্ম বাঁটে পাপী বাঁটোগে ক্যেয়া ?"

তারপর তাদের দেশোয়ালী গান গাহিতে বলিলে এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতটি গাহিয়া শুনাইল,—

বড় গুটায়া কাঁহা তেরা প্যাঁও—
কহ বৌরাণী, কেয়া তেরা নাম ?
ধাম দোয়ার হো গয়া, একলে নাড়ী ক্ষেতর িয়া,
তেরা দেবর জ্যেঠানী কাঁহা হো,—"

এর কোন মাথা মুণ্ড পাওয়া গেল না। অবশেষে সে নিজেই প্রস্তাব করলে, "আপলোক তো বাংলা হ্যায় ? আপলোগকো এক গীত হাম শুনায়েঙ্গে।"

তথাস্তু!—হাতে কাজ নেই, শোনাই যাক,—

মেয়েটি খুব হাত মুখের ভঙ্গী করিয়া গাহিল—

"সুফলায় পিঠি বাঙ্গালী সুফলায় পিঠি,
পৈলে পয়মাল হুয়া দেরাডুন বিটি,
কল্‌কাতিয়া রাজ বাঙ্গালী চলিয়া রে বেরি,
মেরে বাবু না আবেতো জল কুলি মরি।
ওয়ালি মারে মচ্ছি, তেরে বাংলাসে মেরি—
মনস্থরি আচ্ছি।—
ঢাকা বাঙ্গালী আয়া হিঁয়া রুপিয়া ভরা ব্যাঙ্ক
রাজা বাঙ্গালী কাটে ছাগল কা ঘাঁস—

আর যা গাহিল তার কোন অর্থবোধ করা গেল না।

সব জাতের মধ্যেই বাঙ্গালীর প্রতি বিদ্রূপ ক'রে গান বাঁধনের চালটা দেখছি চলতে চলতে এত দূরের এই উত্তর ভারত প্রান্তেও এসে পৌঁছে গেছে! ভাগলপুরে একটা ভিখারী দু পয়সার একটা একতারা বাজিয়ে গাইতে আসতো, তোমার নিশ্চয়ই তাকে মনে নেই?—

"তোমতো বাঙ্গালী বাবু ইংরেজী না বোল,
ইংরেজী না বোল রে বাবু ইংরেজী না বোল,
বাংলা বাঙ্গালকে বোলি
ইংরেজী ইংরাজ,
হামকো বোলি হিন্দুস্থানী, ইস্‌মে কেয়া লাজ?"

আরও কিছু ছিল, আমার মনে নেই।—"কামরা বিচে মেম ফুকারে ল্যাও বাবুর্চি খানা"—ইত্যাদি কি কি সব উপমা দিয়ে বাঙ্গালী নরনারীর ইংরেজী অনুকরণকে তীব্রভাষায় ধিক্কার দেওয়া হয়েচে

এইটুকুই মনে আছে। বাঙ্গালী তার-চরিত্রের মহত্ত্বে, ত্যাগের ঔজ্জ্বে দানের গৌরবে তার বিভিন্ন প্রদেশীয় স্বজাতি এবং স্বধর্ম্মীদি চিত্তে উচ্চ স্থানাধিকার করে রয়েছে দেখতে পেলে কতই না হতো! কিন্তু কৈ তা' দেখতে পেলাম? আচ্ছা, এর জন্যে বাঙ্গালী নিজেই অনেকটা দায়ী নয়? জাতীয় গৌরব অর্জ্জন ও বর্দ্ধন করতে হ তার জন্য অনেক যত্ন শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। আমরা বিদেশী কাছে একটু খানি নাম কেনবার জন্য লালায়িত, কিন্তু স্বদেশীর ধিক্ক আমাদের কাণে কুকুরের চিৎকারের মতই অবজ্ঞেয়! বিশেষ বাঙ্গা ছাড়া আর কাউকে ত আমরা মানুষই ভাবতে পারিনে, তারাই শ্রদ্ধা করবে কেন!

ডাক্তারীটা তোমার সেজ মেশোমশাইএর সারাপথ চলচে ভাল ঘরের পরের নিয়ে পাঁচসাতটী রোগী তার দুটী বেলাতে যেমন করে হোক জুটে যায়ই।

কুণ্ড-কাণ্ডি এবং মহাদেব ব্যতীত আমাদের পাওয়া আর সব চটি গঙ্গা অলকা বা মন্দাকিনীর তীরে তীরে। নদীতীরস্থ স্থান স্বভাবত স্থরম্য। স্নানেরও খুব স্থবিধা। রামপুরেও মাছির উপদ্রব কম নয় এত পরিচ্ছন্নতা স্বত্তেও এত মাছি যে কোথা থেকে আসে, অথচ দিকে স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগ শিথিল-প্রযত্ন বলে মনে ত হচ্চে না!

এর মাইল দুই আড়াই আগে তিলবাড়া চটির উপরে মন্দাকিনী সঙ্গে অলস-তরঙ্গিনী নদীর সঙ্গমস্থলে সূর্য্য প্রয়াগ। এই খানে পূর্ব্বকালে সপ্তর্ষিরা সূর্য্য-ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। পৌনমাইল পাক দণ্ডীতে গিয়ে দড়ির পুল পার হ'তে হয় বলে আর আমাদের যাওয়

হলো না। এর প্রথম চটি ছান্তোলীরও মাইল দুই ওদিকে সত্যতার পর্ব্বতের উপর মাহীগ্রাম দেখা যায়, সেখানে তুঙ্গেশ্বর শিব আছেন। স্কন্দপুরাণের মতে তারাগণ তাঁকে না কি প্রতিষ্ঠা করেছিল। করলে কি হবে, আমরা এসব দুর্গম পথে পা বাড়াইনে।

বৈকালে মেঘ বৃষ্টির ভয়ে বারটার সময় বেরুন গেল। এ পথ বেশ সহজ, প্রায় সমতল। স্থানে স্থানে সামান্য চড়াই মাত্র। এ দিকে অশ্বথগাছ মধ্যে মধ্যে দেখা যেতে লাগলো। প্রত্যেক অশথের তলাটাই পাথরের বেদী করে বাঁধানো। বৃক্ষরাজ এখানেও দেখছি জনপূজ্য। গাছপালা পূর্ব্বের মত, তবে দেরাদুনের পর গোলাপ আর কোন খানে বড় একটা দেখা যায়নি, শুধু শ্রীনগরে দু'একঝাড় মাত্র, আর যেন কোথায় এক আধটা দেখেছি বলে মনে হ'চ্চে ; সে অতি সামান্যই। কিন্তু এ পথে পা দিয়েই আবার সেই বন্য গোলাপের রাশি এবং ঐ জাতীয় আরও ছোট ও পাতলা পাপড়ীওলা সাদা গোলাপের গাছ পাহাড়ের গায়ে ঝোঁপ ঝাড় হয়ে রয়েছে দেখা গেল। এদিকে শীতটাও বেশ একটু একটু করে বাড়চে। রুদ্রপ্রয়াগে গরম ছিল। ওর দুপাশের পাহাড় বড্ড বেশি উঁচু তাই ওখানের হাওয়া একটু গরম থাকেই।

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে এগার মাইল পরে অগস্ত্যমুনি স্থানটী একটী ছোট্ট খাট্ট উপত্যকার মত সুন্দর ও সমতল। এই খানে বেশ একটী সুন্দর স্যানিটোরিয়ম হতে পারে। প্রকাণ্ড ময়দানের মত শ্যামল তৃণাস্তৃত ভূমিখণ্ড পতিত হয়ে রয়েচে। পাণ্ডাজী বল্লেন মুনির জমি বলে এখানে কেউ চাষ আবাদ করে না। তা' হবেও বা! রামপুর চটি থেকে অগস্ত্য-মুনি পর্য্যন্ত আমাদের যাত্রাপথটী অধিকাংশ স্থলেই সমতলের মধ্য দিয়ে।

উত্তরাখণ্ডের পত্র

উচ্চ পর্ব্বত গাত্র হতে আরম্ভ করে সেই সমতল পর্য্যন্ত বহু স্থলেই ধ ক্ষেত দেখা গেল। তামাকের চওড়া পাতাওলা গাছগুলি বেশ ব হয়ে উঠেছে। গম ধান ও তামাক এদিকে নেহাৎ মন্দ হয় বলে মনে হ না। যেখানে সেখানে আঁকা বাঁকা বড় ছোট সব রকম আকারের ত বাঁধা ক্ষেতগুলি ফসল ফলিয়ে তুলেচে। জলের তো অভাব নেই ঝরণার ঝর্ ঝর্, হিমালয়ের (বিশেষতঃ এই দিকের তো কথাই নেই সর্ব্বত্রই চলেচে। পাহাড় ফাটিয়ে প্রকৃতির স্নেহস্তন্য-ধারা যেন পার্ব্বত সন্তানদের জন্য অবিরল ধারেই ঝরে পড়েচে। যেখানে যেটুকু জ আছে—তা পাহাড়ের গায়ে মাথায় যেথায়ই হোক ঐ জলের বলে আব চলেছে, এবং এর স্থানে স্থানে চাকি বসিয়ে গম পেষা ও কাঠের বা তৈরীও হচ্ছে। শুধু করুণাবিগলিতা জাহ্নবী যমুনাই নয়;—পর্ব্বতরা আমাদের অযুত পুত্রী!

কলভাষিণী মন্দাকিনী ললিত কাকলী তুলে আনন্দের গান গাইতে গাইতে সঙ্গে সঙ্গে বয়ে চলেচেন। এ দিকের গাছপালা লতাপাতা অতি সুদৃশ্য! এখান থেকে আমরা কেদারের জন্য বিল্বপত্র সংগ্রহ কবে নিলুম, শুনলুম এর পর আর বেলগাছ নেই।

অগস্ত্যমুনি স্থানটি মুনিবরের তপঃসিদ্ধির স্থান। বাতাপি-ভক্ষক সমুদ্রশোষক, গগনস্পর্শ-প্রত্যাশী বিন্ধ্যগিরির দর্পিত মস্তক অবনতকারী এই শাস্ত্র-পুরাণ-প্রসিদ্ধ মহাশক্তিমান মহর্ষির পুণ্যাশ্রমে এসে কত কথা না মনে হলো! এ আশ্রম স্থল যাঁর, কে জানে এই অগস্ত্যই সে পুরাতন ভারতের—অত্যাচারী অনার্য্য বাতাপি প্রভৃতির উচ্ছেদকর্ত্তা সমুদ্র জলে নিমজ্জমান ভূমিকে রক্ষা করার উপায় উদ্ভাবনকারী এব

সঙ্কট-সঙ্কুল বিন্ধ্যারণ্যে এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের পরপারে আর্য্য উপনিবেশের সর্ব্ব প্রথম স্থাপয়িতা ঋষিরাজ অগস্ত্য কি না ?

অগস্ত্যাশ্রমে এখন আর মন্দির নাই। পাথরের কুঁড়ে ঘরে অগস্ত্য, অগস্ত্যেশ্বর শিব, লক্ষ্মীনারায়ণ ও গরুড়ের মূর্ত্তি দেখা গেল। সামনেই কাল পাথরের একটী সূক্ষ্ম খোদাই করা হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি, আর কতকগুলি কাযকরা করা পাথরের ভাঙ্গা চোরা খিলান থাম ও দরজার ফ্রেম ছড়ান পড়ে রয়েছে। পুরোহিত বৈণীগ্রামবাসী ব্রাহ্মণটীকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম অগস্ত্যমুনির খুব বড় মন্দির পূর্ব্বে মন্দাকিনীর তীরের উপরেই ছিল। এতক্ষণে ঐ অনাবাদী ময়দানের রহস্য জানা গেল! জলোচ্ছ্বাসে সে সব ধ্বংস হয়ে গেছে, কাযেই ঋষি এখন অবস্থা বিপর্য্যয়ে কুটীরবাসী হয়েছেন! অতীতের স্মৃতি স্বরূপে বিধ্বস্ত মন্দিরের কিছু কিছু অবশেষ আজও এখানে রক্ষিত রয়েচে মাত্র।

মনে হলো এই যেন স্বাভাবিক! এই যেন সঙ্গত! উত্তাল সমুদ্র তরঙ্গের প্রচণ্ডগতি যাঁদের চেষ্টায় ফিরতো,—দুর্গম পর্ব্বতারণ্য বিহারী নর-খাদক অনার্য্য রাক্ষস ধ্বংস ক'রে দুর্ল্লঙ্ঘ্য গিরিরাজকে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অনাবিষ্কৃত দাক্ষিণাত্যে আর্য্য সভ্যতার বিস্তার যাঁরা করেছিলেন, আজ তাঁর সন্তানেরা 'নিজবাসভূমে পরবাসী' হয়ে আপনার অঙ্গনের ম্যালেরিয়া কীট সৃষ্টিকারী পুষ্করিণীকে সংস্কার করে তুলতেও অপারগ!—এদের প্রাসাদ-ভবনের পরিবর্ত্তে এখন পর্ণকুটীরেই বাসের ব্যবস্থা হয়েচে। তাই জাতির এই অবনতিতেই যেন নিজেকেও অবনত বোধে, অভিমানে মুনিরাজ তাঁর—গৌরব-মন্দির কালস্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে লজ্জায় এই ক্ষুদ্র কুটীরে এসে লুকিয়ে বসে আছেন!

এখানে একটা জিনিষ দেখলাম,—সেটা বৌদ্ধমন্দিরের ধর্ম্মচক্র অগস্ত্য মন্দিরের ধ্বংসের সঙ্গে এজিনিষটা কেমন করে এলো বুঝতে পারছি না!—বুঝিয়ে দেবার লোকও সেখানে কেউ ছিল না। হয় ঐ অত বড় প্রকাণ্ড ময়দানটায় বেশ একটা সমৃদ্ধিশালী গ্রাম বা নগর ছিল। বৌদ্ধ প্রভাব এদিকেও তো কম হয়নি শুনেছি এবং দেখছি সর্ব্বত্রই তার ধ্বংসচিহ্ন! সেই সময়ে হয়ত এখানে বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাও কালের কবলে পড়ে আজ ধ্বংস হয়ে গ্যাছে!

লোকের বিশ্বাস, মুনির জমিতে বাস করলে বা চাষ করলে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হতে হবে, তাই ওরা শুধু এখানে গরু চরায়।

কবি যে দুঃখ করে বলেছেন, "কি ছিলে, কি হলে!" তার একটুও মিথ্যা না। কুসংস্কার পদে পদে হাত পা বেঁধে দিচ্চে। এমন স্বাস্থ্যকর সুখকর জায়গা এ ভোগ কর্ব্বার অর্থকরী কর্ব্বার উপায় নেই! মুনির জমি বলে ফেলে রেখে দিলে!

এখানে কালী-কমলীর ধর্ম্মশালা, সদাব্রত বাজার, ও ডাকবাক্স আছে। এখনও বেলা রয়েছে, আর মেঘ হতে হতেও সেটা বেশ পরিষ্কার হয়ে কেটে গেল, দেখে আমরা আর একটু এগিয়ে চল্লুম।

এমন মধুর অপরাহ্নে এমন ভ্রমণোপযোগী স্থানে মানুষের বাহনে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে মন সরলো না। দু'মাইলের মধ্যে দু'বারে মাইলটাক হেঁটে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সৌড়ী চটিতে পৌঁছে গেলুম। সৌড়ী মন্দাকিনীর তীর থেকে সামান্য উচ্চে। নদীর উপর কাঠের পুল। চটির সমস্ত ঘর ভরে গিয়েছে। আমাদের লোক আগে এসে দখল নিতে পারেনি, যেহেতু আমাদের প্রোগ্রামে আজ অগস্ত্যমুনিতেই থাকার কথা। সেই অনুসারেই লোক



কেদার পঞ্চায়তন

জনকে হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তারা অগস্ত্যমুনিতেই ব্যবস্থা করেছিল। তার উপর আমাদের তো আর একটুখানি জায়গার কর্ম্ম নয়। একখানা রান্নার, একখানা লোক জন ও পাণ্ডাজীর, একখানা ৫৬টী কুলির আর আমাদের যতখানি হয়ে ওঠে ততই ভাল।

যাহোক তুলারাম ও রামসিং ছুটতে ছুটতে এসে দু'খানি বড় বড় ঘর দখল করেছিল, তাতেই চালিয়ে নিতে হলো। ঘরের পাশেই একটী ছোট ঝরণা ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়চে। সামনেই একটী জীর্ণ মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপিত। পুরোহিত মশাই আরতি করে আরতি প্রদীপ হাতে আমাদের কাছে কিছু দক্ষিণার প্রত্যাশায় এলেন।

হিমালয়ের সমস্ত চটিগুলিতেই বড় বড় গ্রেটডেন ও স্প্যানিয়েল জাতীয় কুকুর দেখলাম। এই শেষোক্ত কুকুরগুলি অতি সুন্দর ও বৃহদায়তন। রাত্রে এরা চটিতে চটিতে পাহারা দেয়।

শনিবার ৮।৫।২৭ চন্দ্রপুরীতে পৌছে চন্দ্রেশ্বরশিব (রাজা চন্দ্র সিং স্থাপিত) দর্শনান্তে চা ও জলখাবারের ব্যাপার সেরে মধ্যাহ্নে কুণ্ড চটিতে পৌছান গেল। এ কুণ্ডটী নম্বর দুই। প্রথম কুণ্ডে বদরী পথের তৃতীয়দিনে দুপুর বেলায় পৌছে বড়ই জলকষ্ট সইতে হয়েছিল সেকথা বোধ হয় পূর্ব্বেই লিখেছি। এ কুণ্ড কিন্তু সে কুণ্ডের চাইতে বড় ও ঢের ভাল। কেদার পথের সকল চটিই সমৃদ্ধ এবং চটিতে ঘরের সংখ্যাও বেশি। এখানের কুণ্ড চটিতেও আমরা দোতলায় ঘর পেয়েছিলেম, মন্দাকিনীতে স্নানের সুবিধাও হয়েছিল। তীরে কত রং বেরংএরই নোড়ানুড়ি ছড়াছড়ি যাচ্চে তার ইয়ত্তা নেই। কোথাও অভ্রমণ্ডিত হয়ে তা রূপার মত ঝক্‌মক্ ঝলমল করছে, কোথাও সোনার মত চক্ চক্

চিক্‌মিক্‌ করছে। কুড়িয়ে জমা করে আবার সবাই ফেলে দিলাম
আর ক'টাই বা নোব? বিশেষ বাজে বোঝা বাড়ানয় কুলিদের
অন্যায় করা হয়।

বৈকালে আড়াই মাইল পথ এসে আমরা বেলাবেলি গুপ্ত
পৌছলাম। গুপ্তকাশী নাম শুনে যতটা আশা হয়েছিল, সাক্ষাে
লুপ্ত হয়ে গেলেও এদিকের এই গিরিশঙ্কটের মধ্যে এত দূরে এ'
মনে করে নিতেই হবে। বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার এখানে একই
মন্দিরটী বৃহৎ, প্রাচীনও বটে। পাশের মন্দিরে শ্বেতপাথরের
মূর্ত্তি অধিষ্ঠিতা, তাঁকে কেউ বল্লেন পার্ব্বতী কেউ বল্লেন গৌরি
শঙ্কর কিন্তু দেখা গেল না। পাষাণ ...বের মধ্যস্থলে দেব
সম্মুখে একটী অনতিবৃহৎ কুণ্ড, ইহাই এখানে মণিকর্ণিকা। এর
দুদিকে দুটী তামার মুখ বসান তাই দিয়ে কোন ঝরণা থেকে
জল পড়ছে। সন্ধ্যায় বিশ্বনাথের আরতি দেখা হলো।—কাশীর
নাথের আরতি মনে পড়ছিল, অবশ্য সেটা বৈসাদৃশ্য দেখে।

একদিকে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর মূর্ত্তি। পূ...রীরা প্রণামীর জ
হয়ে যাত্রীদের ডাকাডাকি করচে, কিন্তু সকল ...বের নামও জানে

এখানে একখানি তেতলা বাড়ীর এক ... সাজান ড্রইংরুম
ভাল শোবার ঘর ও রান্না খাবার দুখানি ঘর আমাদের পাণ্ডাজী
এসে বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। গুপ্তকাশী পাণ্ডাজীর এলাকা
খানেই কাছের গাঁয়ে তাঁর বাড়ী। তাঁর ভাই প্রভৃতিরাও এইখ
রয়েছেন। কেদার যতদিন হিমাচ্ছন্ন থাকে এঁরা এইখানেই থা
যেমন বদরীর পাণ্ডাদের আড্ডা দেব প্রয়াগে।

উত্তরাখণ্ডের পত্র

ক'দিন থেকে শরীরটা ভাল যাচ্চে না। আমাদের ঘরে মজলিস বসে গানের পর গান চল্লেও আজ মন যেন তাতে ধরা দিচ্ছিল না। সন্ধ্যার পর চিরপরিচিত অন্ধকারের আবেষ্টনের মধ্যে যখন সমুদয় বিশ্ব-প্রকৃতি তার অভিনবত্বকে লুকিয়ে ফেলে, তখন প্রায়ই সেই ভবিষ্যরাত্রির সমীপবর্ত্তিতা আমার যত্নে বাঁধা মনের বীণার তারগুলোকে একেবারে শিথিল করে দেয়। ঘরের পানেই মনটাকে যেন সে দুহাত দিয়ে টানতে থাকে। সমস্ত সঙ্গীতের সুরকে ঢাকা দিয়ে কাণে বাজতে থাকে, এই সন্ধ্যাবেলার আমার রুণুরাণীর সেই পাখীর কাকলীর মতই আধ আধ মধুর স্বর—

"আজি কি তোমাল মধুল মুলতি হেলিনু শালদ পো[illegible]

হে মাতল্ বঙ্গ! শ্যামল অঙ্গ জ্বলিছে অমল প'ভাতে—"

আরও কত কি! সেই মাঝে মাঝে এসে গলা জড়িয়ে ধরা, একটু লিখতে বা পড়তে দেখলে নানাছলে বাধা দেওয়া। আর আমার ছোট্ট ছেলেটীর সেই মাষ্টার মশাইএর কাছে পড়তে গিয়ে ছল ছুতায় বারে বারে এসে তার মাকে দেখে যাওয়া! [illegible]ই কর্ম্মহীন, বন্ধনহীন দিনের শেষে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম নিয়ে মনে পড়তে থাকে এতক্ষণে তোমরা হয়ত খেতে বসেছ,—ঠাকুর কিরকম রাঁধছে কে'জানে ইনি এইবার বেড়িয়ে এলেন।

পরদিন প্রাতে এখান থেকে একটা টেলিগ্রাম করেদিলুম। কেদার থেকে ফিরে এরই কাছ দিয়ে নালাচটি পর্য্যন্ত এসে তার পরে বদরীর রাস্তায় পড়তে হবে, ফিরতে দিন সাতেক লাগবে, সেই সময় এর উত্তরটা পেতে পারবো বলে এখানের ঠিকানাতেই জবাব দিতে লিখে দিলেম।

প্রত্যেক ডাকেই চিঠি দিচ্ছি, পাচ্চো কিনা জানি না। আমি কিন্তু তেরদিন ধরে কারু কোন খবর না পেয়েই কাটাচ্চি! মনে প প্রাণটা যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং বিস্ময়ে মন ভরে যায়। পারচিও

সকালে উঠে দেবদর্শন ও গুপ্ত দান করা হলো। কাঁসার থালা পেঁড়া ও কাপড় ও একটী খড়ুলী নারকেলের একটুখানি কেটে তার একটী টাকা দিয়ে উৎসর্গ করিয়ে দান করতে হয়। আমাদের পা প্রাপ্য। বদরী ও দেবপ্রয়াগের পাণ্ডা যেমন এক, কেদার ও গুপ্তকাশ তেমনই একই পাণ্ডা। পিত্তলের থাল ও গামছা দিয়েও দান করা যা অবস্থানুসারে ব্যবস্থা—কোন রকম জোর জুলুম নেই।

গুপ্তকাশীর উত্তরে মাল্যবান মর্য্যাদাশৈল নামক তুষারমণ্ডিত পাহাড়টী আজ আর আমাদের তেমন বিস্মিত করতে পারলে না, ত আনন্দ দান করলে বই কি! গুপ্তকাশীর ঠিক সামনের পাহাড়েই উখি বা উষিমঠ। অর্থাৎ আমাদের উচ্চারণে 'ষ' 'স'র মতই হয়, ত উষিমঠ আমরা মুখেও বলবো। এরা 'ষ' কে 'খ' এর মত উচ্চারণ ক বলে 'উষি' লিখলেও, 'উখি' বলবে। নইলে লিখিত প্রমাণে তুমি থেকে উষিই। ওর ঘর বাড়ী সহর বাজার বেশ স্পষ্ট ভাবেই দে যাচ্ছিল, অথচ সোজা যাবার উপায় না থাকায় কেদার থেকে ফি নালা চটিতে এসে, ও পাহাড়ের পথ দিয়ে উল্টো পথে ওখানে যেতে হবে পার্ব্বত্য পথের বৈচিত্র্য বা কুটিলতাই এই! শুনলেম না কি কেদ থেকে বদরী মোটে দশ মাইল। অথচ, অন্ততঃ দশবার দিনের পথ চ' একশো মাইল ঘুরে ফিরে তবেই পৌছান যাবে।

বেলা আট টায় বেরিয়ে আধ মাইল পরের চটি পার হয়ে, আরও

মাইল দূরে নারায়ণ চটিতে নেমে দেবদর্শন করা হলো। নারায়ণ মন্দিরের চারিদিকে অনেকগুলি শিব মন্দির, তাদের সবার মধ্যে এখন কোন মূর্ত্তি পর্য্যন্ত নেই। অসংস্কৃত ভগ্নদশা। এক পাশে একটী বাঁধান কুণ্ড। পুরোহিত বল্লেন, শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ নিরশন করে এই মন্দির স্থাপন করেছিলেন। হতেও পারে! এদিকের যা কিছু, সবই প্রায় শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠা করা শুনতে পাই, সত্যতত্ত্ব উদ্ধার করা ত সহজ নয়! বিশেষ এই পথ চলতে চলতে।

আর দু'মাইল এসে বেবেঙ্গ বা ব্যুং চটিতে আশ্রয় নেওয়া হলো। তখন মাত্র ন'টা বেজেছে। এই চটির গায়েই একটী ঝরণা ছোট একটী নদীর মতই পাথরের আলের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, তাতেই স্নানাদি সম্পন্ন করা গেল। —বেশ আব্রুকরা, যেন খিড়কী দোরের পুকুরটী। এই ঝরণা আর খানিকটা নীচে নেমে যাবার পর এর স্রোতের মধ্যে একটী পানিচাক্কী বসিয়ে কুঁড়ে বেঁধে দুজন লোক পাহাড়ী কাচা কাঠ থেকে বেশ সুন্দর সুন্দর কাঠের বাসন তৈরি করছে। ফেরবার সময় নেওয়া হবে বলে কিছু কিছু অর্ডার দিয়ে যাওয়া হলো। হিমালয়ের মধ্যে শ্রীনগরের ধাতুর বাসন ছাড়া এই যা শিল্প দেখলেম! পাহাড়ে কত রংয়ের পাথর, অভ্র, ধাতু নানাবিধ ও অসংখ্য প্রকারের ওষধি, কত কি ছড়ান আছে, এসব থেকে কিছু করা যায় না? ভুটিয়ারা বর্ষাকালে "জড়ি বুটি" সংগ্রহ করতে আসে। শিলাজতু, জহরমহরা প্রভৃতিও সংগ্রহ ও বিক্রয় হচ্ছে। "অনন্ত রত্নপ্রভব" হিমগিরির রত্নাগারের পক্ষে এইটুকুই পর্য্যাপ্ত বলে মনে হয় না, অনুসন্ধিৎসু বঙ্গ-যুবকেরা ইচ্ছা করলে এ সম্বন্ধে একবার ভেবে দেখতেও পারেন।

কখনো স্তম্ভিত, কখনও বা পুলকিত হ'তে লাগলেম। কেদার পথের সম্বন্ধে মসুরী থেকেই আড়ষ্ট হয়ে রয়েছি। এমনকি আমাদের পূর্ণ ভরসাস্থল পাণ্ডাজীও রুদ্রপ্রয়াগ ছাড়ার দিনে বলেছিলেন, "মাইজী এইবার আপনাদের 'বিকট-পন্থ' আরম্ভ হলো!" এই সব নানাপ্রকার ভয়ের কথা শুনে শুনে মনেও বিশ্বাস দাঁড়িয়েছিল, এই পথ না জানি কি এক ভীষণ দর্শনই হবে! হয়ত বা এর কোনখানেই গাছপালা লতা-গুল্ম থাকবে না;—পাহাড়গুলি বুঝি বা রুক্ষতীক্ষ্ণ ভীষণ মূর্ত্তি ধ'রে, হাঁ করে গিলে খেতে আসা দুর্দ্দান্ত রাক্ষসের মতন, চারিদিক ঘিরে ক্ষুধিত মূর্ত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে!—রাস্তা দু'ফুটের বেশি কোথাও হয়ত চওড়া নেই! সর্ব্বত্রই এর উপর তালগাছের মত খাড়া চড়াই স্বর্গের দিকে সটান উঠে গেছে!—কিন্তু আশ্চর্য্য এই—এই যে বিশ মাইল পথ অতিক্রম করে এলাম, এর কোন একটা স্থানেও এই উদ্দাম কল্পনার সঙ্গে মিল পাওয়া গেল না! এদিনে আমরা যদিও কলনাদিনী মন্দাকিনীর তটভূমি হ'তে একটু দূরে স'রে এসেছি, তথাপি সমস্ত পার্ব্বত্য প্রকৃতি যেন নববধূ পার্ব্বতীর মতই অনির্ব্বচনীয় রূপযৌবনের দিব্যশ্রী বিমণ্ডিতা হয়ে ভক্তি শ্রদ্ধায় দর্শকের মুগ্ধ-চিত্তে দিব্যভাবেরই সমাবেশ ক'রে দিচ্ছে। এপর্য্যন্ত ভারতের মানদণ্ডস্বরূপ গিরিরাজ হিমালয়ের যে অংশটুকু আমরা অতিক্রম করতে পেরিছি, তা' থেকে বলা যায় যে কেদারনাথের এই যাত্রাপথটীর মত এমন রম্যস্থল আর কুত্রাপি কখনও দেখিনি। ঘন শ্যামলতায় এর দিগ্‌দিগন্ত সমাস্তৃত, গগনস্পর্শী বিরাট গিরিমালা যেন অপূর্ব্ব উৎসবমূর্ত্তি ধারণ ক'রে আছে। চারিদিকের পাহাড়ের উচ্চতা স্থানে স্থানে এত বেশি যে ঊর্দ্ধে চাইলে

উত্তরাখণ্ডের পত্র

আকাশের যে অংশটুকু দেখা যায়, সেটুকুকে একটী সাধারণ বাড়ীর প্রশস্ত অঙ্গনের চাইতে বড় মনে হয় না। বিশাল ও বিস্তৃত আকাশ এখানের কূপ-মণ্ডূকতায় যেন কল্পনার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক এক সময় হঠাৎ যেন এমনও মনে হয়, এই বিরাট বিশাল পার্ব্বত্য দুর্গ-প্রাচীর ভেদ ক'রে আর কখনও বুঝি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবো না! কখনও মনে হয়, এই সুপবিত্র পুণ্যভূমি, এই যে দেবঋষি নিসেবিত পুণ্যতপোবন জগতের সমুদয় দুঃখ সুখের অতীত, এই যে স্থান, জীবনের সকল জাল জঞ্জাল হতে মুক্ত হয়ে, সমস্ত বাসনার কামনার রাশিকে নিঃশেষে মুছে ফেলে দিয়ে এইখানে জীবনের অবসান করা মন্দ কি? এই তপোভূমিতে থেকে বিশ্বদেবতার ইষ্টদেবতার আরাধনায় যদি এ জীবনের শেষটাকে ধন্য ক'রে নিতে পারা যায়, এর চেয়ে এই ক্ষুদ্র তুচ্ছ মানব জীবনে আর বেশি কি করবার মত বাকি আছে? বস্তুত কেদারনাথের পথের যত বেশি নিন্দে শোনা ছিল, একে তেমনই কি ভাল লাগচে! এ যেন কোন স্বপ্নলোক! অমর কিন্নর গন্ধর্ব্বকুল পরিসেবিত অলকাপুরী! এ যেন দেবতাধিষ্ঠিত স্বর্গ নন্দনভূমি! এর সম্মুখভাগে চিরতুষারাবৃত অমল ধবল গিরিমালা, তার পদপ্রান্তে অসংখ্য সুশোভন ও সুশ্যামল বিবিধ বিচিত্র লতাগুল্মাদি আচ্ছাদিত সমুচ্চ-শীর্ষ বৃক্ষশ্রেণী বিমণ্ডিত পর্ব্বতরাজি। এরা সংখ্যাতীত কুসুমদামে খচিত ভূষিত হয়ে সেই অম্লান পারিজাতের স্তবক রাশি সমতুল্য শৈলশীর্ষের শ্বেত শোভা প্রবর্দ্ধমান করছে। আকাশের ঘন নীলিমা এই শুভ্রতার উপর যেন হীরার সঙ্গে নীলকান্ত-মণির, শ্বেতপদ্মের পাশে নীলপদ্মের মালার মতই শোভনীয় হয়ে আছে।

আকাশের মেঘ এদের অঙ্গে অঙ্গে লীলাময়ী সুরকন্যাদের মত ক্রীড়া-লঘু গতিতে কৌতুকভরে বিচরণ ক'রে বেড়াচ্চে। তাদের কখনও স্বর্গ-মন্দারের মতই অম্লান শুচি-শুভ্র সূক্ষ্মবাস, কখনও ঈষৎ ধূসর, কখনও গাঢ় ধূসর পট্টাঞ্চল লীলায়িত ভাবে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হতে থাকে। আবার যখন সেই ধূসর বা কৃষ্ণ-কাষায়ের মধ্য হ'তে অত্যুজ্জ্বল দামিনী-লতারূপী বেনারসী জরীর সাচ্চা কায ঝলমলিয়ে জ্বলে ওঠে, সে শোভার যেন তুলনা থাকে না। মাঝে মাঝে সুর-তরুণীদের নৃত্যতালে স্বর্গ-দুন্দুভি মেঘের রোলে বেজে ওঠে। গুরু গুরু গুরু গুরু মাদলের ধ্বনি তুলে যখন বাদল নামে, সেও এক দর্শনীয় বস্তু! এ দৃশ্য যত ভীত করে, ততই দর্শককে আনন্দও দেয়।

কেদারের এই পথখানি প্রকৃতি দেবীর সযত্নসেবিত চারু সুরম্য উপবন বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে যেন বর্ণ-শোভার মেলা বসেছে। চিত্র-শিল্পীর রঙের ভাণ্ডারে এর অর্দ্ধেকটা রঙ থাকলে সে চিত্রকরদের রাজা হয়ে যেতে পারতো। রেশম পশমের ফুলপাতা ফুটিয়ে তুলতে আমরা তিন রকম সবুজের শেডে প্রায় পনের যোলটা রংয়ের ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তার অফুরন্ত তুলির বাক্সে যে কত রকমেরই রঙ জমা করা আছে, এই থানের এই বিচিত্র শ্যামলতার মধ্যে চাইলেই তার বৈচিত্র্য দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। কত জাতীয় পাতা, আর তাদের গায়ে গায়ে রঙই কত! কোথাও কোমল নীলাভ সবুজের অবলেপে ময়ূরের কণ্ঠশোভা স্মরণপথে পতিত হয়, কোথাও পীতাভ নীলে মিশ্রবর্ণ চিক্কণ শ্যামলতায় ময়ূরপুচ্ছের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য পর্ব্বত পৃষ্ঠে অবকীর্ণ। এখানে পথের দু'ধারে দেরাদুনের মতই গোলাপের

ছড়াছড়ি। তবে দেরাদুনের গোলাপে গোলাপীর সংখ্যাটাই বেশি। এখানে সবই প্রায় সাদা। মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু হলদে গোলাপ এবং কদাচিৎ গোলাপী দু'চারটে মাত্র এপথে দেখেছি। আর একটি বিষয়ে এ দু' জায়গার গোলাপের পার্থক্য যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। কেদার পথের গোলাপ সবই একহারা "কিং এডওয়ার্ড"—জাতীয়, আর দেরাদুন নানাজাতীয় গোলাপে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। বসোরা রোজ, দামাস্ক, মন্টিক্রুষ্টো, কুইন মেরি, ভিক্টোরিয়া সবই তাতে প্রচুর। কিন্তু হোক একহারা, এই বিজন পার্ব্বত্যভূমিতে দেবী পার্ব্বতীর ফুলশয্যার-পুষ্প-বাসরের চিরস্মৃতি স্বরূপ এই পুষ্পকুঞ্জের সুপ্রচুরতাই যে এর অপ্রতিদ্বন্দ্ব সম্পদ্-ভূষণ।

গগনস্পর্শী সুউচ্চশীর্ষ বৃক্ষের সারা অঙ্গ গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপে খচিত। ফুলভার পীড়িতা লতা তাকে যেন নিজের যৌবন ভারে শিথিল দেহ—"ধর ধর"—বলেই সঁপে দিয়েছে। গাছে গাছে পাশাপাশি, ঠাসাঠাসি, লতায় লতায়, বৃক্ষে লতায় জড়াজড়ি, আর চারিদিকে পুষ্প-স্তবকের ছড়াছড়ি। এ সকল ফুলগাছের যে গাছেই যখন ফুল ফোটে, কোন খানটা আর ফাঁকি রেখে সে ফোটে না। পাতা ডাল ব'লে যেন তার আর কোন কিছু বাকি থাকে না, সর্ব্বত্র ভ'রে ফুলে ফুলে ফুলময় হয়ে যায়। সাদা লাল নীল পীত কতই বর্ণ, কতই শোভা, আবার তদধিক তাদের প্রাচুর্য্য! কচি কচি আলতা রংয়ের পাতায় দারচিনি প্রভৃতি গাছগুলিও ঐ ফুলের পাশে পাশে মনোলোভা হয়ে আছে।

মসুরী রাজপুরের রাস্তায় যে ফুল দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেম, সেই বরাস ফুলের এখানে যেন জঙ্গল হয়ে গ্যাছে। বড় বড় থোকা বাঁধা উজ্জ্বল লাল ও সুন্দর গোলাপী রংয়ের অসংখ্য তোড়ায় গাছগুলো যেন

শোভাযাত্রার সোলার ফুলের মতই তৈরি করতে হয়েচে। এরই নাম দিয়েছিলেম, 'পথের আলো'। তা দিলে কিছু মন্দ হয় না! আমার ৺দাদাবাবু বিলিতি ফুলের নাম বদলে তাদের শুদ্ধি করে জাতে তুলতেন জান তো? চুঁচ্‌ড়োর বাগানে ম্যাগ্নোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা—হয়েছিলেন পারিজাত। উভেরিরা স্বর্ণচাঁপা, ক্যামেলিয়া কাঁঠালি চাঁপা, আর একটা জহুরী চাঁপা ছিল, সেটার আসল নামটা আমি জানি না। 'সিজন ফ্লাওয়ার'গুলোকে 'ঋতুপুষ্প' বলা হতো।

মিস্ নোবল্ যদি কুমারী নিবেদিতা হতে পারেন, এরাই বা পারিজাত প্রভৃতি হতে পারবে না কেন? বরাস নাম এর যোগ্য নয়, তাই এর উপযুক্ত নাম দিলাম 'পথের আলো'। কাণা পুতের নাম যেমন পদ্মলোচন দেওয়া অসঙ্গত, তেমনই স্বর্বর্ণা-গৌরী মেয়েকে "কালু" বলে ডাকাও তো সমীচীন নয়!—কি বল?

যাক্ কতকগুলো বাজে কথাই বলা গেল। সত্যি এত সুন্দরকে এত ভীষণ শুনতেও যেন কষ্ট হয় ভাই! কিন্তু তাও বলতে হবে, এখনও মনে মনে বিলক্ষণ ভয় আছে যে এই মায়াকানন হয়ত বা অকস্মাৎ কোন সময় না কোন্ সময় না জানি কার মন্ত্রবলে কোথায় যেন মিলিয়ে যাবে, আর একটা বিকট মূর্ত্তি দানব এসে, আমাদের সামনে হাঁ করে দাঁড়াবে! আচ্ছা, আজ বিদায়!—এবার ডাকপড়েছে যাবার বেলা হলো।—ইতি

গৌরীকুণ্ড

শ্রীমান্ অম্বুজনাথ—কল্যাণবরেষু,

অমি—আমাদের ব্যাং বা বেবেঙ্গ চটি ছাড়ার খবর আগের চিঠিতে দিয়েছি। ৯ই মে বৈকালে বেড়িয়ে ফাটা চটিতে রাত্রিযাপন করা

হলো। মধ্যে মৈ-খণ্ডাতে মহিষমর্দ্দিনী দেবীর মন্দির, এটি একটি প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। চণ্ডী পাঠের জন্য পুরোহিতের আবেদন স্বীকার করে নিলেম। একপাশে লোহার শিকলে ঝুলনা ঝুলচে। যাত্রীদের তাতে ঝুলবার জন্য আহ্বান করা হয়, অবশ্য পয়সা দিয়ে। কেউ কেউ ঝুলচে দেখা গেল। স্কন্দপুরাণের মতে এইখানে পুরাকালে দেবী ভগবতী মহিষাসুর বধ ক'রে দেবতাদের মহা ত্রাস থেকে রক্ষা করেছিলেন, এবং দেবাস্ত্র-খণ্ডিত মহিষের দেহ এই পর্ব্বতের উপর পতিত হয়েছিল, তাই দেবীর নাম মহিষমর্দ্দিনী এবং স্থানের নাম মৈ-খণ্ডা। মৈ-খণ্ডার চারিদিকে নবকিশলয়-কোমল স্নিগ্ধ-শ্যামল শস্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ ক্ষেত্ররাজি। গ্রামটি লোকালয়-বহুল ও সুসমৃদ্ধ। দেবীকে প্রণাম করতেই মনে পড়ে গেল—

"যা শ্রী স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেম্বলক্ষ্মীঃ—
পাপাত্মনাং—কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজন প্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাস্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্॥"

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফাটা চটিতে পৌছান গেল। নাম শুনে বিতৃষ্ণা জন্মালেও আসলে কিন্তু এর কোন খানটাও ফাটা নেই, বেশ বড় চটি। এ দিককার চটিগুলি সমস্তই প্রায় বড় বড় ও একটু সমৃদ্ধ। এখান থেকে খানকত ফটো ও ম্যাপ কেনা হলো। ফটো অধিকাংশই কাল্পনিক দেবমূর্ত্তির। আসল ছবি শুধু পেলাম, একখানি ত্রিযুগী নারায়ণ মন্দিরের।

এখানে মোটামুটি সবই পাওয়া যায়, তবে দাম খুব বেশি। যথা

না, অথবা পাহাড়ের দিকে কুলিরা শব্দটা হতেই হেলিয়ে না ধরলে খা পড়লে—সে ভাবতেও পারা যায় না! খড়ের দিকের কাঠই ভে ছিল। ছাগলের সিংয়ের ধাক্কা, ছাগলের ভিড়ে পাহাড়ের দিকে বো ঠেঁসে চলায় ধাক্কা খাওয়া, এরই কিছুতে ভাঙ্গলো।

এদিন এই সব নানা কারণে খানিক খানিক থামতে হলেও, সব শু এক বেলাতেই এগার মাইল পথ আসা হয়েছিল। তার পর গৌরীকু পৌঁছে স্নানাদি করবার ইচ্ছায় উপবাসী থাকা হয়েচে, সর্ব্বোপরি তোমা সেজ-মাসিমার ডাণ্ডি ভেঙ্গে পড়ায়, তাঁর তো শরীরে অনেকটাই আঘা লাগলো, আমাদেরও সেই যে শক্‌টা লেগেছিল, তার থেকে যে আর ভাল করে সামলে উঠতে পারা গেল না। কি ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে যে ভগবান রক্ষা করলেন তা সেই অবস্থাটা না দেখলে বোঝা যায় না। সেই সাধু ব্যক্তিটির পরিহাসটাও হঠাৎ আজকের ঘটনায় আবার মনে পড়িয়ে দিলে—

"রাম নাম সত্য হ্যায়
দু'চার কা মৃত্যু হ্যায়"

গৌরীকুণ্ডে পৌঁছে বিশ্রামান্তে কুণ্ডস্নানে গেলাম। আজ সব দিনের মধ্যে আমাদের বেলা হয়ে গেছে,—১২টা বা[illegible]।

দু'টি কুণ্ড, একটি শীতল একটি উষ্ণ। [illegible]য়েতেই দুটি গো-মুখ লাগান। তপ্ত কুণ্ডে নেমে স্নান করা যায় না, ধারে ব'সে ঘটি করে জল তুলে নিয়ে জুড়িয়ে জুড়িয়ে লোকে গায়ে ঢালচে। আমাদের প্রধান-পাণ্ডব যুধিষ্ঠির মশাই বাহাদুরী ক'রে কুণ্ডে নেমে শেষে আর উঠে আসতে পারেন না। শীতে যেমন কম্প হয়, গরমেও একটা তেমনই

প্রবল কম্প এলো, পায়ে খিল ধরে গেল, টেটেনাস্ হয়নি শেষ পর্য্যন্ত সেই রক্ষা! তপ্তধারা দিয়ে রীতিমত গরম বাষ্প উড়চে। এরকম কুণ্ড মুঙ্গেরে, রাজগৃহে, চন্দ্রনাথে আরও অনেক স্থানেই আছে, তবে এই বরফের দেশে এর অবস্থিতিটা একটু অদ্ভুত বটে! চারিদিকের গিরিচূড়া এদিকে অনেক মাইল আগে থেকেই তুষারাবৃত দেখা যাচ্চে। স্থানে অস্থানে যেখানে সেখানে থেকে সেই তুষাররাশি সূর্য্যতাপ তপ্ত হয়ে গলিতাকারে পাহাড়ের গায়ে ঘোর শব্দে নিম্নাবতরণ করচে। এ যে কত তার হিসাব কে রাখে! স্থানে স্থানে দই বা কুল্‌পির মত আধ-জমাট তুষার-বারি উপর থেকে চওড়া ধারায় গড়িয়ে পড়চে, আর তাদেরি মধ্যভাগে এই আগুনে ফোটান তপ্তজলের গুপ্তধারা কোথা থেকে বেরিয়ে এসে শীতার্ত্ত যাত্রীদের শরীর গরম করে নিতে সুযোগ দিচ্চে? এ বিধান যে বিশ্ববিধাতার তাঁর কাছে অসম্ভব ব'লে তো কিছুই নেই! আচ্ছা ঐ সব বরফ চাপা পাহাড়গুলির মধ্যে কোথাও কোন আগ্নেয়গিরি আছে না কি? শুনেছি শুধু এখানেই নয়, সমুদয় বরফাচ্ছন্ন স্থানেই দু'একটা করে তপ্তধারা আছে। বিশেষ করে সেই সব স্থলই তীর্থ স্থান।

গৌরী দেবীর মন্দির সামান্য ভাবেরই। ভিতরে একটী রূপার বেড়ের মধ্যে শ্রীমূর্ত্তি। সামনে হোমকুণ্ড।

নানা কারণে কারুই শরীর মনের অবস্থা ভাল নয়, তোমার সেজ মাসিমা তো মোটেই সুস্থ ছিলেন না। সেদিন আর এখান থেকে বেরুনো হলো না। গৌরীকুণ্ড বেশ বড় চটি। আমরা উপরের খুব লম্বা একটা ঘর পেয়েছিলাম, জিনিষ পত্র মোটামোটি সবই মিললো। চাল ৮/০ সের, দুধ ।৵০।

পরদিন প্রত্যূষেই সাজ সাজ রব পড়ে গেল। পাণ্ডাজী বল্লেন এইবার কেদার পথের কঠিন স্থানে এসে পড়েচি, বিশেষ ধৈর্য্য সাবধানতা ও সময় দরকার। এই পাণ্ডাজীর মত কার্য্যদক্ষ ও যত্নপরায়ণ লোক বহুকাল দেখিনি। আমাদের চুঁচ্‌ড়ো বাড়ীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে একজন ছিল, সুরথ কাকা, কিন্তু এমন পবিত্রচেতা এমন ভক্তিমান নয়, শুধুই কর্ম্মী। এঁর চেষ্টা যত্ন ও সহৃদয়তার সীমা নেই। যেন আমাদের এখানে আসার জন্যে তিনিই সম্পূর্ণভাবে দায়ী, এমনই করেই বলচেন এবং এতটুকু অসুবিধা হলে লজ্জিত ও কুণ্ঠিত এত বেশি হন যে আমরাও লজ্জা পাই। আমাদের বামুন চাকর যত না করে, তাঁর লোকেরাই তিন ভাগ কায করে দেয়। সকলেরই সেবা সমান ভাবে করে, তার জন্যে ছোট বড় দেখে না, এইটি আরও চমৎকার!

তোমার সেজ মাসিমার ভাঙ্গা ডাণ্ডি কাল সারাদিন ধ'রে মেরামত করা হয়েচে। এখানে নূতন পাওয়া অসম্ভব! ঝাপানও খোঁজা হলো, তা'ও পাওয়া গেল না। কাযেই হালকা ও সরু বাঁশ কিনে, আট গুণ দামে দড়ি কিনে তাঁর এবং অপর সব্বাইকার ডাণ্ডিগুলিকে দুপাশে ও তলায় বাঁশ দিয়ে দড়ি দিয়ে খুব ভাল করে বেঁধে নেওয়া হলো। টাকা আটেকের দড়ি লাগলো। আমি ওর ভাঙ্গা ডাণ্ডিটায় চড়ে বসলুম। ওর চেয়ে আমার ভার কিছু কম, তাই আমি এটা বদলে নিলুম। অবশ্য অনেক বাদানুবাদ ক'রে তার পর এটা পাকা হলো—সহজে হয় নি।

এদিনের রাস্তা মোটেই ভাল না। এক মাইল অগ্রসর হতে না হতেই পথ ক্রমাগত পাথুরে ও চড়াই পেতে লাগলুম। সঙ্কীর্ণ ও

আঁকা বাঁকা পাকডণ্ডীর মতই—একে ঠিক রাস্তা বলা চলে না। তার উপর সেই সঙ্কীর্ণ পথ আবার কোথাও ধসে পড়ে গ্যাছে, তলা থেকে মেরামত হচ্চে, কোথাও তাও হচ্চে না। সেই সব জায়গা অতিক্রম করা যে কি ভয়ানক তা ব'লে বোঝান যায় না। পূর্ব্বে নাকি সারা কেদার পথই প্রায় এই রকমই ছিল। গৌরীকুণ্ড থেকে রামবাড়া, রামবাড়া থেকে কেদার এই ৭॥০ মাইল পথই সঙ্কটময় বরাবর শুনে এসেছি। কেদার পথের সৌন্দর্য্য দেখে আমরা যখনই তাতে মুগ্ধ হয়েছি, পাণ্ডাজী তৎক্ষণাৎ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—"মাইজী, আসল কঠিন স্থান তো আভি বাকি হ্যায়।"—এইবার সেই প্রতিক্ষণে স-ভীত চিত্তের প্রতীক্ষিত সঙ্কট-সঙ্কুল কেদার পথটীর প্রকৃত স্বরূপ আমাদের কাছে প্রকট হচ্চে! দেখি শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায়। পাণ্ডাজী বল্লেন, "তিন বৎসর মাত্র রুদ্র প্রয়াগ থেকে মঠরাম চটি পর্য্যন্ত ৪১ মাইল পথ নূতন তৈরি হয়েচে। এর আগে সমস্ত এই রকম ছিল। কলকাতার কয়েকজন ধনকুবের শেঠ কয়েক লাখ টাকা দিয়ে ঐ পথ করিয়ে দিয়েছেন। প্রতি বৎসরই এর কিছু কিছু সংশোধন চলচে। পাহাড়ে পথ তো একবার করিয়ে নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই, বর্ষায় উপর থেকে, গাছ পাথর পড়ে ভাঙ্গচে, নোড়ানুড়ি প'ড়ে চাপা প'ড়ে যাচ্চে, বরফে শীত-কালে যখন ঢাকা পড়বে, তখন যে কি হবে তার কোন ঠিকানাই ত নেই। একটু এগিয়েই তো সে দৃশ্য দেখতেই পাবেন।"

তা সত্যি, এই ৪১ মাইল রাস্তা যে পুণ্যাত্মারা তৈরি করিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের কি সোজা পুণ্যিটা হচ্চে! বাব্বা! এই রকম আগাগোড়া? তাহলে আমরা এক মাইল এসেই ফিরে যেতুম। এ'-

উত্তরাখণ্ডের পত্র

ক'দিন আহা কি রাস্তাই দেখলুম! বদরী পথের মতই প্রশস্ত চড়া উৎরাই নূতন নিয়মে ঘুরিয়া নিয়ে যাওয়ায় আরও বরঞ্চ সহজগম্য। আ প্রাকৃতিক শোভার তো তুলনাই নেই! মাইলের পর মাইল ধ'রে চলে গেছে, হাজার ডালের বাতি জ্বালানো ঝাড়ের মত গোলাপগুচ্ছে আপ্রান্ত খচিত ভূষিত গোলাপকুঞ্জ, তাতে নানাবর্ণের পাখীরা মধু স্বরে কূজন করচে, মৌমাছিদের গুঞ্জন ধ্বনি সে সবখানে অঙ্কুরি হয়ে রয়েছে, তার পর কামিনী চামেলী যূঁই শেফালি অতসী এবং 'পথের আলোয়' পথ আলোকে পুলকে ঝল মল করচে। গন্ধে সন্তানক পারিজাত সৌরভে চিরসুরভিত অমরাপুরীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্চে। আর মন্দাকিনী! স্বর্গ মন্দাকিনী ভূতলে অবতীর্ণা হয়ে কত ভঙ্গীতেই নৃত্য করতে করতে গান গেয়ে চলেচেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরে জলের ধাক্কা লেগে কোথাও তুলোধোনা কোথাও সমুদ্র তরঙ্গ কোথাও জাহাজের চাকা চলার মত জল তোলপাড় করচে। ঝরণার ঝর ঝর শব্দ সর্ব্বত্রই শ্রুত হচ্চে! এদিকে মৈ-খণ্ডা, ধরাসু প্রভৃতি সুপ্রচুর শস্যশালী ক্ষেত্রসংযুক্ত নগরীতুল্য সসমৃদ্ধ গ্রাম, এর পর্য্যাপ্ত স্বাস্থ্য-সম্পদে পরমৈশ্বর্য্যশালী প্রফুল্লচিত্ত অপূর্ব্ব সুন্দর নর-নারী (যাদের দেখে পৌরাণিক যক্ষদম্পতি ও কিন্নরীদের কথা স্বতঃই স্মরণে আসে।)—এই সবই অত্যন্ত চমৎকার লাগছিল। বিশেষ করে বিশাল মূর্ত্তি শ্যামল-বিটপী-বিমণ্ডিত পর্ব্বত পৃষ্ঠের পার্শ্বেই ধবল-তুষারের শুভ্রকান্তি সুউচ্চ যেন অপরূপ! কিন্তু আজকের পথের নমুনা পেয়েই আমাদের চক্ষুস্থির হ'লো!

এ পথ যেখানে সেখানে এক-আধ ফার্লং এই বছর নূতন মেরামত

হয়ে উঠেছে তাকেই 'পথ' বলা চলে, বাকি সবখানিই পর্ব্বত পৃষ্ঠ। প্রথম চার মাইলের অন্ততঃ মাইল দুইএর বেশির ভাগটাই ডাণ্ডি চড়ে যাওয়া চলে না। হেঁটে চ'লে ক্লান্তি যতই হোক, প্রাণটা বরং কিছু নিরাপদ থাকে। ঐ পথে ডাণ্ডিতে ব'সে প্রতি মুহূর্ত্তেই পতন ভয়, আর সে খড্ যে কত হাজার ফিটের তা আন্দাজ করেই নিও। তা ছাড়া এমন পথ নেই যে দুটো ক'রে মানুষ একসঙ্গে চলবে। কিরিচওলা লাঠি পুঁতে পুঁতে এক জনের হাত ধ'রে কোনমতে পা ফেলে ফেলে একাগ্রচিত্তে চলা। উঁচু নীচু কোথাও দু'তিন ফুট প্রশস্ত, কোথাও এক ফুট সঙ্কীর্ণ, কোথাও পথই নেই, কোথাও ভাঙ্গা পথের উপর গাছের ডালের তালি লাগানো,—এই রকম পথে দুজন লোকের সাহায্য নিয়ে অত্যন্ত সাবধানে ও কষ্টে অগ্রসর হতে লাগলুম। আমাদের মত সমতলবাসীদের পক্ষে এ যে কি বিষম অবস্থা, তার বেশি বর্ণনা না দেওয়াই ভাল; কারণ আমাদের পক্ষে যতই কষ্টকর হোক না কেন, অন্যের পক্ষে হয়ত সেটা হাস্যকরই হবে। তবে আমাদের কপালে মধ্যে মধ্যে এ বৎসর যে নূতন গুলিও তৈরি হয়েছে, তাতে তবু খানিক খানিক করেও ডাণ্ডি চড়ে বসতে পারচি, চড়াই ওঠার শক্তিটা যে কম সেতো দু'বার সিঁড়ি উঠতে হলেই দেখতে! স্থানে স্থানে একহাত সরু রাস্তা, তাও যেন পা দিলেই খসে আসচে। গাছের গুঁড়ি এসে পথ আটকেছে তারই উপর দিয়ে চলতে হয়। কোথাও চার পাঁচ হাত উঁচু পাথরের ধাপের মত বড় বড় পাথরের রাস্তা, সে সব জায়গায় বসে ওঠা-নামা করতে হলো। সবচেয়ে ভয়ানক যেখানে রাস্তা ভেঙ্গে পড়ে গ্যাছে, আলগা ভস্মস্তূপের মত অঙ্গার-মাটির

পাহাড়ের গা দিয়ে এক একটী পা ফেলে, লাঠি পুঁতে ও পাণ্ডাজী এ[illegible] তাঁর লোকজন এবং কুলিদের সাহায্যে কোন মতে চলা!

অতিকষ্টে পথ চ'লে—কখনও হেঁটে, কখনও ডাণ্ডিতে, এই বস[illegible] এই চলা ক'রে এত শীতেও গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে রামবাড়ার আধ মাইল আগে এসে পৌঁছলাম। সেখানে এসে যে অপরূপ দৃশ্য দেখলেম, তাতে সকল ক[illegible] যেন তৎক্ষণাৎ সার্থক হয়ে গেল! অনেকখানি স্থান ব্যেপে (আধ মাইল তি[illegible] ফার্লং তো বটেই) মন্দাকিনীর উপর দিয়ে প্রায় ২০।৩০ ফিট বরফ জমে আছে, আর তার তলা দিয়ে কর্ণবধিরকারী ঘোরতর গর্জ্জনশব্দে গলিত বরফের ধারা তীব্রবেগে ছুটে নীচের দিকে নেমে যাচ্চে। ঊর্দ্ধে সর্ব্বত্রই বরফ। আমাদের যাত্রাপথের স্থানে স্থানে ২০।৩০ ফুট ক'রে বরফ জমে আছে। তুষারের হাল্কা গুঁড়া নয়, রীতিমত মিছরীর কুঁদোর মত জমাট চাপ দানাদার বরফ। আমাদের কিন্তু নামতে হলো না। জায়গাটি সমতল গোছের ছিল ব'লে, ডাণ্ডিওয়ালারা সাবধান ন্যস্ত পদে ধীরে ধীরে বরফের পুল ও জমি পার হতে লাগলো। আহা ওরা ক'টা টাকার জন্যে কত কষ্টই যে সহ্য করে! এখন মনে হচ্ছিল, ৩৫০৲ টাকা এসব কষ্টের তুলনায় কিছুই বেশি নয়।

চটি বিশেষ সমৃদ্ধ নয়। তা'এরূপস্থলে কেইবা এর চেয়ে বেশি আশা করেছিল! বরফের জমিতে সদ্য মাটি ফেলে তৈরি চলতে গেলে দলদল করে, পা ব'সে যায়। খুব পুরু ক'রে খড় বিছিয়ে তার উপর কম্বল পাতা, তার উপর দু'তিনখানা র‍্যাগ পেতে বসেও বেশ ঠাণ্ডা মনে হচ্ছিল। কাছেই একটি ঝরণা আছে, উপরে নীচে সর্ব্বত্রই জল একই রকম ঠাণ্ডা, বরফজলে হাত দেয় কার সাধ্য! অথচ ঐ জলে স্নানও করচি,

অসুখ ছেড়ে স্নানের পরই সবচেয়ে সুস্থ মনে হয়। আজ কিন্তু স্নান করাও গেল না এবং পথে বেরবার পর এই প্রথমদিন আমাদের খিচুড়ি রান্না হলো। পাণ্ডাজী বল্লেন এখানে রাত্রিবাস অসম্ভব, তার চেয়ে কেদারে শীত যতই হোক, বদ্ধ ঘরওলা বাড়ী আছে, অতএব কেদার পৌঁছাতে হবে।

অল্প বিশ্রামেই অনেকখানি ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। চড়াই উঠতে বুকে যে হাঁপ ধরেছিল তারই জন্যই হয়ত বুকটা একটু যেন দুর্ব্বল দুর্ব্বল বোধ হ'তে লাগলো, আর নিশ্বাস নিতেও একটু কষ্ট বোধ হচ্ছিল। তাহোক, বাকি তিন মাইল যাওয়া অসম্ভব মনে হলো না। তা ছাড়া যেতে ত হবেই, এখানে ত আর রাত কাটান চলবে না। অল্পমাত্র বিশ্রামান্তে সকাল সকাল বেড়িয়ে পড়া হলো অর্থাৎ ১টার পূর্ব্বেই। এখানে ত রৌদ্রের ভয় নেই, বরং পাণ্ডাজী বল্লেন এখানে বেলা বারটা থেকে মেঘ নেমে বৃষ্টি অর্থাৎ তুষারপাত সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্তই চলে, অতএব যত শীঘ্র বেরুনো হয় ততই ভাল। তথাপি আমাদের বেরুনো আর একটার পূর্ব্বে ঘটে উঠলো না। অতগুলি চাকর বাকর, কুলির দল সব রাঁধবে খাবে, বাসন মেজে জিনিষপত্র বেঁধে তুলবে, তবে ত বেরুনো হবে। এইখানে জ্যুং গোড্ডায় বা ভীমগুহায় ভীমসেনের মূর্ত্তি আছে। বিকট পন্থের প্রবেশ দ্বারেই বীরের স্মৃতি স্মরণীয় বটে! পথ একেবারে ভীষণ খাড়া চড়াই দিয়ে আরম্ভ হলো। তা ছাড়া পথ একেবারেই যে এ নয় সে কথাও পূর্ব্বে লিখেছি। মনে হলো যেন তালগাছে উঠছি! তাও আবার এব্‌ড়ো থেব্‌ড়ো পাথরের উপর দিয়ে। স্থানে স্থানে সেই পথই আবার নেমে চলে গেছে, মেরামত হচ্ছে। দুজনে দুইহাত ধ'রে

অতিকষ্টে ধীরে ধীরে পা ফেলে মুহুর্মুহুঃ আসন্নপতনকে প্রাণপণে রো‍ধ ক'রে সে যে কি বিপদের পথ চলা, সে কথা অবর্ণনীয়! কেদার পথের যত নিন্দা শুনেছিলেম, সে সবই কি একত্র জমা হয়ে এই সাতটী মাইলের ভিতরেই লুকিয়ে ছিল? তার উপর আবার এ যেন শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হতে লাগলো। সে কষ্ট বলবার নয়। মনে হচ্চে, যেন নিশ্বাস নিতে বা ফেলতে পারবো না। শরীরের বল যেন কমে আসতে লাগলো, শুধু চেষ্টা রইলো শ্বাসগ্রহণ করা। রামবাড়া থেকে দু'মাইলে চীরবাসা ভৈরব। এখানে পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে এক খণ্ড দিতে হয়, গাছের গায়ে তার যথেষ্ট পরিচয় রয়েচে। আমরা নূতন টুকরা এনেছিলুম তাই দিলুম।

কিন্তু—কি সে দৃশ্য!—অপরূপ! অপরূপ!—উর্দ্ধে, অধেঃ, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে, ঈশানে, নৈঋতে, বায়ুতে, অগ্নিতে, যেদিকে যত দূরে দৃষ্টি যায়, আকাশে পৃথিবীতে একমাত্র অমল-ধবল উজ্জ্বল শুভ্রতা ব্যতীত আর কোথাও কোন বস্তু নাই, বর্ণ নাই, কিছু নাই।—মনে পড়ে গেলে,—

"কল্পার্ণব ইবাত্যন্ত পরিপূর্ণৈকবস্তুনি—
নির্ব্বিকারে নিরাকারে নির্ব্বিশেষেভিদাকুতঃ।

কল্পার্ণবের মতই যেন এই শুভ্রতাও এখানে "প্রত্যগে করসং পূর্ণং" এবং "অনন্ত" ও "সর্ব্বতোমুখম্" বলেও প্রতীয়মান হচ্ছিল। বিশ্বে যে আর কোন কিছুই বর্ত্তমান আছে, তা ভুলে যাওয়া গেল, কিন্তু এর সঙ্গে যদি তখন তুচ্ছ আত্মচিন্তা—যথা, প্রাণপণে কৃচ্ছশ্বাস এবং নিদারুণ শৈত্যের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ না করতে হয়ে, "সদ্ঘনং চিদ্ঘনং নিত্যমানন্দ-

ঘনমক্রিয়”কে—ধ্যান করতে পারতেম,—তবেই না এত দুঃখের কেদার আসা সার্থক হতো! তা না হয়ে হলো কি? এখন হাসি পায়, তখন কিন্তু হাসবার অবস্থাও ছিল না।

অনেকক্ষণ থেকেই তুষারপাত হতে আরম্ভ হয়েছে। সে তুষার বাতাসের গায়েও পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে ভেসে বেড়াচ্চে। মেঘে চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। স্থানে স্থানে অল্পবিস্তর গড়ানে বরফের স্তূপ পার হয়ে আধমরা অবস্থায় এসে দেখলাম ওই দৃশ্য!—অর্থাৎ প্রায় দু'আড়াই মাইল একেবারে ঢালা বরফের ময়দানে পরিণত হয়ে আছে! কেদার একটি প্রশস্ত অধিত্যকা—সমতল বলেই মনে হয়। অতিকঠিন চড়াই চড়া, দুর্গম পথের সঙ্কটময়ত্ব, হু হু শব্দে ঝড়, মাথার উপর তুষার-বৃষ্টি (কারণ হেঁটে চলার সময় মাথায় ডাণ্ডির টপও নেই, ছাতা ধরে চলাও অসম্ভব) অসহ্য শীত এবং সর্ব্বোপরি প্রাণান্তকর রুদ্ধশ্বাসে আমাদের সকলকেই প্রায় জখম করে ফেলেছিল। তবে তোমার সেজমাসিমার কোন দৃকপাতই দেখলুম না। তিনি খুব স্ফূর্ত্তিতে চলেছেন! পঙ্কুও চুপচাপ আছে। আমি আর সুজুর মা এই দুজনেই সব চেয়ে শ্বাসকষ্ট বেশি পাচ্ছিলাম। প্রায় ১৩০০০ হাজার ফিট উঁচু বরফাবৃত পর্ব্বতের হাল্কা হাওয়াই যে এত অনর্থের মূল সে কথা তো তখন কারোই মনে হয় নি। দু'একবার তখন এমনও মনে হয়েছিল যে, এই অন্তহীন শীতল তুষারের রাশিই আমার শেষ শয্যা, এই তুষারসিক্ত ঝটিকাযুক্ত উদ্দাম বায়ুতেই আমার এই রুদ্ধপ্রায় শ্বাসবায়ুর শেষ সংমিশ্রণই আমার এ-যাত্রার পরিণাম! এখন বলতে অবশ্য লজ্জাই বোধ হয়, যাঁর উদ্দেশ্যে এই ক্লেশ স্বীকার করা, তাঁর চেয়ে বেশি করেই মনে পড়তে লাগলো ছেলে-মেয়েদের মুখ,

তোমাদের মনে এ সংবাদটা কত বড় হয়ে বাজবে এ কথাটাও সেই সঙ্গে মনে হলো। আর তার চেয়েও বেশি করে মনে হলো মায়ের কথা!

দেব-দেখনি নামক চটি বরফের গায়ে একটুখানি বিশ্রামের স্থান হয়ে আছে। গরম চা তৈরি হচ্চে। আমরা অবশ্য খেলুম না, তবে কুলিদের খাওয়ানো গেল। আহা বেচারারা তো সোজা কষ্ট করচে না। যেখান থেকে ঢালা বরফের ময়দান এলো, কুলিরা আমাদের ডাণ্ডিতে বসতে বল্লে। এখানে গড়িয়ে খডে পড়বার *সম্ভাবনা নেই, তবে কুলিদের পা পিছলালে বরফে পড়ে হাত পা ভাঙ্গা অথবা তাদের সঙ্গে অর্দ্ধ গলিত বরফ স্তূপে জীবন্ত সমাধি অবশ্য হতেই পারে! কিন্তু সে যা হয় হোক, আর চলবে কে? চলবার শক্তি তো গেছেই, এখন ডাণ্ডিতেই পৌঁছতে পারলে বাঁচা যায়।*

বার বার বরফের মধ্যে দিয়ে চলার সময় দুটো জুতো বদলান হয়েচে। রবর সোলও এ বরফে মানবে না, তা ছাড়া এতো আর হাল্কা তুলার মত নয়, রীতিমত পা পর্য্যন্ত পুঁতে যাচ্ছে। ভিজে জুতো মোজা দুবার বদল ক'রেই তিনবারের বার ভিজে পরে থাকতে হলো, আর তো ছিল না। কিন্তু তাতে আর কতই এসে যায়! গায়ে মোটা সেমিজের উপর পিওর উলের গেঞ্জি, মোটা গরম কোট, গরম পেটিকোট, অলষ্টার, র‍্যাপার, র‍্যাগ, মাথায় সুতীর ওপর গরম কাপড় বাঁ মাফলার ও হাতে দস্তানা, সবই আছে। তবু কি শীত কিছু কমচে? উপর থেকে ধোনা তুলার চাপের মত তুষার এসে পড়চে। ডাণ্ডির টপ তোলা, ছাতা খোলা, বসে থাকতে আর এখন গায়ে লাগছে না, কিন্তু শীতে বুকের মধ্যে রক্ত জ'মে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন থেকে থেকে বন্ধ হয়ে

আসছে। ডাণ্ডিওয়ালাদের হাঁটু পর্য্যন্ত পুঁতে আসছে, পা পিছলাচ্ছে। দু'পাশে দু'জন ক'রে লোক। পাণ্ডাজী, তাঁর চারজন গোমস্তা চাকর, তদ্‌ভিন্ন "স্বর্গ-মন্দাকিনী" থেকে তাঁর ভাই ভাইপো প্রভৃতি আরও দশবারজন আমাদের নিতে এসেছিল। তারা ক্রমাগত আমাদের ভরসা দিতে দিতে চলেছে। পাণ্ডাজীর এক ভাইপো কাশীতে থিওসফিক্যাল স্কুলে পড়ে, গ্রীষ্মের বন্ধে বাড়ী এসেছে, সে আমার সঙ্গী হয়ে নানা কথায় ছেলেভোলান ক'রে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করতে লাগলো। যখন নিতান্ত অবসন্ন হয়ে পড়চি দেখছিল, তখনই মিনতি করে বলে,

"Please don't afraid, please dont !"

তার রকমে হাসি পেয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু হাসবার তখন শক্তি কোথায় ?

অবশেষে এত দুঃখের এত সাধনার স্থান পাওয়া গেল। বরফ জমাট মন্দাকিনীর উপরের বরফের পুল পার হয়ে তুষার রাজ্যের রাজধানী তুষারপুরীতে প্রবেশ করলেম। যদিচ, নাম পরিবর্ত্তন হলো, ধামও পরিবর্ত্তন হলো, কিন্তু রূপ পরিবর্ত্তন কিছুই হলো না। কেবল একার্ণব-শয়ান নারায়ণের মত কেদারনাথের বিশাল মন্দিরটি সেই বরফাবৃত দেশের মধ্যে সম্পূর্ণ বরফশূন্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখা গেল। অবশ্য তার চত্বরের চারিধার এবং সোপানগুলি পর্য্যন্ত বরফে ঢাকা। মন্দির নাকি বরফ থেকে কেটে বার করা হয়েছে। দু-একটী ছোট খাট মন্দিরও বরফ-মুক্ত করে রেখেছে। যাত্রীদের আশ্রয়স্থল বাড়ীগুলির উপরের ছাদ প্রাচীর সবই বরফে ঢাকা দেওয়া, শুধু দোর জানালার বরফ কেটে, যাওয়া আসার পথ করে দেওয়া আছে। শুনলুম পাহাড়ে এখনও ৪০।৫০ ফিট পুরু বরফ পড়ে আছে।

দ্বিতল গৃহের ছাদ থেকে সমতল পর্য্যন্ত কুড়ি পঁচিশ ফিট পুরু বরফের ঢালু জমাট, অথচ জানালা দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে জানাচ্চে যে ঐ বরফ ঢাকা পদার্থটীর মধ্যে মানুষ রয়েচে। ধোঁয়া লেগে জানালার পাশ থেকে কাঁচের লম্বা নলের মত বরফ গ'লে ঝুলে পড়েচে। মন্দাকিনীর স্রোত নেই, জল নেই, কুণ্ড প্রভৃতির চিহ্ন নেই, আছে শুধু সর্ব্বত্রব্যাপী তীব্র শুভ্রতা। শুনলেম আর কয়েক দিন মাত্র পূর্ব্বেও দু'পাশের পাহাড়ের মধ্যের বিভক্তি চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না, সব একাকার হয়ে গিয়েছিল। এও শোনা গেল যে এবার নাকি তুষারপাত অত্যন্ত বেশি হয়েচে, সাধারণতঃ এতটাই প্রতি বৎসর পড়ে না এবং আমাদের আসাটাও একটু শীঘ্র হয়ে গেছে। বেশির ভাগ কেদার যাত্রীরা শেষ বৈশাখে বেরিয়ে মধ্য জ্যৈষ্ঠেই এখানে এসে পৌছান, তত দিনে সমতলের অর্থাৎ কেদার পৃষ্ঠের প্রায় সমস্ত বরফ গ'লে গিয়ে মন্দাকিনীর ধারায় পরিণত হয়ে পড়ে। না জানি ঐ মরা গাঙ্গে তখন কি রকমই জোয়ার আসে! কেদার পর্ব্বতপৃষ্ঠের প্রশস্ততা তিন মাইল। যদিও ইনি সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ১৩০০০ ফিট উচ্চ, তবু একে সমতলই মনে হচ্চে, কারণ এর গায়ের উপর স্বর্গপথ বা মহাপন্থ নামে যে পর্ব্বতচূড়া বিদ্যমান তার উচ্চতা নাকি ২৪০০০ ফিট। কাযেই তার তুলনায় ইনি সমতল বই কি? বিশেষ এত কষ্টের মধ্যে এইটুকু সুখ যে কেদার পর্ব্বতটীর পৃষ্ঠ কূর্ম্ম পৃষ্ঠের মত প্রশস্ত, মৎস্য পৃষ্ঠের ন্যায় সঙ্কীর্ণ নয়। পাণ্ডাজী বল্লেন, এই বরফ গলতে আরম্ভ হলেই এই সমস্ত বরফাবৃত ভূমি থেকে ভুঁই-চাঁপার মত নানা বর্ণের এক রকম ভুঁইফোড় ফুল সঙ্গে সঙ্গেই ফুটে ওঠে। পাণ্ডাজী বল্লেন "মাইজী, এখন যত বরফ দেখচেন, আষাঢ় মাসে

এলে এমনই ফুল দেখতে পেতেন। কোথাও একটু জমি খালি থাকে না—অবশ্য এর পরের চিরতুষার রেঞ্জ বরাবর এমনই থাকে।"

তখন মনে হলো, আহা আষাঢ় মাসে এলেই হতো ভাল, না হয় ফুলই দেখতুম! এ যে আর কিছুই দেখতে না পাবার জোগাড় হয়ে উঠেচে!

বরফপথের প্রথম দিকে যেখানে যেখানে একটুখানি ফাঁক পেয়েচে গোলাপী, হেলিও, হলদে, নীল নানা রংয়ের ছোট ছোট ফুলের গোছা পাথরের বুকের উপর দিয়ে ফুটে উঠেছে। ঐ ফুল ছাড়া কেদার পুরীর ঐ বরফা- বৃত কয় মাইলের মধ্যে আর তৃণগুল্মটী পর্যন্ত জেগে নেই।

আমাদের পাণ্ডাজীর যত্নের ও চেষ্টার সীমা ছিল না। এ রকম না হলে পাণ্ডা! আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সাধ্যাতীত আয়োজন করে রেখেছেন। পাকা বাড়ীর দোতলায় দুটী ভাল ঘর সতরঞ্চি, গালচে ও ঘন পুরু ভোটানী কম্বলে মুড়ে রেখেছেন। দেওয়ালের গায়ে ও কম্বলের উপর মুর্টিয়া ছাপের চাদর টাঙ্গানো। ঘরের মধ্যে বড় বড় লোহার উনানে আগুন জ্বলচে। নূতন নূতন লেপ কম্বলের গাদা। আমাদের প্রচুর শীত বস্ত্রের উপর এগুলি পর্য্যাপ্তই হয়ে উঠলো।

প্রথম কিছুক্ষণ রুদ্ধশ্বাসের ভীষণ চাপে নিস্পন্দ হয়ে লেপমুড়ি দিয়ে থাকার পর কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে উঠে, আগুনের কাছে বসতে পারা গেল। ঘরে গরমের যথেষ্ট আয়োজন ও চেষ্টা সত্ত্বেও শীতার্ত্ততা থেকে তখনও সম্পূর্ণ আত্মরক্ষা করতে পারা যায়নি। জুতোমোজা বদ্‌লে হাত-পা তাতিয়ে গরম চা খেয়ে শীতটা অনেক কমে গেল বটে, কিন্তু শ্বাস-কষ্টটা আর যেতে চাইলে না। নিশ্বাস নিতে সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে

যেতে লাগলো। হার্ট সামান্য দুর্ব্বল ছিল বটে, কিন্তু হঠাৎ এমন অসম্ভব রকম যন্ত্রণা দিতে লাগলো কেন? হার্টফেল হবে না, হলে এতক্ষণ হয়ে যেত, কিন্তু ভয় হলো, হয়ত একটা কিছু বেশি রকম হয়ে এখানে সব্বাইকে না আটকে ফেলতে হয়। এদিকে স্বজুর মায়ের অবস্থা আমারও বাড়া! তিনি বিছানা নিলেন, আমি নিলুম না।

মনের ভিতর থেকে কতকটা বল সংগ্রহ করে নিয়ে, অথবা যিনি এই কঠিন পথে টেনে এনেছেন তাঁরই অচ্ছেদ্য আকর্ষণের পাশে নিবদ্ধ থেকে কোন মতে নীচে নামলেম। তখন শ্বাসকষ্ট কিছু সামলেচে, কিন্তু থেকে থেকে বুক যেন কে' দুহাত দিয়ে চেপে ধরে দম বন্ধ করে দিচ্ছিল, হাঁটু যেন চলতে চাচ্ছিল না, তবু সেই বরফে আচ্ছন্ন পথ দিয়ে সবার সঙ্গে মন্দিরে গেলাম। পঙ্কজ দিদি গেলেন না, বল্লেন, "আমি ওর জন্যে ঢের কষ্ট করেছি, আর আমার শক্তি নেই,—এইবার ওর ইচ্ছে থাকে, নিজে এসে দেখা দিক।—আমি দেখতে যাবো না।"

তুষারপাত তখন থেমে গেছে, বৈশাখী শুক্লা দশমীর প্রস্ফুট জ্যোৎস্না-লেখায় সেই অদ্ভুত তুষাররাজ্য আশ্চর্য্য সুন্দর দেখাচ্চে! ঝটিকা-ক্ষুব্ধ বাতাসের বিকট গর্জ্জন, তুষারপাত-পিচ্ছিল পথের দুর্গমতা, শুভ্র বরফের উপর কালো মেঘের আচ্ছাদনে তাদের কপিশ মূর্ত্তি পরিগ্রহ, মেঘান্ধকারে সূর্য্য ঢেকে থাকা, এই সবেতেই আরও যেন কেমন একটা ভয়াবহ আতঙ্কে ক্লেশ-ক্লান্ত মনটাকে ছেয়ে ফেলেছিল। আবার এর এই জ্যোৎস্না-জাল বিজড়িত, নির্মেঘ অমল শুভ্রতা যেন সেই অবসন্ন চিত্তকে নূতন সৌন্দর্য্যের যাদুযষ্টি ছুঁইয়ে দিয়ে অনেকখানি তাজা ক'রে তুল্লে। মর্ম্মর মন্দির গ'ড়ে মানুষ তার সৌন্দর্য্য-পিপাসা মিটায়, তার কি তুলনা কখন এর সঙ্গে

হ'তে পারে? এ যেন জগদতীত কোন আশ্চর্য্যভূমি! সুদূর প্রসারী অত্যুন্নত গিরিশৃঙ্গ শতপথ, স্বর্গপথ বা মহাপন্থ তার চির মৌন মূক গম্ভীর দৃষ্টি মেলে যেন সমস্ত অতীতকালের সাক্ষী স্বরূপে দাঁড়িয়ে আছে। চির ভবিষ্যৎকেও সে যেন তার মাথায় ছোঁয়ান অসীম আকাশপটেই লিখিত দেখতে পাচ্চে। সে যেন চির যুগ যুগান্তরের তপসিদ্ধ ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ! আজ এই জ্যোৎস্না-সমুজ্জল যামিনীতে তার দিকে চেয়ে মনে হলো, ওই যে গগনস্পর্শী শুভ্রতা, যেন ভারতবর্ষের পূর্ব্ব পিতামহগণের—মানব সভ্যতার আদিপুরুষদিগের—অসীম জ্ঞানের এবং একান্ত ধ্যানের সমস্ত পুণ্য ঐ বিশাল মূর্ত্তি ধ'রে আজও এই একান্ত তপোভূমে কোন্ অনাগত ভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষা করে রয়েছে। বুঝি সে একদিন আসবে এবং সেদিনে আবার এই পূর্ব্বাচার্য্যদের কঠোর তপস্যা-অর্জ্জিত সুপ্রচুরতর পুণ্যফল তাঁদের উত্তর পুরুষদের উদ্দেশ্যে ফলোনোন্মুখ হয়ে উঠবে! ওই মৌন তপস্বী তখন যেন মুখর হয়ে উঠে তাদের পথ বলে দেবেন, গভীর আবেগে মনটা যেন সহসা আলোড়িত হয়ে উঠলো।

মন্দিরটি বিশাল। এই দুর্গম পথের যাত্রাশেষে, সার্থকনামা চিরতুষারাবৃত হিমবন্তের একেবারে ঠিক সন্ধিস্থলে এত বড় প্রকাণ্ড দেবমন্দির যেন স্বপ্নের মতই মনে হতে লাগলো। এই কা[illegible] করলে কে'? করলে কি ক'রে? এই প্রশ্নই বারংবার মনের মধ্যে তোলাপাড়া হ'তে লাগলো। মাত্র তিনটি মাস তো এ দেশে তুষার পড়ে না এবং বরফ গলে যায়,—এ তো তিন মাসের কর্ম্ম নয়! কত বৎসর লেগেছিল কে' জানে! মন্দির বারটার সময় বন্ধ হয়ে যায়, সন্ধ্যার সময় মন্দির খুলে আরতি করা হয়।

আমাদের জোর কপাল, সেই মুহূর্ত্তেই সেদিন দেবতার রুদ্ধ দ্বা মুক্ত হলো। পাষাণচত্বরের সম্মুখভাগটুকু শুধু বরফমুক্ত। বৃহত্তোর দ্বারে প্রকাণ্ড ঘণ্টা ঝুলচে, দুপাশে দুই দ্বারী মূর্ত্তি। ভাল বুঝতে পারলু না, নন্দী ভৃঙ্গী কেউ কিছু হবেন হয়ত! ভিতরে ঢুকেই বেশ প্রশস্ত জগমোহন। মধ্যস্থলে নন্দিকেশ্বর সযত্নে পূজিত হচ্চেন। প্রাচীরে খাটালে খাটালে পঞ্চ পাণ্ডব, দ্রৌপদী,—কুন্তীদেবী (তিনি যে কখন কোত্থেকে এলেন, জানা গেল না!) পাথুরে মূর্ত্তিতে বিরাজ করচেন তাঁদের প্রতি বিশেষ মনোযোগের চিহ্ন লক্ষিত হলো না। এই জগমোহনের পরেই একটী ছোট্ট কুঠরি, তার দুপাশে ছোট ছোট দুটী ঘরে গৌরী ও লক্ষ্মী দেবী প্রতিষ্ঠিতা। এঁদের বেশ অবস্থাপন্ন ভাব দেখা গেল। সম্ভবতঃ শ্রী এবং শক্তির অধিষ্ঠাত্রী ব'লে সকলেই একটু ভয়ে ভক্তি করতেই বাধ্য হয়। এর সামনে প্রধান মন্দিরে কেদারনাথের বিশাল মূর্ত্তি তখন ছিটের কাপড়ে ঢাকা ছিল, (ভুবনেশ্বরেও এই নিয়ম দেখেছি)। সেদিন যেন আব্‌ছা গোছের দর্শন হলো। মন বুদ্ধি সমস্তই যেন কেমন একটা আচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েচে কিনা। নিশি-পাওয়া মানুষের মতন যেন ঘুমের ঘোরে বেড়াচ্চি, স্বপ্নে যেন দেখচি শুনচি, এ যেন একট অদ্ভুত রকম নূতন অনুভূতি!

আমরা ফিরছিলাম, জানা গেল শীঘ্রই আরতি হবে। দুটী বড় বড় পেট্রোল ল্যাম্প হাতে ঝুলিয়ে পুরোহিতের দল এসে পৌঁছলেন। তাঁদের সর্ব্বাঙ্গে কম্বলের পরিচ্ছদ। গোড়ালী পর্য্যন্ত পা-জামার উপর গরম পটি জড়ান, মাথায় কাণ ঢাকা ক্যাপ গোছেরই টুপি, শুধু পায়ে জুতো নেই, এই বরফে কি করেই পারচে! আমরাও মন্দিরে পুনঃ প্রবেশ করলেম

টে, কিন্তু শ্বাসকষ্ট এত বেড়ে উঠেচে, কি করেই পারছিলুম, তাও ভাল জানি না।

বাড়ী ফিরে কিছুক্ষণ মুড়িসুড়ি দিয়ে প'ড়ে থাকা গেল। লেপ তোষকের ত কিছুমাত্র অপ্রতুলতা ছিল না। ঘরে আগুন জ্বলচে, (যদিও এক টাকা সের করে জ্বালানী কাঠ) আগের মতন অসহ্য শীত আর বোধ হচ্ছিল না, যেমন শীত কালের শীত হয়ে থাকে তেমনই। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলে দেখি, মাথার কাছে বসে তোমার সেমজাসিমা আর প্রধান পাণ্ডব অর্থাৎ রাঙাদিদি, পথে সংগ্রহ করা ফুল দিয়ে কেদারের জন্যে গোড়ে মালা গাঁথচেন। আমায় মুখ তুলতে দেখে সমুৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "মালা গাঁথবেন ?"

ইচ্ছা হলো বটে, কিন্তু মাথা আর উঠতে চাইলে না। বল্লুম, "আর মালা গাঁথে না !"

যুধিষ্ঠির বল্লেন, "ও কিরে ! অমন করে শুয়ে থাকলে হবে কি ক'রে ?—উঠে বসে সব দ্যাখ্, শোন্, লেখ, এই তো লেখবার জায়গা !"

আমি বল্লুম, "দাঁড়াও আগে বেঁচেই ফিরি, তখন দেখা যাবে।"

পঞ্চুও সেদিন সুবিধার অবস্থায় ছিল না বুঝতে পারা গেল। সহজে কাবু হয় না, সেদিন ফিরে এসেই নিঝুম হয়ে শুয়ে পড়লো। ঐ জন আর অর্জ্জুনটি ছাড়া সকলেই শা ন্ত, একজন তো মোটে ঠেনই নি।

আমাদের চাকর বামুন হেঁটে এসেচে। তাদের দশা আমাদেরও বড়া। নিচের তালার ঘরগুলোয় তারা ও সমস্ত কুলিরা পাণ্ডাজীদের ওয়া কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েচে। পাণ্ডাজী না থাকলে তাঁর এক গাদা

লোক না থাকলে আমাদের হয়েছিল আর কি! এরাই চায়ে জল, খাবার জল, হাত মুখ ধোবার জল (বরফের চাপ গালিয়ে) গরম করা, বিছানা পাতা, যা কিছু কায কর্ম্ম সবই করে দিচ্চে। খাবার পাণ্ডাজীই তৈরি করে আনালেন। গরম লুচি ও ক্ষীরের পেড়া, তা ভিন্ন আর কি-ইবা হবে? পরিজন সহ তাঁদের যে রকম অক্লান্ত যত্ন ও চেষ্টা তাতে জানালে হয়ত তাঁরাই আমাদের জন্যে আরও কিছু ক'রে দিতে পারতেন, কিন্তু তা' না ক'রে আমাদের তৃতীয় পাণ্ডব (সেইটীই আমাদের দলের সবাইকার ছোট ও উৎসাহীও বেশি) ষ্টোভ জেলে আলুর দম চড়িয়ে দিলে।

আমি ইতিমধ্যে কোনমতে মাথা তুলে মাথার কাছেই রক্ষিত হোমিওপ্যাথিক বাক্স খুলে এক ডোজ ইগ্‌নেশিয়া খেয়ে ফেল্লেম। "নেজা" অথবা "ষ্ট্রোপেনথস"ই খাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বেঠিক মাথায় খুঁজে পেলুম না। কালিফসের জন্যে অন্য একটা বাক্স খুলতে হয়। অগত্যা যা পেলুম, যদি কিছু হয় মনে করে খেয়ে ফেলা গেল।

প্রধান পাণ্ডব মানুষটি আমাদের দলের মধ্যে সব চেয়ে কর্ম্মঠ, এটা আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি। আজও তিনি সকলকে খাওয়ানর ভার নিয়ে সব্বাইকেই ছুটী দিলেন, অথচ বয়স তাঁরই সবার চেয়ে বেশি। খাওয়ার শক্তি কারুই বেশি ছিল না, অথচ দেখা গেল অতি কষ্টে সামান্য কিছু খাবার পর অনেকেই বাক্‌শক্তি ফিরে পেলে। এইবার ক্রমশঃ ক্রমশঃ সকলকারই শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হচ্ছিল। মাথাধরা, মাথাঘোরা, গা বমি প্রভৃতি এর আরও কতকগুলি লক্ষণ আছে। এতক্ষণে বোঝা গেল, আমাদেরও এ হার্টের ট্রবল নয়, হাল্কা হওয়ার উৎপাত মাত্র! সব্বারই অল্প

বিস্তর এ রকম হয়। হার্ট দুর্ব্বল যাদের, তাদের কিছু বেশি এবং শীঘ্র আরম্ভ হয়। তখন ভয়টা অনেকটা কমে গেল। পঙ্কু বল্লে "এ সব তো জানা ছিল না, তা'হলে একটা অক্সিজেন-সিলিণ্ডার সঙ্গে আনলে এত কাণ্ড হতো না। এইটুকুতেই যে এমন হবে, তাতো ভাবিনি। আমি জানি এভারেষ্টে উঠতে গেলেই অক্সিজেন-সিলিণ্ডার বেঁধে যেতে হয়!"

এর প্রতিষেধক নাকি আমচুর, তেঁতুল প্রভৃতি! সে সব তো তেমন বেশি সঙ্গেও ছিল না, অর্থাৎ প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল, এবং এটা পরে শোনা গেল।

রাত্রে আগুন ও লেপ কম্বলে ঘর বেশ গরম হয়ে উঠেছিল।

সূর্য্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে ঘুম ভেঙ্গে উঠে কি অপরূপ রূপই দেখা গেল! আঃ! তীব্র দীপ্ত সূর্য্যালোকের কনককিরণে অনুরঞ্জিত ও ঝলসিত হ'তে হ'তে দূরদিগন্তপ্রসারী চিরতুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গগুলি অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তি ধারণ করেছে। তাদের কখনও রজতগিরি কখন সুমেরুর স্বর্ণশৃঙ্গ বলে বিভ্রম ঘ'টে যাচ্চে। গত কল্যকার সেই আমাদের ভীতিপ্রদ সুবিস্তৃত বরফের ময়দান, আজ প্রাতঃসূর্য্যের কিরণচ্ছটায় দেবভূমির মতই অপূর্ব্ব প্রতীয়মান হচ্ছিল। যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূরই বরফাবৃত ঘন তরঙ্গায়িত গিরিমালা। কেদার খণ্ডের মধ্যে গৃহ প্রাচীর ছাদ অঙ্গন সমস্তই বরফমণ্ডিত। শ্বেত ভিন্ন এখানকার অপর বর্ণ নেই! রবিরশ্মি এদের অঙ্গে অঙ্গে হীরকদ্যুতি বিকীর্ণ ক'রে জলছিল। কেদার মন্দিরের পিছন দিকে হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত গিরিমালা এবং ঈশানকোণে ২৪০০০ ফিটের বিশাল গিরিশৃঙ্গ। স্থানীয় লোকেরা একেই কৈলাস বলে। কেউ কেউ বলে এইখান দিয়ে পাণ্ডবেরা স্বর্গারোহণ করেছিলেন, তাই এর নাম

স্বর্গারোহণ-পর্ব্বত। তা' এ পথে যাত্রা করলে সশরীরে কি জানি না মোদ্দা স্বর্গ নরক কোথাও একটা অতি অল্প কালের মধ্যেই পৌঁছতে হয় তাতে আর সন্দেহ নেই! পূর্ব্বে নাকি অনেক লোকে কেদার-মন্দিরের গায়ে নাম ধাম লিখে রেখে এই পথে স্বর্গযাত্রা করতো। এরই একদিকে ৮ মাইল দূরে মহাপথ, ভৃগুপন্থ ও ভৈরবঝম্প। তাই থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে অক্ষয়স্বর্গ লাভ হয় ব'লে কেউ কেউ নাকি ঐ কায করতো। এখন সরকার থেকে আইন ক'রে সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। এর পিছনে নাকি বাসুকী কুণ্ড ব'লে এক কুণ্ড আছে, তাই থেকে বাসুকী গঙ্গার উৎপত্তি। মন্দাকিনী, বাসুকী-গঙ্গা, ব্রহ্মকুণ্ড, রেতঃকুণ্ড, হংসকুণ্ড, উদককুণ্ড, সবাই নিজ নিজ নাম রূপ বিসর্জ্জন দিয়ে 'একৈক রস' হয়ে গিয়েছেন ব'লে, আমাদের আর স্থানে স্থানে দর্শন স্পর্শন স্নান দানাদি না ক'রে একই স্থানে সম্পাদন করা হলো। স্নান আর হলো না, এক চাপ বরফ গলিয়ে তারই জলে মাথা ধোয়া গেল। তর্পণ শ্রাদ্ধ পিণ্ডদানাদি যথারীতি সেরে নিয়ে বেলা ন'টার সময় মন্দিরের দ্বার খোলা হ'লে সকলে দেবদর্শনে যাত্রা করলুম। আজ শ্বাসকষ্টও সামান্য কম, অন্য সব কষ্ট অনেকই কমে গ্যাছে। কাল যা স্বপ্নানুভূতি বোধ হচ্ছিল, আজ তা জাগ্রতাবস্থার পরিচয় প্রদান করলে।

কেদারমূর্ত্তি আজ আবরণমুক্ত। এই বিশাল পর্ব্বত-রাজ্যের উপযুক্ত বিরাট মূর্ত্তি! সাধারণ শিবলিঙ্গের মত নয়, ত্রিকোণাকার শিলা। মন্দিরটী অন্ধকারময়, দীপালোকে কথঞ্চিৎ আলোকিত মাত্র। আশে পাশে অন্ধকার যেন বেতালদের মতই হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। পাণ্ডাজী এবং তাঁর আত্মীয় স্বজনে ঘিরে থেকে আমাদের সকলকেই পূজা

আর সমস্তই অতিশয় সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়ে দিলেন। কর্পূর আরতির সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত কণ্ঠের স্তোত্র-গান বড়ই সুমধুর শুনতে লাগলো। সমস্ত অবসাদ কেটে গিয়ে ক্ষণকালের জন্য শরীর মন এক অনির্ব্বচনীয় ভক্তি তন্ময়তায় ভরে উঠলো। কেদারের ঘৃতলিপ্ত হিমশিলা-শীতলদেহে ঘৃত-মর্দ্দন ক'রে বক্ষতলে আলিঙ্গন করবার নিয়ম আছে। কি চমৎকার এই নিয়ম! পাপী তাপী স্পৃশ্য অস্পৃশ্য অভাগা ভক্তদের প্রতি দয়াময়ের কি অপার করুণা! "এত কষ্ট সহ্য ক'রে তোমরা আমার কাছে এসেছ, দুর্ব্বল বক্ষ তোমাদের এ ক্লেশ সইতে পারচে না, এস আমার বুকে এস, আমার বলে নিজেদের বুক ভ'রে নাও।" এই বলেই যেন স্নেহময় পিতা তাঁর সকল সন্তানকেই নির্ব্বিচারে বুকে টেনে নিচ্চেন। একেই তো বলে দেবতা! "এমন দেবতা আর কে আছে কোথায়?"

আমাদের গায়ে গরম কাপড়ের গাদা, কাযেই বক্ষে আলিঙ্গন সম্ভব হলো না, জ্বরতপ্তবৎ কপালটা ভাল করে ঠেকিয়ে নিলেম। বাস্তবিকই মনে হলো সমস্ত শরীরের অর্দ্ধেক অবসাদ যেন কেটে গেল! দেব-মাহাত্ম্য এখানে যেমন প্রত্যক্ষ করেছি, জীবনে এমন করিনি। দেব দর্শনে, স্পর্শনে শক্তি বৃদ্ধি হয় কেমন করে না মানবো? হতে পারে এটা মনের বিশ্বাসেরই বল। হলোই বা,—তাই বা কোথা থেকে পাওয়া যায়? এ বিশ্বাসই বা আসে কোথা থেকে? বিশ্বাসের ফলে যদি আমি অর্দ্ধমৃত দেহে জীবনীশক্তি ফিরিয়ে পাই, তবে অবিশ্বাসে ম'রে গিয়ে লাভ কি?

কেদারনাথ নামের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ এই যে, যে ভূমি জলপূর্ণ অর্থাৎ দল্‌দলে তাকেই কেদার বলে। ঐ ভূমির প্রভু ব'লে তাঁর নাম কেদারনাথ। পুরাণে আছে সত্যযুগে উপমন্যু এবং দ্বাপরে পাণ্ডবগণ

গুরুহত্যাদি পাপক্ষালন জন্য এইখানে এসে ব্যাস-নির্দ্দিষ্ট মহাদে উদ্দেশ্যে তপস্যা করেছিলেন। এই কেদারনাথের মূর্ত্তি পাণ্ডবগণে প্রতিষ্ঠিত ব'লে কথিত আছে। অনেকে এই মন্দির মধ্যম পাণ্ডবের তৈ বল্লেও, ভগবান শঙ্করাচার্য্যের নির্ম্মিত বলেই গুজবটা বেশি প্রবল কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বেও কেদারনাথের অস্তিত্বের সংবাদ জানা যায় হয়ত তিনি জীর্ণ-সংস্কারক। কথিত আছে আদি শঙ্করাচার্য্য এইখানে দেহত্যাগ করেছিলেন। এখানের পূজারীরা দক্ষিণ দেশীয় লিঙ্গায়েৎ শৈ সাম্প্রদায়িক। এই প্রথাটী যে শঙ্করাচার্য্যেরই প্রবর্ত্তিত তাতে সংশ নেই। আধুনিক ইংরেজ জাতির মত তাঁরও পলিসী ছিল যে, তাঁ বিজয়-লব্ধ প্রত্যেক বিভাগেই তিনি তাঁর নিজ দেশজ ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এ দৃষ্টান্ত সমস্ত উত্তরাখণ্ডে, নেপালে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমস্ত ধর্ম্মায়তনেই এখনও পর্য্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে।

এখানে প্রধান পূজারীকে রাওল বলা হয়। এই রাওলের কতগুলি চেলার মধ্য হতেই কেদারনাথ, গুপ্তকাশী, উখিমঠ মধ্য-মহেশ্বর প্রভৃতির মন্দিরে পূজারী নির্ব্বাচিত হয়। এঁদের মধ্যে যিনি প্রধান ব'লে নির্ব্বাচিত হন, তিনিই ভবিষ্যৎ রাওল। পূর্ব্বতন গাঢ়োয়াল ও কুমায়ুনের রাজাদের প্রদত্ত বিস্তর দেবোত্তর সম্পত্তি কেদার ও বদরীনাথের নামে আছে। তাতে ভোগ পূজাদি ও সদাব্রত প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ হয় এবং এরূপ স্থলে সর্ব্বত্রই যেমন হয়ে থাকে—অর্থাৎ রাওল নামধারী মোহান্ত মহারাজেদের উচ্ছৃঙ্খল বিলাসিতাও পূর্ণোদ্যমে চলে।

এই উত্তরাখণ্ডের প্রধান তীর্থদ্বয় বদরীনাথ এবং কেদারনাথের মন্দির-নিয়ম সমস্ত এক ধরণেরই। পূর্ব্বে এই উভয় তীর্থের মোহান্ত-

দ্বয়কেই চিরকুমার সন্ন্যাসী হ'তে হতো; কিন্তু গাঢ়োয়াল রাজের পরাজয়-কাল থেকেই এঁরা ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ ক'রে অসবর্ণা নারী গ্রহণ পর্য্যন্ত সমুদয় ভ্রষ্টাচারই করতে আরম্ভ করেন। যদি এই মন্দিরদ্বয় আবার গাঢ়োয়াল রাজের অধিকারে ফিরে আস্‌তো, তাহলে আবার হিন্দু-রাজার শাসনে এখানের মোহান্তদের অনাচার ত্যাগ ক'রে পুনশ্চ ত্যাগী সন্ন্যাসী পূজারীর প্রথাই প্রবর্ত্তিত হতো। কিন্তু হিন্দুর দুর্ভাগ্যক্রমে তা ঘটে নি। তাই মোহান্ত সর্ব্বত্রই যেমন এখানেও সেই মূর্ত্তিই ধরেছেন,—হিন্দুর পরম পূজ্য দেবস্থান তার চরম দুর্দ্দশায় পৌঁছে গেছে। বর্ত্তমান মোহান্তের পূর্ব্ব মোহান্তকে নিয়ে এ সম্বন্ধে মামলা মোকদ্দমা পর্য্যন্ত হতে বাকী ছিল না। তিনি বিয়ে পর্য্যন্ত করেছিলেন। এখন আবার পূর্ব্বের মত চিরকুমার ব্রহ্মচারী রাওল হবার নিয়ম গবর্ণমেণ্ট থেকেই হয়েছে। এর পর সে সব কথা লিখবো।

কেদারনাথের পাণ্ডারা বামসু, মৈখণ্ডী, গুপ্তকাশী, কালীমঠ প্রভৃতি গ্রাম-নিবাসী। এঁরা নানা শ্রেণী ও নানা গোত্রে বিভক্ত। হরিদ্বার থেকে আরম্ভ ক'রে কেদারদর্শন করালেই এঁদের কায শেষ হয়ে গেল, এর পর থেকে বদরীর পাণ্ডার অধিকার এলো।

আমাদের পাণ্ডাজী এবং তাঁর চার জন লোক আমাদের সঙ্গেই রইলেন। আমরা বেলা এগারটার মধ্যেই সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেম। বেলা বাড়লেই ঝড় ও তুষারপাত আরম্ভ হয়ে যাবে। এখানে রোজই তাই হয়। ফেরবার সময় পথের কষ্ট প্রায় অর্দ্ধেক,—না তিন ভাগ কম বোধ হল। ঝড় বৃষ্টি না থাকায় শীতের প্রকোপ অনেক কমে গ্যাছে। এ দিকে ফিরতি মুখে খানিকটা এগিয়ে যেতেই শ্বাসকষ্ট আপনা হতে মন্দীভূত হয়ে

আসতে লাগলো। দিনটি ...রৌদ্রোজ্জ্বল। পথ আর তেমন পিছি নেই। শেষবার এই অপ্রত্যাশিত ভাস্বর-জ্যোতির্মণ্ডিত অমরাপুর পানে চেয়ে যুক্তকরে বল্লেম, "এ কি তোমার অযাচিত দয়া, ঠাকুর চাইলে লোকে পেয়েচে জানি ... তুমি তো জান আমি তোম চাইনি—ভীষণ ভয় পেয়েছি। না ... ও এমন ক'রে টেনে এনে আপ হতে দেখা দিলে? তুমি বিশ্বের অতীত ... নও, বিশ্বেও যে বিদ্যমা তাই কি অর্দ্ধ অবিশ্বাসী ক্ষুদ্রাশয় মানুষকে আজ বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলে তুমি ত জানতে পেরেছিলে আমি তোমায় দেখার চেয়ে হিমালয় দেখা সখেই বেরিয়েছিলেম!

ফিরতি পথে দুটী পাণ্ডাবালক আমাদের প্রশ্ন করলে, "আপনার J. C. Boseএর কেউ হন? তাঁরা যখন স্বামী স্ত্রীতে এসেছিলেন আমরাই তাঁর পাণ্ডা হয়েছিলাম।"

তাঁরা এসেছিলেন, একটা গুজব শুনেছিলাম বটে, সেটা নিশ্চিত হলো। এই জন্যই তো তাঁকে শ্রদ্ধা করি! আমাদের দেশের অনেকেই আল্পস্ দেখতে যান, নরওয়ে ছোটেন, নিজের দেশের এত বড় হিমৈশ্বর্য্য দেখতে আসেন ক'জন? এ সব পথে অধিকাংশই বৈদেশিক টুরিষ্টরা এসে থাকেন, তার সংবাদ প্রত্যেক ... মাইলের ডাক বাংলোয় পাওয়া যায়।

গত পৌষ মাসে আচার্য্য বসু মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হতে তিনি আমায় বলেছিলেন, "তুমি নাকি ভারি সেকেলে মত প্রচার করচো?"

আমি তাঁকে উত্তর দিয়েছিলুম, "আপনিও তো তাই করচেন! এই যে সর্ব্বভূতে-চৈতন্যশক্তির আবিষ্কার, এ আপনার কোন্ কেলে মত?

এই বিজ্ঞান মন্দিরের শিল্পকলা এ কোন যুগের ? ঐ দীপহস্তা-নারীমূর্তিটী, ওকে কোন অতীত যুগের গুহা থেকে টেনে এনেছেন ?"

তিনি শেষটায় স্বীকার করেন, তিনিও পুরোপুরি আধুনিক নন, আমার মত একটু সেকেলে ভাব তাঁতেও আছে। আবার এখানটাতেও যে মিল ছিল, তা তখন কিন্তু জানতুম না !

পথের যে অত ভয় ও কষ্ট, ফেরবার পথে সে সব কে যেন দু'হাত দিয়ে টেনে ফেলে দিলে। চিত্ত প্রসন্ন হৃদয় আত্মানন্দে পরিপূর্ণ, সে যেন সেই বিপুল আনন্দকে তার সেই দুঃখ-দুর্গম পথের চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে বলতে লাগলো, "আমি পেয়েছি ! দুর্ব্বল হই, সাধনহীন হই,—তবু পেয়েছি, তবু পেয়েছি ! তাঁর করুণার পরিচয় পেয়েছি !"

রামবাড়ায় থেমে ষ্টোভ জেলে মোহনভোগ ও চা ক'রে খেয়ে, আবার পুনর্যাত্রায় গৌরী কুণ্ডে পৌছান গেল। সেই পূর্ব্বের দ্বিতল ঘরে শুয়ে এখন আমাদের নিশ্চিন্ত বিশ্রাম চলছে। কেদারের "বিকট-পন্থ" এইখানেই শেষ হলো !

কেদারের অপার্থিব স্বপ্নপুরী এইবারে জন্মের মত অদৃশ্য ! শুধু এই আশ্চর্য্য দর্শনের অম্লান স্মৃতিই সমস্ত জীবনকে পূর্ণ ক'রে ধন্য করে দিয়ে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকলো। অমন ‌ দেখবো, অমন স্থানে যে পৌছতে পারবো, পৌছে যে আবার অব্যাহতভাবে ফিরে আসতে পারবো, এমন আশা কিন্তু করাই যায় নি। এখন সবাইকে নিয়ে ফিরতে পেরে এই মনে হচ্চে—ভাগ্যিস্ এ বছর এত বরফ পড়েছিল, —ভাগ্যে আমরা সকাল সকাল এসেছিলেম, তা' না দেখলে আর দেখতুম কি ?

উত্তরাখণ্ডের পত্র

শ্রীমতী কল্পনাদেবী—কল্যাণবরাসু

১৩ই মে শুক্রবার মধ্যাহ্নে রামপুর ও রাত্রে ফাটাচটিতে যাপন ক'রে ১৪ই মে শনিবার ৩১শে বৈশাখ আমরা বুদ্ধ চটিতে প্রাতরাশ সেরে মধ্যাহ্নে নালায় পৌঁছেচি। ফাটা চটিতে কেদার যাবার পথে দোকানদার চৌধুরীর কাছে কয়েকখানি ফটোগ্রাফ ও ম্যাপ জমা রেখে গেছলুম, তাই নিতেই আরও এখানে ওঠা হলো, তবে এবার পুরাণো বাড়ীখানিতে না থেকে জলের কলের কাছেই অন্য একটী বাড়ী পেয়েছিলুম।

কেদার পথের সেই ক' মাইল পার হবার পর থেকেই মনে হলো নিয়ত অশ্রু-ঝরা দীর্ঘশ্বাসকাতরা শুক্লবসনা বিধবা প্রকৃতির পরিবর্ত্তে যেন কেদার মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী জননী কমলার স্বর্ণাঞ্চলখানি উড়ে এসে আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে! পাহাড়গুলির অধিকাংশের আকারই প্রায় ঢিলে-ঢালা ভাবের। এই সব পাহাড়েরর মাথার চূড়া থেকে পাদমূল পর্য্যন্ত ধাপে ধাপে শস্যক্ষেত্র। তার কোথাও হলদে রঙের পাকা গম, কোথাও হলদে সবুজে মেশান আধপাকা যব, এবং পূর্ণ হরিদ্বর্ণ ধান্যাঙ্কুর সুপ্রচুর রূপেই জন্ম নিয়েছে। সুদূর উচ্চপর্ব্বতের সানুদেশে, পর্ব্বত-মধ্যভাগে এবং একেবারে অতি নিম্নভূমেও ছোট বড় মাঝারি গ্রাম্য কুটীরগুলি যেন ছবির মতই আঁকা হয়ে রয়েছে। কোথাও সেই সিঁ‍ি বাঁধান ফসল ক্ষেতে কাস্তে হাতে রূপসী কৃষাণীরা ফসল কাটচে। কোথাও ছোটবড় বে-হিসেবী মাপের দুটী বলদ জুড়ে কৃষাণ ঐ রকম একটা ক্ষেতে হল দিচ্চে। কোথাও কম্বলের শাড়ী জ্যাকেট পরা অপরূপ-রূপসী পার্ব্বতীরা হাসি খুসী গল্প করছে। কোন কিন্নরী-সদৃশা যুবতী গরুর জন্যে প্রকাণ্ড পাতার ঝোড়া পিঠে বেঁধে মনের স্ফূর্ত্তিতে গান গাইতে গাইতে চড়ে বড় বড় চড়াই

অবলীলাক্রমেই যাচ্চে। কোনও সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরের ঘরণী পুত্রকন্যা পরিবৃতা হয়ে বসে নিজের ঘরের আঙ্গিনাতে স্তূপাকারে রক্ষিত ফসল নিয়ে ঝাড়াঝুড়ি করছেন। ছেলেমেয়েরা তুষগুলো নিয়ে ছড়াছড়ি হুড়োহুড়ি করতে লেগেছে। তাদের রাঙা গালে গোলাপী ঠোঁটে উজ্জ্বল কালো চোখে আর স্বাস্থ্য প্রাচুর্য্য ভরা সারা অঙ্গে আহ্লাদ যেন উপ্‌চে পড়্‌ছে। তাদের কাণ্ড দেখে মাও স্মিত-প্রসন্ন মুখে মৃদু মৃদু হাসছেন। আশেপাশে পথের ধারে ধারে রাশিকৃত ফুলে ভরা অসংখ্য ফুলের গাছ, কচিপাতায় ভরা দারচিনি, তেজপাতার এবং বড় বড় আখরোট গাছের জঙ্গল। চড়াই পাখীর কিচির মিচির, ঘুঘুর ডাক, আর এদের চারিদিক বেষ্টন করে ধূসরে শ্যামলে শুভ্রতায় মিলিয়ে নিয়ে সে এক বিরাট প্রাচীরের আবেষ্টন!

মৈখণ্ডা গ্রামের পল্লীগুলির স্নিগ্ধশ্রীটুকু অনবরত বরফ দেখে দেখে আজ যেন সে দিনের চাইতে বেশি করেই চোখ জুড়ানো মনে হলো। ভগবান যে মানুষের জন্যে তুষারের পরিবর্ত্তে ধানকে খাদ্য করে দিয়েছেন এর জন্যে তাঁর নির্ব্বাচন শক্তিকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হলো। অনবরত সবুজের স্নিগ্ধরূপ খাসা সহ্য হয়, কিন্তু তুষারের দীপ্তকান্তি বেশিদিন মানুষের চোকে সয়না বোধ হয়। আর তা ছাড়া তাঁদের দূর থেকে প্রণাম করাই ভাল।

কেদার পথের সকল নরনারীর পরিধেয় বাকল বসন নয় বটে, তবে কম্বল বসন। মেয়েদের গায়ে কম্বলের হাতা-বড় জ্যাকেট, তার উপর একখানা কম্বলের শাড়ী পরা, কাঁকালে একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। পুরুষদের কারও কম্বলের পাজামা ও ঝুলদার কম্বলের পিরাণ, কারও একখানা ছেঁড়া ধুতীর (হয়ত কারু কাছে পাওয়া) সঙ্গে কম্বলের আংরাখা। গাড়োয়ালের অধিবাসীদের মধ্যে একটা জিনিষ আমি

ক'দিন থেকেই লক্ষ্য করচি, কিন্তু এর অর্থ খুঁজে পাইনি। এদেশে পল্লীনারীর চেহারার মধ্যে যতটুকু পাহাড়ী ভাব দেখেছি, পুরুষের মধ্যে ততটা নয়। টিহিরী রিয়াসতের লোক আমাদের কুলীরা সাধারণ পশ্চিম বেহারী নয়, উচ্চ শ্রেণীর উত্তর পশ্চিমাদের মতই, কদাচিৎ দু'একটাতে পাহাড়ী মিশ্রণ বুঝা যায়। এখানের নিকট গ্রামের অথবা চটিদার প্রভৃতি যে সব পুরুষ, এদেরও মধ্যে পাহাড়ী চেহারাটা খুবই কম আসলে এরা সবাই উত্তর পশ্চিমেরই অধিবাসী। গাড়োয়াল শব্দটা গড়ওয়ালা শব্দেরই রূপান্তর। হাজার হাজার ফিট উঁচু পাহাড়ের উপরেই এ অঞ্চলের যত সব সমৃদ্ধ গ্রাম বা সহর। এই সমস্ত এক সময় এক একটী স্বাধীন রাজ্য ছিল। প্রথম মুসলমান আক্রমণের সময়েই অনেক স্বাধীনচেতা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয় রাজা বা রাজবংশীয়গণ সমতল ভূমি ছেড়ে এসে এই সব দুর্ল্লঙ্ঘ্য গিরিশিখরে অজেয় দুর্গ নির্ম্মাণ করে বাস করেছিলেন। এখন তাঁদেরই বংশধরেরা মোট বইছে, দাণ্ডি বইছে, আবার অনেকে পলটনেও কায করে থাকে—আমাদেরই দুটো কুলি আগে সিপাই ছিল। এদেশে পুরুষটা খুবই কম দেখা যায়, তারা সব ছড়িয়ে গেছে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। ক্ষেত, খামার, পশুপালন, গৃহস্থালীর ভার এ সমস্তই মেয়েদের উপর, আর এরা তা খুব স্বচ্ছন্দ ভাবেই পালন করে যাচ্চে। পিঠে বোঝা বাঁধা, কাঁখে কচি ছেলে হাসিমুখে দুর্দ্দান্ত পাহাড়ী পথের পাকদণ্ডির পথ চলেছে! এ দৃশ্য দেখলে স্বাধীনতা-প্রয়াসী-অকর্ম্মণ্য-শরীর বিলাস-আলস্যপুষ্ট বাক-সর্ব্বস্ব সমতলবাসিনী নিজেদের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে যায়! স্বাধীনতা পাবার যোগ্যতা যাদের থাকে, তারাই পায় এবং পেয়েওছে। নারী-পুরুষে সমান অধিকার এর চেয়ে আর কি পাবে?

এদেশী মেয়েদের দেখতে ভালই লাগে। আঁট সাট প্রমাণসই গড়ন, রং রোদ পোড়া হলেও, ফর্সা যে খুবই ছিল তা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়। কম বয়সীরা বেশির ভাগ ফর্সাই আছে। মুখ সৌষ্ঠবও প্রায় ভাল। তাদের পরণে কম্বলের শাড়ী, কারু কারু রূপার শিকলী ও লম্বা একটা পাত দেওয়া এক রকমের সেফটীপিন দিয়ে ঐ শাড়ী জ্যাকেটের সঙ্গে পিনদ্ধ।—এ প্রথাটী এদেরই নিজস্ব। শাড়ী ও জ্যাকেটে ছুটী ফুটাকরা, সে ছুটী আবার বোতামের ঘরের মতই চেন করে মজবুত করে নেওয়া, তাইতে গলিয়ে মুখটা খিলের মত এঁটে দেয়। গলায় কতকগুলা করে পলার মালা, নাকে কারু চওড়া কায করা সোনার নথ, নোলকের জায়গায় বেশর, কারু শুধু নথ, বা শুধুই বেশর। তা' এদের এই পোষাকে দেখায় কিন্তু মন্দ না। আসল কথা, রূপ এবং স্বাস্থ্য প্রচুররূপে আছে কি না, যেটার আমাদের মধ্যে অত্যন্ত অভাব ঘটে আসছে। যাত্রী দেখলেই গ্রাম-বহুল পথে যত রাজ্যের ছোট ছেলে মেয়ে এসে নেচে গেয়ে দেহি দেহি করে অন্ততঃ একটা আধলাও আদায় করে নেবে। ছুঁচ সূতাটা ছোট বড় মেয়ে পুরুষ সকলেই চায়। পূর্ব্বে হয়ত আধুনিকতার আবহাওয়া হ'তে বহুদূরে অবস্থিত হিম-পর্ব্বতের অধিবাসীদের নিকট এই অত্যাবশ্যক বস্তুগুলি খুবই দুষ্প্রাপ্য ছিল, সেই জন্য এসব সংগ্রহের এই উপায়ই এদের অবলম্বনীয় হয়েছিল। কিন্তু এখন আর অবশ্য ততটা নেই। বড় বড় চটির দোকানে ছুঁচ সূতা দিয়াশলাই দড়ির জুতা কম্বল ছাতা ছিটের শাড়ী গরম কাপড় বাঁশি সস্তা সেলুলয়েডের পুতুলটা আসটা টাঙ্গান থাকে, এমন কি কাঁচিমার্কা সিগারেটও বাদ পড়েনা। তা থাক, তবু

গরীব গ্রামিকদের কাছে পয়সা তো আর সুলভ নয়। মেয়েরা ছুঁচ সুতার সঙ্গে আর একটা জিনিষও চেয়ে নেয়, সেটা টিকুলি। এরা "বিন্দি" বলে। আমরা ছুঁচসূতা অনেক এনেছিলুম, ওটা জানতুম না, আনিনি। অন্যে দিয়েছে দেখলুম। মেয়েরা ঐতে খুব খুসী। সুন্দর মুখে দেখায়ও বেশ।

মহিষমর্দ্দিনীর ওখানে চণ্ডীপাঠের সঙ্কল্প দিয়ে গেছলুম, মা চণ্ডীই জানেন তা' হয়েছিল কি না! যাই হোক "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ,"—এই হিসাবে তর্ক তুল্লুমই না। দক্ষিণা ও ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য কিঞ্চিৎ দিয়ে দিলুম। আরও কেউ কেউ ঐরূপ করলেন।

এখানে অনেকগুলি নূতন নূতন বাঙ্গালী যাত্রীর দলের সঙ্গে দেখা হল। এঁরা কেদার পথের যাত্রী। আমাদের পরিচিত সেই হৃষীকেশের দলকে (সে দলে তোমাদের হাজারীবাগের যদুবাবুর কন্যা ও পুত্রবধূও আছেন) আমরা কেদার থেকে ফেরার দিন রামবাড়ার পথে দেখে এসেছি। তাঁদের একজনের মেয়ের ডাণ্ডি একদিন খুঁজে পাওয়া যায় নি, ত্রিযুগী নারায়ণের পথে গোলমাল হয়ে গেছলো। অবশ্য খুঁজে পাওয়া গেছে এবং বিপদও কিছু ঘটে নি, পথভুল মাত্র। তবু এসব পথে খুব সাবধান হয়ে একত্র থাকাই উচিত। শরীরের অবস্থা এখনও সবারই প্রায় শোচনীয়, তাই ত্রিযুগী আর যাওয়া হল না।

নালা চটিতে মধ্যাহ্ন যাপন করা হলো। এখানে এক প্রকাণ্ড মন্দিরের ধ্বংস বিজড়িত অবশিষ্ট টুকুকে নল রাজার তপস্যাক্ষেত্র বলা হয়ে থাকে। পৌরাণিক নল যে কবে এখানে তপস্যা করতে এসেছিলেন জানতে পারি নি, হয়ত বানপ্রস্থে। কিন্তু সত্যই কি নল নামধেয় অন্য কোন রাজার

প্রতিষ্ঠিত এ মন্দির? না এম্‌নি যা হোক একটা বলে দেয়? কে জানে! ভারতের ইতিহাস কত স্থানেই এমন অন্ধকার কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন এ গভীর যবনিকা তুলে অতীত দেখবার উপায় কই? প্রধান মন্দিরে নল দময়ন্তী আছেন, মূর্ত্তি স্থবিধার মত নয়! নারায়ণ আছেন, হোমের একটী কুণ্ড আছে, আর ঐ মন্দিরের চারিদিকে বেড়ে ছোট ছোট ভাঙ্গা মন্দিরগুলি শূন্যগর্ভ ভগ্নশীর্ষ প'ড়ে আছে—প'ড়ে প'ড়ে কালই যে এ সংসারে সর্ব্বজয়ী তারই সাক্ষ্য দিচ্চে। সংস্কার করতে পারলে এখনও একটা মস্ত ব্যাপার রক্ষা পায়। কিন্তু করবে কে? কেদারনাথের রাওলরা তাঁদের বিলাসিতার ব্যয় নির্ব্বাহ করবেন, না এই সব ভাঙ্গা পাথর জোড়া দেবেন? গভর্ণমেণ্ট,—তাঁদের টাকার কত দরকার, পুলিস—মিলিটারী সিবিলিয়ানদের মোটা মাইনে, বড় বড় বিল্‌ডিংস্, আরও আরও কত কি! দেশের ধনীদের বিলাতে তীর্থভ্রমণ, পঞ্চাশখানা মোটর, স্ত্রীদের বারমেসে বেনারসী, কাশ্মীরী, বোম্বে, জড়োয়ার গাদা—কাযেই অতীতের কীর্ত্তিরাশি তার ধূলি-জঞ্জালের তলায় তলিয়ে না গিয়ে আর থাকবে কোথায়?

এই চটির গায়ের পাহাড়ের উপর ভুর্গমপথে গিয়ে নলেশ্বর শিব আছেন। নলের নাম থেকেই এর নাম নালা চটি। এ সেই পৌরাণিক অথবা কোন ঐতিহাসিক নল রাজা, এর কেউ কিছুই বলতে পারলে না। জানবার ইচ্ছাও বড় বেশি নেই কারুই। পৌরাণিকের দাবীই যে এদেশে সর্ব্বব্যাপী হ'য়ে আছে; তাকে হঠাবে কে? অলস অন্ধ ঘুমন্তজাত এই উপায়ে আত্ম-প্রবঞ্চনা করেই না কোন মতে বেঁচে আছে! ভগবানও বলছেন; 'আহা থাক্!'—

পাণ্ডাজী এখান থেকে এক মাইল গিয়ে গুপ্তকাশী থেকে আমাদের ডাক এনে দিলেন। টেলিগ্রামটা পেয়ে জানলেম, পুরাণো চাকররা এসেছে, তোমরা এসেছ। মনটা একটু ব্যস্ত হলেও অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেম।

পথ বদল হলো, গুপ্তকাশীর ঠিক ওপারের পাহাড়ে আসার সময় সেই যে উখি মঠ দেখে এসেছিলাম, সেই রাস্তা ধরা হলো। এ পথও খুব ভাল। খুব উঁচু চড়াই কতখানি সহজসাধ্যভাবে নিয়ে যাওয়া যায় তারই যেন একটা প্রকৃষ্ট কৌশল দেখান হয়েছে। আবার উৎরাইএর বেলাতেও আকাশ থেকে পাতালে নামিয়েছে তেমনই স্থকৌশলে। পাহাড়ের মাথা ডিঙ্গিয়ে এলুম। উপরে থাকতে বোধ হচ্ছিল যেন গভীর গর্ত্তের মধ্যে কতকগুলা (ইংরাজী অক্ষরে Z) লেখা রয়েছে। দৃশ্যও বেশ ভাল। খাড়া পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে শস্য বোনা হচ্চে, মনে হল আর একটু উঁচু করতে পারলেই স্বর্গে পৌছানো চলবে! কেদার পথে বেশির ভাগই নানা সেডের গোলাপী রং ছিল, এদিকে কিন্তু লাল রঙের বরাশ ফুলের রাশি। পলাশ ফুলের মত গাছে আর একরকম টকটকে লাল কেনিয়া গোছের গড়নের ফুলের এই দিকটায় খুব প্রাচুর্য্য দেখলেম। বিশ্ব-জননীর পূজার জন্যই যেন বিশ্ব-প্রকৃতি তাঁর পূজার থালি থালি ভর্ত্তি ক'রে নিজেও ফুলের রাণীটী সেজে চুপ্‌চাপ্‌ বসে আছেন! রাঙা জবার মত বরাশ ফুল গুলাকে দেখে আমাদের দলের "কর্ণব" গাওয়া সেই গানটা মনে পড়ে গেল,—

"তুলে নে' রাঙ্গা জবা,
আমার মায়ের পায়ে সাজবে ভাল।"



১। [illegible] ও তিব্বত [illegible]
[illegible]

উত্তরাখণ্ডের পত্র

উখিমঠ কেদারের মোহান্ত মহারাজ—অর্থাৎ রাওল সাহেবের বাসস্থান। স্থানটী বেশ জমকালো,—এ অঞ্চলের মধ্যে যথেষ্ট বড় সহর বলতে হবে।

সহরের প্রবেশ পথেই গান বাজনার শব্দ পেলাম। দোকানে আবশ্যক দ্রব্যগুলির সবই আছে। প্রকাণ্ড একটা তোরণদ্বার দেখা গেল, তার উঁচু গম্বুজের দু'ধারে দু'টো প্রমাণ আকারের বাঘ সিংহ দাঁড়িয়ে আছে, বোধ হলো টিনের উপর রং দিয়ে তৈরি করা। মস্তবড় সাইনবোর্ডে রংদার বড় বড় হরপে লেখা আছে, "সিংহাসন শ্রীশ্রীকেদার"। —তলায় একটা সংস্কৃত শ্লোক, শ্লোকটা কি পড়েছিলুম, ভুলে গেছি। সামনে একটা উঁচু চাতাল, তার ধারে ধারে লোকেদের বসবার জন্য কাঠের বেঞ্চি পাতা। ভাল করে তখন আর দেখা শোনা হলো না, কারণ মাথার উপর তখন মেঘ-মেদুর আকাশ থেকে ঝলকে ঝলকে বিদ্যুদ্বর্ষণ চলছিল, রুদ্ধ অনিঃশ্বসিত প্রকৃতি আসন্নপ্রায় ঝড়ের প্রতীক্ষা করছেন।

পাণ্ডাজীর লোকেরা সব ব্যবস্থা করেই রেখেছিল। এখানেও বেশ দোতলার ঘর পাওয়া গেল। রান্নাঘর, থাকার ঘর সবই ভাল, শুধু এদেশে (একা কেদার ছাড়া) দরজা জানলায় কবাট যখন জন্মায় না, তখন আর পাবো কোথায়? বরাবরের মতনই কম্বল কয়েকখানা টাঙ্গানো হলো। টিহরি রাজ্যের কাউন্সিলের মেম্বর ও অন্য একজনের লেখা রাওল সাহেবের নামে চিঠি ছিল। আসার খানিক পরেই পাণ্ডাজীর লোক দিয়ে আসায় রাওল সাহেব আমাদের সুখ সুবিধার খবর নিতে একজন কর্ম্মচারী পাঠালেন। তখন আমরা খেয়ে দেয়ে ব'সে বটুয়া কিনচি। কি করি কিছুই যে কেনবার পাইনে, ও যা পাই এক আধটু কেনা চাইতো! আমাদের জজ সাহেব প্রায়ই বলেন,

"আপনি খুব বাজার করতে ভালবাসেন।" আমি বলি, "না বেসে কি করি বলুন তো? ওই কাযটা যে দেশে থাকতে বড় বেশী জোটেনা।"

এখানের রাওল প্রাসাদটী নব নির্ম্মিত। আকারে প্রকারে সর্ব্বতোভাবেই দীর্ঘপ্রস্থ আছে। মধ্যে দেবালয়, পুরাতনে নূতনের সংস্কার। প্রধান মন্দিরে ওঙ্কারেশ্বর শিব এবং জগমোহনে অনেকগুলি স্বর্ণপ্রতিমা বিরাজ করছেন। শীতের সাতমাস এইখানেই পঞ্চ কেদারের প্রতিভূ-মূর্ত্তির পূজা হয়।

কেদার শুধু একটী নন, পাঁচটী আছেন। প্রথম কেদারনাথ, দ্বিতীয় মদ-মহেশ্বর বা মধ্যমেশ্বর, তৃতীয় তুঙ্গনাথ, চতুর্থ রুদ্রনাথ, এবং পঞ্চম— (মনে নাই)। সবারই স্বুবর্ণ মূর্ত্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত দেখলাম। এঁরা যে রকম দুর্গম পথের বাসিন্দা, সাক্ষাৎ হবে, এ জন্মে ত আর সে আশাটি নেই। কেদারের ধাক্কা এখনও সবার ভাল করে কাটেনি,—এমন কি কুলিদের শুদ্ধ।

উখিমঠ থেকে একুশ মাইল দূরে একটা বিকট চড়াইএর পাক-দণ্ডীর পথে মধ্যমেশ্বর অবস্থিত। এখন সেখানের দরজা বরফে বন্ধই আছে, আরও মাসখানেক বরফ গলতে লাগবে। সেখানের ব্যবস্থা কেদারের ভাণ্ডারই বহন করে, পূজারী এই রাওল কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত লিঙ্গায়েৎ শৈব।

উখিমঠ—ভাগবত ও স্কন্দপুরাণের মতে বাণাসুরের কন্যা ঊষা অনিরুদ্ধের সঙ্গে বিয়ের পর এইখানেই বাস করেছিলেন, কাছেই বাণরাজ্য শোণিতপুর বা বাণাসুরের রাজধানী বামসু গ্রাম। একটী

মন্দিরে উষা অনিরুদ্ধের মূর্ত্তিও আছে,—কিন্তু বাপ !—এমন বিকট মূর্ত্তি আর কখনও কোথাও দেখিনি ! উষা যেন একটা শাঁকচুন্নির মতন বীভৎস। শ্রীকৃষ্ণ-পৌত্রের কপালটা মোটে সুবিধার ছিল না বলতেই হবে !

কেদার-বাসিনী গৌরীদেবী ও লক্ষ্মীমূর্ত্তি সবাই এখানে সুবর্ণ প্রতিমায় ও সবস্ত্রালঙ্কারে রাজবেশে বিভূষিতা। কেদারনাথের গদি খুব জমকালো। ভেলভেট, জরি, দেওয়ালগিরি, সোণার হলকরা আয়না সবই আছে। এখানে কেদারের পঞ্চমুখ, ঐ পঞ্চমুখ পঞ্চ কেদার নামে কথিত হয়। অন্যান্য মন্দিরে এবং দালানে অন্যান্য অনেক দেব দেবীও সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। চার যুগের চারটী কালী মূর্ত্তি দেখলাম।

একটা ঘরে স-মাতা-পত্নী পঞ্চ পাণ্ডব বিরাজ করচেন।—কোন সম্পর্কে তা তো বলতে পারিনে। কুটুম্বের কুটুম্ব বলেই বোধ হয় ! মূর্ত্তিগুলির মুখের ভাব ও কাটুনী বেশ ভাল। তবে বাণকন্যা উষারই বা অমন বিকট চেহারা কেন ? দেখলেই মনে হয় অনিরুদ্ধ বেচারার জীবনটা কি দুর্বিপাকেই জড়িয়ে গিয়েছিল ! রাত্রে হঠাৎ অন্ধকারে দেখলে কচি ছেলের কথা কি, বুড়োরাও ডরিয়ে ওঠে। অথচ এঁরই নামে দেশের নামকরণ এবং এই উষা পরিণয় নিয়ে কত না প্রাচীন কাব্য সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। এই শিল্পীটীর সৌন্দর্য্য বোধ বলে কি কিছুই ছিল না ?

রাওল-প্রাসাদের দুই দিকে দু'টী বিদ্যালয় বর্ত্তমান রাওল সাহেব প্রতিষ্ঠা করেছেন। একটী মিড্‌ল ভার্ণাকুলার স্কুল, একটী সংস্কৃত পাঠশালা। এখানের কাছাকাছি অনেক গ্রাম আছে, গ্রামিকদের ছেলেদের পড়ার কোন উপায়ই ছিল না, একাযটী খুব ভালই হয়েছে। কুড়ি পঁচিশটী ক'রে ছাত্র দু'জায়গাতেই আছে এবং ক্রমেই বাড়চে। বর্ত্তমানে শিক্ষক

দু'জন মাত্র আছেন। পাঠশালার যিনি, তিনি কাশীর পাস, উপাধি শাস্ত্রী। স্কুলের শিক্ষকটী শ্রীনগরের লোক।

এঁদের সঙ্গে রাওল সাহেব সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হলো। এঁরা বর্ত্তমান রাওলকে ভালই বল্লেন। এঁর আগের রাওলরা ভাল ছিল না। পূর্ব্বতন রাওল অনেক হাজার (আশী কি নব্বুই এমনি যেন) টাকা ধার রেখে গেছলো। এখন গবর্ণমেণ্টের নিয়মে রাওলেরা আর বিয়ে করতে পারবেন না স্থির হয়েছে। টাকাকড়ি সম্বন্ধেও অনেকটা কড়াকড়ি করা হচ্চে। সাধারণতঃ প্রধান চেলাই গদি পায়। বর্ত্তমান রাওলের নাম নীলকণ্ঠ। এঁরা লিঙ্গায়েৎ শৈব তা পূর্ব্বেই লিখেছি। লিঙ্গায়েৎরা দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের অন্তর্গত। বদরীর রাওল যিনি তিনি নাম্বুরী ব্রাহ্মণ। উভয়েই ত্রিবাঙ্কুরী। সুদূর দক্ষিণ হতে এই উত্তর দেশের প্রান্তভাগে এঁরা আনীত হয়েছেন। শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁর ভক্তদের দ্বারায় দূর অতীতে এই নিয়মটী সংস্থাপিত হয়েছিল, আজও তা নির্ব্বিচারে চলচে। ধর্ম্মের বহিরঙ্গ সাধনে অর্থাৎ আচারের অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের মহাজনদের যতটা অনুসরণ করি, কর্ম্মের সাধনে যদি তা করতেম, তাহলে আমাদের দেশের অতীত ইতিহাস এবং বর্ত্তমান অন্য রকমেরই হ'তো। আমরা শঙ্করাচার্য্যের বিধান ব'লে দক্ষিণী হ'তে এনে ধর্ম্মাচার্য্যের রাজ-গৌরব তাদের দিতে বাধ্য রইলুম, তা' যতই তারা দুর্বৃত্ত হোক না কেন। দেবৈশ্বর্য্যকে যতই কেন না দানবভোগ্য করে তুলুক, এর ব্যতিক্রম করি না, যেহেতু আমরা মহাপুরুষের বিধি ভাঙ্গতে প্রত্যবায়ের ভয় রাখি। কিন্তু "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ"—প্রভৃতি বচনগুলিও তেমনই আপ্তবাক্য হলেও ভুলে যেতে ভয় করিনে কি হিসাবে?

পাণ্ডাজীও বল্লেন, বর্ত্তমান রাওল সাহেব লোক ভাল। স্কুল পাঠশালা দেখে এবং চরিত্রবান্ শুনে আমারও হঠাৎ একটু কৌতূহল হলো, পাণ্ডাজীর সঙ্গে তাঁকে দেখতে গেলাম।

বয়স বেশী নয়, চেহারাটী ভাল, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ সাধু দেখবার যে আশা করেছিলুম, তা মিটলো না! পুরু গালচে পাতা, বড় বড় আয়না দিয়ে সাজান ঘর। পরণে অবশ্য গৈরিকবাস, তবে সে গৈরিক বেশ সৌখীন ও শোভন গৈরিক।

অনেক কথা হলো। কাশীতে মধ্যে মধ্যে যান, সেখানে কিছুদিন পড়েওছিলেন, অসি-মহল্লা চেনেন। এবার যদি যান, আমার খবর নেবেন বল্লেন। স্কুল পাঠশালার জন্য দেশে ফিরে এসে সকলকে বলতে বল্লেন, দরিদ্র উত্তরাখণ্ডের জন্য সকলেরই সাহায্য করা কর্ত্তব্য। কেদারে শ্রাদ্ধ তর্পণে বড়ই অশুদ্ধ মন্ত্র পাঠ করান হয় ব'লে অনুযোগ করতে বল্লেন, "আপনি ভিন্ন একথা আর কেউ কখন তো বলেনি! আচ্ছা আমি যাতে এরকম না হয় তার জন্য যত্ন নেবো। দেখুন, আমাদের হয়েছে এখন কোনরূপে গতানুগতিক ভাবে চালিয়ে যাওয়া। উন্নতি কেউ চায়ও না, পায়ও না।"

কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার তো ভালই লাগলো। শিক্ষক ও শাস্ত্রীও আমার সঙ্গে এসেছিলেন। উখিমঠের ফটো একখানা দিলেন, বল্লেন, পরে আরও কিছু পাঠিয়ে দেবেন। শাস্ত্রীটী সংস্কৃত বলেন, লোকটী বিদ্বান্ বলেই মনে হলো।

হাতে আঁকা দু'একখানি ছবি এবং অতীত ও বর্ত্তমান রাওলের অয়েল পেন্টিং ক'খানি বেশ ভালই দেখলুম। শুনলুম এখানেরই

চিত্রকরের আঁকা। "এখানের"—অর্থাৎ শ্রীনগরের। টিনের উপর বা সিংহগুলিও স্থানীয় কারিগরের করা। রাওল-প্রাসাদ ও কেদারনাথে গদিতে মেঝেয় ও দেওয়ালে এনামেলিং এসে পৌঁছেছে। পেট্রোল ল্যাম্প প্রভৃতিরও অভাব নেই।

১৫ই মে সকালে কাণ্ডাচটি ও মধ্যাহ্নে গলিয়াদ্ গড় বা গোদাচটী থেকে বেলাবেলি বার হয়েছিলাম। পাণ্ডাজী এইখানে বিদায় নিলেন তাঁর মোটে ইচ্ছা ছিল না। তাঁর ক্ষতি হচ্চে বুঝে আমরাই অনেক জিদ করে তাঁকে বিদায় দিলুম। তাঁর পাওনা এখন মেটানো হলো না, তিনি চানও বেশি। কেদারে তাঁর বাড়ী নেই, একখানি বাড়ী করে দিতে হবে। যা' তা' করে করলেও সাড়ে তিন হাজারের কম হবে না। পঙ্কু নিজে হাজার টাকা দেবে বলেছিল, এখন আমরা সবাই মিলে যা দোব তা ছাড়া হাজার দুই সে দেবে বল্লে। কিন্তু তাতেও হবে না। লোকটা ঢের করেছে,—ওরকম সাহায্য না পেলে কি আমরা কেদারের মত স্থানে যেতে পারতুম! এসব পথের নিয়ম কানুন, ভালমন্দর আমরা জানিই বা কি! পাণ্ডাজীর এক গোমস্তা রামসিং নালা চটীতেই বিদায় নিয়েছিল, তার মা মরে মরে। পাণ্ডাজীর একজন লোক তুলারাম আমাদের সঙ্গেই রইলো, এই লোকটাই বেশি খাটে, আর রইলো বদরীর গোমস্তা। তার এলাকায় আসা থেকে এইবার সেও খুব খাটতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু পাণ্ডাজীর অভাবটা বড্ড বেশীই মনে হতে লাগলো। এমন চমৎকার লোক প্রায় দেখা যায় না। আমরা যেন কিছুই জানতে পারছিলুম না যে আমরা কত দুর্গম পথে বেরিয়েছি।

উত্তরাখণ্ডের পত্র

আকাশে মেঘ কিছু বিভীষিকা দেখাচ্ছিল, পথও নাকি ভীষণ চড়াইএর, সেই জন্য বেলা আড়াইটাতেই বেরুনো হলো। গৌরী কুণ্ড ছাড়ার পর থেকে এপর্য্যন্ত পথ আমরা ভালই পেয়ে এসেছি ব'লে আমাদের বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেছলো যে পূর্ব্বশ্রুত সেই সব ভীষণ রাস্তা-গুলির কিছু নমুনা স্বরূপ শুধু কেদার পথের ঐ মাইল কতক বর্ত্তমান আছে মাত্র। যে রাস্তাটী যোশী মঠের গা ব'য়ে তিব্বতের দিকে নীতিপাশ পর্য্যন্ত চ'লে গেছে, তারও চেয়ে নূতন ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার সুকৌশলে বিরচিত পূর্ব্বেকার দুর্গম পথগুলি সমধিক রূপেই সুখপ্রদ হয়ে উঠেছে। এদিনের উঁচু চড়াইটা ওঠা পর্য্যন্ত এই বিশ্বাসটাই প্রবল ছিল। দার্জ্জিলিং প্রভৃতির মত আধুনিক প্রথায় কঠিন চড়াই উৎরাইএর দুরূহতাকে যথেষ্ট সুসহ করা হয়েছে। উপরে উঠে নীচের দিকে চইলে রাস্তাটাকে দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলপথের মতই দেখায়। এই সব পথে যত উঁচু নীচু চড়াই উৎরাই হোক, কুলিদের ওঠা নামায় ততদূর কষ্ট হয় না। কিন্তু আজ আবার অকস্মাৎ একি!—ন্যূনাধিক একমাইল চড়াই, তার পরেই নূতন রাস্তা হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়ে পুরাতন দেখা দিলেন। সে যে কি বিশ্রী ব্যাপার তা বলবার নয়! বড় বড় হুড়মুড় পাথরের এবড়োখেবড়ো সঙ্কীর্ণ পথ—সে পথে বেশীক্ষণ হাঁটারও সাধ্যনেই। আবার পদে পদে স্খলিত পদ ঠার শ্রমে শ্রান্ত বাহকদের পিঠে আড়ষ্ট হয়ে ব'সে থাকা—সেও সমান কষ্টদায়ক।

হিমালয়ের যতটা অংশ আমরা এসেছি, আজকের মত এত ঘনারণ্য কোথাও দেখিনি। অম্বরচুম্বী গিরিমালার আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে যেনই আকাশস্পর্শপ্রত্যাশী সুবৃহৎ বৃক্ষরাজি সমাকুলিত নিবিড়

অরণ্যাণী। এই বনভূমি হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল। মাথার উপর মা কালী গায়ের রংয়ের মত গাঢ় গভীর ঘন কাল রংয়ের মেঘে ভরা আকাশ,- তার মধ্যে থেকে কালী মায়ের হাতের চকচকে খাঁড়ার মতনই বিদ্যুতে শিখা ধক্ ধক্ করে জলে উঠছে। অসুরনাশিনীর সমর তর্জ্জনের মত মেঘ থেকে থেকে গর্জ্জন ক'রে উঠছে। সরু লম্বা ঝাউ ও রিসি গাছের বন তাঁর সঙ্গের যোগিনী সেনার মত বাতাসে দুলে দুলে হুঙ্কা ছাড়ছে। মড়ার মাথার স্তূপের মত এলোমেলো ছড়ানো পাথরে তেমনই দুর্দ্দান্ত রাস্তা, আর চড়াইএর পর চড়াই। এর উপর বৃষ্টি আসতে বাকি থাকলো না। মনে হলো সমরশায়ী অসুর সেনার শোকে যেন দৈত্যঘাতিনীর বৈরী-বনিতাকুল অজস্র ধারায় কেঁদে ভাসালো।

মোদ বা গোদা থেকে বেনিয়া কুণ্ডের ব্যবধান মোটে চারটী মাইল, এর মধ্যে তিনটী মাইলেই এই রকম ভিজে গলে এই দুর্দ্দশার মধ্যে দিয়ে কাটলো। ইতিমধ্যে আমরা দু' বোনে একটু পিছিয়ে পড়াতে ওদিকে একটা বিষম কাণ্ড বেধে গেছে। আমাদের খালি ডাণ্ডি দু'খানা নিয়ে ডাণ্ডিওলা এগিয়ে গেছে ব'লে আমরা সবাই হাঁটচি, আর পঞ্চু আমাদের খালি ডাণ্ডি দেখে বিপদের ভয়ে ডাণ্ডি গুলো সঙ্গে নিয়ে ছুটো ছুটি করে আমাদের খুঁজতে আসচে। একটু আগে খুব একটা হল্লা শোনা গেছলো বটে; সে নাকি মালের কুলিরা একযোড়া বাঘ দেখে মাল ফেলে ঐ রকম হল্লা করায় তারা উঁচু পাহাড়ে চ'ড়ে যায়।—আমরাও একটু আগে অনেকটা দূর দিয়ে একটা কিছুক তীরের মতন ছুটে যেতে দেখেছিলুম। মনে হয়েছিল, হয়ত হরিণ। কারণ অমন সব গভীর অরণ্যে মৃগযূথ না থাকলে সে অরণ্যের অঙ্গহানি

হবে যে! তবে হিমালয়ে শুধু মৃগযূথই নয়, হস্তী ও কেশরী সবই যে থাকবে, সে কথাটা আমরা ভুলেই গেছলুম। আজ হঠাৎ সেই পলায়নপর জন্তুটা বাঘও হতে পারে অনেকের মুখে এই-মন্তব্য শুনে মনে পড়ে গেল,—

পদং তুষারস্রুতিধৌতরক্তং
যস্মিন্নদৃষ্ট্বাপি হতদ্বিপানাম্।
বিদন্তি মার্গং নখরন্ধ্রমুক্তৈ-
র্মুক্তাফলৈঃ কেশরিণাং কিরাতাঃ॥

সিংহ হাতী মেরে পালালে তার রক্ত-মাখা পায়ের দাগ তুষার জলে ধুয়ে যায়, কিন্তু তার লক্ষ্যচ্যুত গজমুক্তার দ্বারা শিকারীরা তাদের গন্তব্য পথের সন্ধান লাভ ক'রে থাকে। আমরা গজ নই, মাথার মুণ্ডুতে মুক্তার বালাই নেই, কাযেই আমাদের মেরে গেলে কেউ আর তাদের পথ-চিহ্ন খুঁজেও পেতনা!

রাস্তাটা নেহাৎ খারাপই বটে! এবার সজ্ঘ-বদ্ধ হয়েই পুনর্যাত্রা আরম্ভ হলো। বন ঘন থেকে ঘনতর হয়ে উঠ্‌চে, মেঘেও থেকে থেকে বৃষ্টি ঢালছে। খানিক হাঁটা, খানিক ওঠা করতে করতেই চলেছি। শেষের দিকটায় একটু খানি "পথ" পাওয়া গেল। একস্থানে অনেকখানি খোলা ও প্রশস্ত তৃণাস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড, চারিদিকে ঘনায়মান দূর দূরান্তর প্রসারী পর্ব্বতারণ্যের মধ্যভাগে যেন মরুভূমে ওয়েসিসের মতই প্রতীয়মান হচ্ছিল। এর গায়েই ছোট কয়েকটা পরিচ্ছন্ন কুটীর পোথীবাসা চটিরূপে শোভা পাচ্ছে। সামান্য বিশ্রামাদি সেরে বেরুনো গেল।

চড়াইএর আজ আর যেন অন্ত নেই! স্বর্গের সিঁড়ির পথে শূন্যে শূন্যে মহা শূন্যেই যেন উঠে চলেছি!

হিমালয়ে এসে আজই যেন এর দুর্গমতাকে (অবশ্য কেদারের ত্রি-দুর্গমতা ছাড়া) ভাল ক'রে উপলব্ধি করতে পারলেন। গহন বন বনরাজি, দিগন্ত বিস্তৃত কর্কশ বন্ধুর পর্ব্বত মালা, গ্রাম ভূমি, শস্য ক্ষেত্র জনমানব বিবর্জ্জিত, মানব-সভ্যতার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন—একেবারে প্রকৃতিরই স্বাধীন সাম্রাজ্য! যাকে আমাদের উপকথায় বলে "অজগর বিজ-বন"—ঠিক তাই!

মেঘে আকাশ ভরা, পাহাড় ভরা। বৃষ্টি থামলেও গাছের পাতায় পাতায় জল চুঁইয়ে টুপ্ টাপ করে ঝ'রে পড়চে। ওপর থেকে ছোট বড় ঝর্ণা ধারা রূপে বৃষ্টির জল নীচে নামচে। কোথাও তা' দেখা যাচ্চে, কোথাও তার প্রস্ফুট বা অস্ফুট কলকল ঝরঝর তান শোনা যাচ্চে। বাতাসে ঝির্ ঝির্ ক'রে দেবদারুর সরু পাতা যেন সর্ব্বদাই তাদের অতিথিগণকে চামর ব্যজন ক'রে আতিথ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করছিল।

প্রকৃতি বন্য ভাবাপন্না হলে কি হবে, যথেষ্ট সুন্দরী! বনবালা শকুন্তলার সৌন্দর্য্য কিছু কি কম ছিল?

বেলা তখন সাড়ে চারটের বেশি নয়, মেঘে কুয়াসায় একাকার হয়ে গিয়ে অকাল সন্ধ্যা আসন্ন হয়ে উঠেছিল। ক্লেশকর পথ, বাহকেরা ক্লান্ত, বেনিয়াকুণ্ডে এসে রাত্রের জন্য বিশ্রাম নেওয়া হল। এর পরের রাস্তাও সুবিধার নয়, তাছাড়া আবার সেই "ন-ভ'র-" (নরভক্ষক-ব্যাঘ্রের) ভয়ও আছে। চটিখানা বড় আছে, বড় বড় লম্বা লম্বা ঘর

দুখানা পাওয়া গেল। তবে সকালের সেই গণেশ চটির পর থেকে আর দোতলা চটি চোখে পড়েনি, নেই বোধ হয় এদিকে। জিনিষ পত্রও ভাল নয়, সকালে তো আলু পাওয়া যায়নি। কিছু সঙ্গে ছিল তাই রক্ষা! এবেলা যাহোক কুমড়া ও আলু পাওয়া গেল। সকালে পথে কেনা নটে শাকও কিছু ছিল। আলুর চপ, কুমড়ার বড়া, কাঁচকলার কোপ্তা কিছুরই অভাব হচ্চে না। চিংড়ীমাছের "বাবালোগ"টাই শুধু নেই!

যেখান থেকে ঘন বন আরম্ভ হয়েছে সেইখান থেকে বেশ জানা যায় যে এদিকে বৃষ্টি অত্যন্ত বেশি। সমস্ত পাহাড়ের আর প্রত্যেক গাছের গায়েই কত রকম বেরকমেরই যে শেওলা হয়ে রয়েছে তা বলবার নয়। অর্কিডও নানা প্রকারের। কতকগুলো সংগ্রহ করলুম। করেই বা কি হবে? বৈচিত্র্যের তো শেষ নেই, কতই বা নেবো? যেতে যেতে সব কোথায় যাবে শুকিয়ে ততদিনে!

এদিকে নাকি চিরবর্ষারই রাজত্ব! কেদার পথে বরফের আগে স্থানে স্থানে যেমন মনে হয়, যেন এখানে চির বসন্ত বিরাজিত,—এখানে বর্ষাও তেমনই চিরদিন একভাবে অবিশ্রান্ত বর্ষণ করে চলেছে। এর মানে এ পাহাড় গুলো বিশেষ উঁচু এবং তার সঙ্গে ঘন বনের জন্য মেঘ এখানে আটকে পড়ে। কুলিগুলোর জন্য দুঃখ হয়! বিশ্রামের প্রয়োজন এ পথে ওদের বেশি, ক্রমাগত চড়াই চড়তে হচ্চে কিনা;—কিন্তু সকল সময় আবার নামাবার জায়গাই পায় না—বিশেষ এ পথহীন পথের মধ্যে। এর চারি দিকেই বড় বড় পাথরের গাদা, নামায় বা কোথায়?

এই ভীষণ পথে আগাগোড়া কুলির ঘাড়ে চ'ড়ে যাওয়া সঙ্গতও নয়, সম্ভবও নহে। অবশ্য অক্ষমতা অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে এই নির্ম্মমতা অনেক সময় করতেই হচ্চে, তবে ভাল রাস্তা পেলে সেই সময়টাতেও অন্ততঃ খানিকটা ক'রে ওদের রেহাই দেওয়া কর্ত্তব্য। নিজের পক্ষেও একটু একটু পথ চলায় উপকার ভিন্ন অপকার হবে না। বিশেষতঃ বড় বেশি চড়াই উৎরাইএর পথে ক্রমাগত আড়ষ্টকাঠ হয়ে থাকার পর একটু হাত পা ছড়িয়ে দাঁড়াতে পারলেও ঢের হয়, সোজাপথে চলতে তখন ভালই লাগে।

গতকল্য থেকেই তুঙ্গনাথের পাণ্ডাদের সঙ্গে ঘন ঘন সাক্ষাৎ ঘটছিল। এই চটিতে পাণ্ডার দল অতি গভীর ভাবে এসে আমাদের ঘেরে দাঁড়ালেন। ভোরের বেলায় বেনিয়াকুণ্ডেও দুএকজনের আবির্ভাব হ'য়েছিল। আমাদের দলের সকলেই কেদার পথের কষ্ট মনে ক'রে সোজা বদরী যেতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। তুঙ্গনাথে যাওয়া কারও মত ছিল না। অবশ্য কারও মত ছিল না বল্লে ঠিক বলা হয় না, মাতব্বরদেরই অমত ছিল বলা সঙ্গত। আমাদের দু'বোনের যাবার ইচ্ছাটা খুবই প্রবল ছিল, এর জন্য পথের খবরটাও খুব ভাল করে নিয়েছিলেম। টিহরী রিয়াসতের যে ক[illegible]ারিটী রাওল সাহেবের আদেশে আমাদের খোঁজ খবর করেছিলেন, তাঁর কাছেই জেনেছিলাম। তুঙ্গনাথের পূর্ব্বেকার সেই পাকদণ্ডী রাস্তাটীর পরিবর্ত্তে এই বৎসরেই একটী ভাল রাস্তা তৈরি হয়েছে। এর খরচ দিয়েছেন, কলকাতার কোন একজন ধনকুবের শেঠ, সেই জন্য তুঙ্গনাথ যাওয়ার ইচ্ছাটা খুবই প্রবল ছিল। চড়াই উৎরাই এ সব পথেই কোন্ কম চলচে। শুনেছি

উত্তরাখণ্ডের পত্র

তুঙ্গনাথ পাহাড়ের উপর থেকে হিমালয়ের বহুদূর পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়, বিশেষকরে সেইটে দেখার ইচ্ছাই ছিল। পঙ্কুর শরীরটা ভাল নেই, সেটা সে স্বীকার না করলেও বেশ বোঝা যাচ্চে। মেঘ ও কুয়াসায় সমস্ত অন্ধকার হয়ে আছে, বৃষ্টিও মধ্যে মধ্যে হচ্ছিল, তার উপর তুঙ্গনাথে এখনও কেদারের মতন বরফ রয়েছে।

চোপতা চটির কিছু পূর্ব্ব হইতেই আমাদের বামদিকে এক বিশাল দৃশ্য দেখলাম। সুদূর পর্য্যন্ত হিমাচলের তরঙ্গায়িত মূর্ত্তি নগ্নরূপে আমাদের চোখের সামনে ধরা দিল। মহাতরঙ্গের পর মহাতরঙ্গ যেন কোন এক সে অসীম অনন্ত মহিমময়ের মহিমা-সাগরের উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে, সমুদ্রের অফুরন্ত তরঙ্গরাজির মতই এই মহাসমুদ্রের তরঙ্গরাজিও যেন সীমাহীন ও অশেষ!

আমাদের পার্শ্বে শ্যামায়মান প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় তরঙ্গের পর ক্রমশঃ নীলাভ ধূসর, সুকৃষ্ণ এবং তার পরই একেবারে ফেনকিরীট বিভূষিত শুভ্র তরঙ্গের পর তরঙ্গ। দৃষ্টি যেন বিস্ময় সাগরে মগ্ন হয়ে যায়, অন্তরের মধ্যে একটা অব্যক্ত অচিন্তিতপূর্ব্ব বিশালতা যেন তার আধারের সঙ্কীর্ণতাকেই ঠেলে ফেলে ওরই মত বিশাল ও উদার হয়ে উঠতে চায়, জীবনের সকল ক্ষুদ্রতা যেন লজ্জায় মরে [illegible]তে পথ পায় না!—মনে পড়ে যায়।—

"হেথা নাহি ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ কাণাকাণি,
ধ্বনিত হয়েছে চিরদিবসের বাণী,
চিরদিবসের রবি ওঠে, অস্ত যায়,—
চিরদিবসের কবি গাহিছে হেথায়।"

এ বাস্তবিকই সেই স্থান!—চির-দিবসের কবি যেন বাস্তবিকই এইখানে ব'সে তাঁর উদারতার গভীরবাণী সমস্ত জগৎকে শুনিয়ে দিচ্ছেন, তাঁর এ কবিতার কোন দিনই ছন্দভ্রষ্ট হবার যতিপাত হবার ভয় মাত্র নেই।

কিন্তু কি প্রবল অতৃপ্তি এর মাঝখানে? মানুষের অদৃষ্ট কি অকরুণ! কোথায় এই মহত্তম গিরিপতি হিমালয় ও তাঁর চিরস্বাধীনা আরণ্য-প্রকৃতি, আর কোথায় তার পাশে ক্ষুদ্রতম স্বার্থতার বিষে ভরা, অহঙ্কারে অন্ধীকৃত মানব চিত্ত!

ভীমডঙ্গার চটির কাছেই তৃতীয় কেদার তুঙ্গনাথ থেকে নেমে যাবার উৎরাই পথ দেখা গেল।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে থেকে এক সুবিশাল পর্ব্বত প্রাকার আমাদের বাঁ দিকে উঠে প'ড়ে সেই গিরি-তরঙ্গকে ঢেকে ফেলেছিল। একটা মোড় ফিরতেই আবার আমাদের দক্ষিণে তারই প্রতিরূপ দৃশ্য ফুটে উঠলো। সেই একই অনন্ত সাগরের অগণিত তরঙ্গ নিচয়। সাগরে পরপর সপ্ত তরঙ্গ দৃষ্ট হয়, এ কোথাও দশ, এগার, বারটী পর্ব্বত রেঞ্জ পরপর দেখা যাচ্ছিল, কোথাও চৌদ্দ, ষোল। এর ভিতর কালো রং পাঁচ ছয়টীর মাত্র, বাকি সমস্তই তুষার ঢাকা। যদি সেদিন পাহাড়ের গায়ে মেঘ ও কুয়াসা না থেকে সূর্য্যকরোজ্জ্বল দিবস হতো, (যদিও এখানে বড় একটা তা' হয় না) তা হলে আরও বেশি সাদা পাহাড় দেখতে পেতাম। চিরতুষারাবৃত সুদূর উত্তরের বহুতর গিরিশৃঙ্গ কুয়াসায় মিশিয়ে আছে মনে হতে লাগলো, খুব স্পষ্ট বোঝা গেল না, তবু এই যা দেখলুম, এও যেন কল্পনাতীত!

ঐ শ্বেত শুভ্র দিব্যালোক দৃষ্টে সেই দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর কিম্পুরুষ

অধিবাসিত হিমালয়ের প্রকৃত মূর্ত্তিটিই যেন দেখা হলো। সার্থকনামা, স্বনামধন্য হৈমবন্ত-বন ও হিমবানপর্ব্বত এই দুই মূর্ত্তিকেই আজিকার এই সুপ্রভাতে ভক্তিভরে প্রণাম করলেম।

সাড়ে আটটায় পাঙ্গরবাসা চটিতে এসে নামা গেল। দিনটা রৌদ্র-মেঘের লুকোচুরি খেলায় ক্ষণ পরিবর্ত্তিত, শীত বেশ প্রবল। শরীর অনেকেরই কেমন ম্যাজ্‌মেজে হয়ে আছে, মনটাও তার সঙ্গে ভারী হয়ে উঠ্‌ছে।

এই হিমালয় যেন সমস্ত ভারতবর্ষের প্রতিমূর্ত্তি! এর কত স্থানে কতই নব নব রূপ, নূতন নূতন সম্পদ এবং একই কালে বিভিন্ন ঋতুর অধিকার। ষড় ঋতুকে এখানে একত্র পাশাপাশি বাস করতে দেখেছি। এই উর্ব্বর শস্যক্ষেত্রে মা-লক্ষ্মীর পূজার নৈবেদ্য সাজান রয়েছে, এই ধূসর রুক্ষদর্শন, পার্ব্বত্য ভূমি করালীর মূর্ত্তিতে ভীতিপ্রদা হয়ে রয়েছে, কোথাও সোণার বাংলার স্নিগ্ধশ্রী, শান্ত-পল্লী, পাখীর গান, শীতল জলধারা, সজল ভাব, কোথাও দুর্গম বন্ধুর শ্বাপদ সমাবৃত পর্ব্বতারণ্য!

সোমবার ১৬ই মে রাত্রে খুব শীত ছিল। ঘরের দরজা নেই, কম্বল টাঙ্গানোয় যতটা হয়, গরম ছিল, তথাপি উলেন মোটা জামা গায়ে রাখতে হয়েছে। ডবল র‍্যাগ ও র‍্যাপার দিয়েও শীত না ভাঙ্গায় ভোরের দিকে ওভার কোটটা টেনে নিয়ে গায়ে চাপানো গেল। মাঝ রাত্রে আগুনটা নিবে গেছলো। পাহাড়ের নিয়মই এই যে বৃষ্টি হলেই শীতটা চারগুণ অন্ততঃ বেড়ে যায়, তার উপর এদিকে অবিরত বৃষ্টির জন্য শীত এবং স্যাঁৎসেঁতে ভাবটাও খুব বেশী। কেদার পথে কোথাও এই আর্দ্র ভাবটা ছিল না। এমন কি অমন যে ৩০।০০ ফুট বরফে ঢাকা কেদারপুরী, সেখানেও প্রভাত

রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা তাজা হাওয়া পাওয়া গিয়েছিল। এ দিকে সেটা নেই। কেদারে অত যে তুষার বর্ষণ, অত যে বরফে চলা, তাতেও তো কই কারুর তেমন সর্দি কাসি করে নি! এখানে সবাইর শরীর যেন ভার হয়ে উঠেছে।

বিকালেও রীতিমত মেঘে ভরা আকাশ মাথায় নিয়ে বেরুনো গেল। শীতের জন্য পথের অপেক্ষায় না থেকে এই খানেই চায়ের ব্যবস্থা হলো। প্রথম দিকের কিছু পথ নূতন তৈরি হচ্চে, নূতন পথ ছ'ফুটের কম চওড়া কোথাওই নয় বরং ক্রমাগত পাহাড় বেড়ে বেড়ে ঘুরিয়ে তোলা। পুরানো রাস্তায় অবশ্য শর্টকাট হয়, তবে প্রাণ যাবার জোগাড় এই যা দুঃখ! চড়াই আজও বড় কম যায় না, তবে নূতন পথটা যতক্ষণ ছিল তেমন কষ্টকর হয়নি। কিন্তু এক মাইল এবং দু' তিন ফার্লংএর উপরেই আবার কালকের সেই অসমতল, বড় বড় পাথরের ঢিপির উপর দিয়ে কমঠ-কঠোর ভীষণ পথ চল্লো।

এক মাইল এসেই চোপতা নামক একটি ছোট চটির কাছে থামা হলো। ডাণ্ডি কাণ্ডি ঝাপানওলারা মাঝে মাঝে ঘাড়ের পিঠের বোঝা নামিয়ে বিশ্রাম করে নিয়ে থাকে। ঝরণা এখানেও পথে পথেই, প্রায়ই এরা ঝরণার ধারে নামিয়ে জল পান করে, তামাক খায়, একটু ঠাণ্ডা হয়ে আবার বোঝা ওঠায়। পথ ক্রমে কঠিন হলো। তুঙ্গনাথের রাস্তার বরফ সব গলেনি, কেদারের চেয়েও বেশি বরফ—এও জেনেছিলেম, কাযেই জিদ করলুম না, নিতান্ত দুঃখের সহিত ও আশা ত্যাগই করলুম।

তুঙ্গনাথ পঞ্চ-কেদারের অন্তর্গত। মকুগ্রাম নিবাসী মৈঠানী জাতীয় ব্রাহ্মণরা এঁর পূজারী। প্রধান পূজারীকে মঠাধিপতি বলা হয়। মন্দিরের

পূজাদি ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য পূর্ব্বতন গাড়োয়ালরাজ প্রদত্ত গ্রাম আছে। তুঙ্গনাথ শীতকালে বরফে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখন মকুগ্রামের মন্দিরেই পূজা চলে। এখানেও একটী নিয়ম আছে যে দেবত্তর সম্পত্তি হতে কিছু টাকা জমে গেলেই মঠাধিপতি একটী যজ্ঞ ক'রে দরিদ্র সেবায় সেটাকাটা ব্যয় ক'রে ফেলেন। এই পর্ব্বতশৃঙ্গটি কারু কারু মতে ১২০০০ হাজার কারু মতে ১৩০০০ হাজার ফিট উচ্চ। এখানেও অত্যন্ত বরফ এবং তুষারপাত চলছে এবং এখানের হাওয়া কেদারের মত আমাদের পক্ষে অসহ্য হবে ভয় ক'রে পাণ্ডাজী বিশেষ করে আমাদের এই পাহাড়ে চড়তে নিষেধ করে গেছলেন। পঙ্কুরও সাহস হচ্ছিল না। সর্ব্বোপরি তার অসুস্থতা এবং মেঘ বৃষ্টি কুয়াসা বাতাসের ঘটায় আমাদের এই ঈপ্সিত দুর্ল্লভ স্থানটীর দর্শন-সুখ চরিতার্থ করা ঘটে উঠ্‌লো না।

কিন্তু মানুষের মনটা ত শুধুই যুক্তি আর তর্ক দিয়ে তৈরি নয়! মানুষের সুখ দুঃখের নিয়ম দিয়েই সে ঠিক ঘড়ির কাঁটার মতন চলে না, তার নিজের কতকগুলো অ-নিয়ম আছে। কিসে যে সে আঘাত পায়, আর কতটুকুই বা তার আনন্দ, ভাগ্যে কোন চার্টার্ড একাউণ্টেণ্টশিপ্ পাস করা হিসেবীকে এই জিনিষটার হিসেব রক্ষা করে চলতে হয় না!

বারে বারেই মনে হচ্ছিল যদি এ পথে আমার সঙ্গে তোমরা কেউ থাকতে! অথচ এ মনে থাকচে না যে একদিন ত একাই বেরিয়ে পড়তে হবে!

দিনগুলো যেমনই দীর্ঘ, পথও কি ছাই তেমনই? বদরী-বিশাল কি বিশাল পথটি নিয়েই কোন্ সুদূরে লুকিয়ে আছেন। আর কতদিন এ অধম অ-ভক্তের কাছে লুকিয়ে থাকবেন তাও তো জানি নে!

গত সন্ধ্যায় ঠিক স্বপ্নে নয়, জাগ্রত-স্বপ্নেই কেদারনাথের সেই তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বত, তুষারমণ্ডিত মন্দির, মন্দির মধ্যবর্ত্তী দেবমূর্ত্তি, দেবতার মঙ্গল আরতি, সেই সমস্ত দৃশ্যই সেদিন যেগুলো দমবন্ধের ভাব বর্ত্তমান থাকায় অস্পষ্টভাবে দর্শন করে এসেছি, তাই আজ সমুজ্জ্বল ও সুস্পষ্টরূপে যেন মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হয়ে উঠলো। কি আনন্দের স্মৃতিই সে!

শ্রীমতী অরুণা দেবী—আমার রুণু রাণিটি!

"তামু"কে কি তোমার মনে আছে,—না "ইচু" পেয়ে "তামু"র অভাবটা ভুলে গেছ? গাছতলায় ছুটে গিয়ে "ইচু" পাড়বার জন্যে হাত বাড়াও তো এবারও? তবে এবার হয়ত আর 'ইচু' বল্বে না, লিচুই বলতে পার, না? তুমি বলেছ,—"সেজতামু" "তামুকে" বুঝি অনেক ভাল ভাল কাবার দেয়? তাই "তামু" "সেজ তামু"র কাছে আছে, "তামু"কে আসতে লেখ, আমিও দোব।"—আচ্ছা তুমি আমায় কি দেবে বল ত?—'ইচু' দেবে ত? আর কি? সেটা না জানলে ত আর যেতে তোমার কাছে পারবো না। আমরা এখন কিন্তু প্রত্যহ আলু ভিন্ন আর কিছুই পাচ্চি না। এ রাস্তায় সরষের তেল নেই, ডাল চালও তেমন ভাল নয়। এটা মস্ত বড় একটা বন কি না, এখানে বাঘ আছে, তারা মানুষ খায়,—মানুষে কি কি খাবে, তার জন্য বেশি ব্যবস্থা করবার সুবিধে এখন পর্য্যন্ত এদিকটায় হয়ে ওঠে নি। খাবার জিনিষ সব চেয়ে খারাপ আমরা এই দুদিনই পেয়েছি। তুমি যদি ঠিক এই সময়েই 'অনেক ভাল ভাল জিনিষ' টেলিগ্রাফ করে আমায় পাঠাতে পারতে, তা'হলে মন্দ হতো না! কিন্তু তুমি তো পাঠাবার জন্য ইচ্ছুক

নও, আমি গেলে খেতে দেবে বলছ, তাই সেগুলো আমার এখন কিছু দিন পেতে দেরি হবে দেখছি!

এখন আমাদের যাবার পথের খবর দিই।

এ দিন আহারান্তে সামান্য বিশ্রামের পরই আমরা বেরিয়ে পড়লেম। এই চির-বর্ষার বনের মধ্যে রৌদ্র-মেঘের খেলাই চলছিল। পথ সেই বিজন কান্তারের মধ্য দিয়েই, তবে ঠিক কালকের মত অথবা আজ সকালের মত ততটা ঘন নিবিড় কিম্বা ভীমকান্ত কৃষ্ণদর্শন বোধ হলো না। আজ সেই দুরন্ত চড়াইএর শেষে উৎরাইএর ক্রমনিম্ন সুড়ঙ্গ পথ। মনে হচ্ছিল যেন আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের পড়তি আম বাগানের ভিতর দিয়ে চলেছি!—অবশ্য আমগাছ এদিকে নেই।

আমরা নেমেই চল্লেম, এ নামা বড় সহজ নামা নয়! কয়েক সহস্র ফিট ধ'রেই নামতে হবে, মাইল চারেক ধ'রেই এই নামা কাণ্ড চল্লো।

মাঝখানে ডাণ্ডি ছেড়ে মাইলটাক পায় হেঁটে চলা গেল, তোমার সেজ তামু ও পাণ্ডব নং পাঁচ সঙ্গে ছিল।

ঘন বন, স্থানে স্থানে একেবারে নিবিড়তর। তিনটে বাঘ অনায়াসেই তিন জনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে পারতো, অন্ততঃ একটারও তো অভাব হবার কথা নয়! আচ্ছা রুণু! একটা বাঘ এসে যদি পিঠে করে তোমার "তামু"কে নিয়ে যেত? সেই তোমার গল্পের "বাঘা-মামাটা"—মন্দ হতো না, না? সেটাকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে গিয়ে পুষলে অনেক কাযে লাগতো। এর দোকানে গিয়ে হালুম করে প'ড়ে,—ওর দোকানে গিয়ে হালুম করে প'ড়ে—কি করতো বল তো?—

আমাদের কিন্তু বাঘা-মামার দর্শন লাভ হলো না। শত শত যাত্রী হল্লা করে চলেছে, কাযেই ভক্ত সাধকের মত তারা আরও বিজনে গিয়ে সাধনায় মগ্ন রয়েছে বোধ হচ্ছিল! আচ্ছা রুণু!—"মানুষের গন্ধ"—পেয়েও কি তাদের মন ছটফট করেনি? একটু একটু করছিল বোধ হয় না? এ-পাশে ও-পাশে উঁকি ঝুঁকি একটু একটু মারছিল হয়ত,—না? একবার একা চলতে চলতে হঠাৎ মনে হলো মস্ত বড় হলদে বিড়ালের মত একটা কিছু যেন পা টিপে টিপে ঝোঁপের মধ্য দিয়ে আমায় তার জলন্ত চোকে অনুসরণ করচে। ওটা বোধ হয় কল্পনা, না?—তোমার ভাল পিসিমা নয়,—তাবলে!

মাইল দুইএর পর থেকে নূতন রাস্তা পাওয়া গেল। রাস্তা মেরামত চলছিল, তাদের কাছেই জানা গেল এর পর চমৌলি পর্য্যন্ত এ পথের বাকি সবটা ভাল পথই পাওয়া যাবে, বনেরও শেষ হবে।

বাঁচা গেল! বাঘের ভয়, সাপের ভয়, ঐ কি শব্দ হলো!—এই কি নড়লো!—এমন প্রাণটী হাতে নিয়ে কি পথ চলা যায়? এ'তে পথ চলার আনন্দকে ভয়ের নিরানন্দ রাহুর মত গ্রাস ক'রে রাখে।

মধ্যে এক পশলা বৃষ্টি এসেছিল, কিন্তু বন সেখানে এত বেশি ঘন যে তা' ভেদ ক'রে ঝ'রে পড়বার খুব বেশি অবকাশ পায়নি। গাছের পাতায় আটকান জল এখন টুপটাপ করে মালা ছেঁড়া মুক্তার মত ক্রমে ক্রমে মাটীর উপরে ঝরে পড়ছে।

একটা পাহাড়, সেটা যে কত উঁচু বলতে পারিনে, চোকে দেখে দশ হাজার ফিটের কম মনে করতে পারাই যায় না, (অবশ্য তা নয়) সেইটে থেকে নেমে আমরা একটা প্রশস্ত মুক্ত ক্ষেত্রে পৌঁছে ক'দিন পরে

যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। বন পাহাড়ের গায়ে মাথায় তার ঘনশ্যামলতা অদ্রিরাজের উত্তরীয়ের মতন জড়িয়ে রইলো। এইখানেই আমাদের এই শিরোস্ত্রাণ বনপর্ব্বের সমাপ্তি!

বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সমতল ক্ষেত্র, অনেক দূর পর্য্যন্ত চটির শ্রেণী লম্বাভাবে চলে গেছে, সব জিনিযই অল্প-বিস্তর পাওয়া গেল। মায় এদিকে একান্ত দুষ্প্রাপ্য আমের এবং লঙ্কার আচার! তবে নেই শুধু সরষের তেল। ঘৃত তিন টাকা সের।

এইটুকু এসেই আজকের মতন থামা হলো। বেলা রয়েছে কিন্তু এর পরের এক মাইলের ও দু'মাইলের চটি নেহাৎ ছোট, তাই এ চটিটি ছাড়বার ভরসা হলো না।

আমাদের চটি থেকে অল্প দূরেই একটী ছোট্ট নদী বয়ে যাচ্চে, তার কলধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে দেখতে এলেম। নদীটী ছোট্খাট, এবং ভারি সুন্দর,—যেন একটী কলভাষিণী বালিকা! ঠিক যেন আমার লুন্নু-লানিটী! ওর উপর দিয়ে কাঠের পুল। এই পুল দু'পাশে মোটা মোটা নোড়া পাথর ঠেসে তার উপর মোটা কাঠের কড়ি ফেলা। ওপারে আর একটা প্রকাণ্ড উঁচু পাহাড়ের গায়ের উপর ছোট একটী গ্রাম। ওতে গরু মোষ চ'রে ফিরচে, হা মুখী মেয়েরা পিঠে বেঁধে এদের রাতের খোরাক পাতার বোঝা নিয়ে আসছে। গৃহিণী ও বধূরা নদীতে জল আনতে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে গেল। ওরা সবাই প্রায় বিষ্ণাই ব্রাহ্মণ। (বিষ্ণুউপাসক হয়ত! তা' এরা বলতে পারলে না।) মেয়ের বিয়েয় এদের খরচ হয় না, বউ আনতে বিস্তর পয়সা লাগে। সেই কম্বলের শাড়ী ও জামা পরা বলিষ্ঠ সুশ্রী চেহারা,

মুখে শান্তির স্নিগ্ধ স্পর্শটুকু বুলানো রয়েছে ! আমার মনে হয় নাগরীক সভ্যতার বহুদূরে এই যে জীবন, একেই প্রকৃত জীবন বলা চলে !

একটী গৃহিণী এসে প্রশ্ন করলেন, তাঁর "বাছা"কে (বাছুর) "লেক্‌ড়া"য় ধরেছিল, তার গলায় সেই ঘায়ে এখন পোকা পড়েছে, কি দিলে সারবে ?

সম্ভবতঃ পঞ্চুর ডাক্তারী খ্যাতি তারও কাণে গিয়েছিল। ওর নামডাকটা তো মন্দ হয়নি ! যাহোক দুর্ব্বাঘাসে এবং হলুদে বেটে দিলে নাকি এরকম পোকা মরে, তাই বলে দেওয়া হলো। ব্যবস্থাটা ডাক্তারের নয়, ডাক্তারণীর।

একা বসে কত কথাই মনে পড়ছিল। ক্ষুদ্র তটিনীর ঝুরু ঝুরু কুলু কুলু রব, শান্ত স্তব্ধ মৌনা প্রকৃতির এই বিজন-বিলাস, এর মধ্যে কতদিনের কত বিস্মৃত কথা কতই না অ-বিস্মৃত স্মৃতির ব্যথা একই ক্ষণে মনের মধ্যে উদাস হয়ে জেগে ওঠে, দুঃখে সুখে বুকের মধ্যে একটা গভীর আলোড়ন চলতে থাকে। সেই সব অপগত দিনকেই ফিরে ফিরে মনে পড়ে, যেদিনে মা-বাবা দিদি মাসিমা দিদিমা এবং আজকের দিনে চির হারানো আরও কত আত্মজনের সঙ্গে তীর্থ যাত্রায় বেরিয়ে পড়া হয়েছিল। সে সব দিনের বেড়ানোয় কি সুখ, কি সে আনন্দ! জীবন তখন তার মধুর রঙ্গীন স্বপ্নে ভরপূর। চারিদিককার সমস্ত প্রকৃতি সমস্ত পৃথিবীই সেই নবীনত্বের রং মেখে রঙ্গীনতর হয়ে রয়েছে,— যা দেখছি তাই নূতন, তাই সুন্দর ! আর আজ ? কোথায় আমার সেই স্বপ্নময় সুখের অতীত ? সে যে শুধু স্মৃতির মধ্যেই জাগ্রত হয়ে রয়েছে ! আজ যদি সেদিনের তাঁরাও আমাদের সঙ্গে থাকতেন !

মার কথা মনে পড়ছিল!—আর তো কেউই আজ বেঁচে নেই,—শুধু মাই আছেন। যেখানটায় পথের দুর্গমতা কম, মনে হয় মা এলে ভাল হতো। তাঁরও এসব দেখা হতো, আমাদেরও বেশি ভাল লাগতো।

কলনাদিনি-তরঙ্গিণি! তুমি যেন সত্যসত্যই আমার "লুক্স-লানীটী"! আমার এই চিন্তাধারাকে যেন ভিন্নপথে ফিরিয়ে দেবার জন্যই তাড়াতাড়ি গদ্‌গদ কলস্বরে অত কথা কয়ে চলেচ! কি সব কথা? নেচে গেয়ে তালে তালে তালি দিয়ে হাস্যে লাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে ও কি খেলা খেলচো? এ কার জন্য, কাকে তৃপ্ত করতে এই হাসি এই খেলা? তোমার এই হাসি খেলা দেখে সেই গানটা যে মনে পড়ে গেল,—

"বিজন কানন মাঝে, আরও বয়ে যাও,—
পুলকে ডুবাও সবে পুলকে ডুবাও।"

রুণু রাণি আমার! এই পার্ব্বত্য নদীটীর মত স্বাস্থ্য-সুন্দর নির্ম্মলতা-ময় পবিত্র জীবনটী যেন তোমার হয়। সংসারের মলিনতা যেন ওর মতই তোমায় কোনদিন স্পর্শ করতেও না পারে। কাছে এসে যদি কোন সংসারচক্রাহত তার ব্যথিত তপ্তশ্বাস মোচন করে, সে যেন তোমার সরল বুকে শুধু একটুখানি সহানুভূতির আবেগমাত্র জাগিয়ে দিয়েই মিলিয়ে যায়।—তোমার শান্তি-শীতল বুকখানিতে তার তাপ যেন একটুও লাগায় না।—আজ বৈশাখী পূর্ণিমা,—চারিদিক জ্যোৎস্নাজালে বাঁধা পড়ে গেছে, যেন সেই গানটার মত,—"চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গেছে, —ছড়িয়ে গ্যাছে আলো।"—

ঝরকুল্লা—জ্যোতির্ম্মঠ

শ্রীমতী কল্পনা দেবী—কল্যাণীয়াসু

১৯শে মে মঙ্গলবার মঙ্গল চটি থেকে বেরুনো গেল। এর দুই মাইলে বৈরাগণ চটি, আরও এক মাইলে কোল্‌টী, ঐখানে প্রাতরাশ সম্পন্ন করবার ব্যবস্থা ছিল। আর তিন মাইল গিয়ে গোপেশ্বর পৌঁছে আমরা গোপেশ্বর-শিবমূর্ত্তি দর্শন করলেম। চতুর্থ কেদার রুদ্রনাথ যাবার ফাঁড়িপথ এই খানে আরম্ভ। কেউ বল্লে দশ মাইল, কেউ বল্লে বার মাইল। আমাদের পক্ষে 'যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন'—কাযেই ও আশায় ইতি দিয়ে তাঁর প্রতিভূ-মূর্ত্তি এবং গদী দেখেই মনস্তৃপ্তি করা গেল। গোপেশ্বরের মন্দির বেশ বড় ও খুব প্রাচীন। দ্বিতলের দালানে অলঙ্কার-বস্ত্রে মণ্ডিত হয়ে বিগ্রহ মূর্ত্তি বিরাজ কচ্চেন। পূজারীকে প্রশ্ন ক'রে ক'রে জানলুম একজন মোহান্ত ছিলেন, অধুনা বিতাড়িত। তাঁর সঙ্গে সরকারের মকদ্দমা চলচে। লোকটী সংবাদপত্রের মারফতেই হয়ত সংসারের কিছু কিছু খবর রাখেন দেখা গেল। বল্লেন—"যেমন আপনাদের তারকেশ্বরের ব্যাপার, সেই মতন আর কি!"

সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী হিন্দুর ধর্ম্মাধ্যক্ষগণের এ কি মহা অধঃপতনের দৃশ্য দেখতে হচ্চে! এমন উদার মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে থেকেও ক্ষুদ্রতার তুচ্ছ ভোগকে মানুষ এত বড় কেমন ক'রেই ক'রে তোলে? যেখানে বিলাস ব্যসনকে সচেষ্টায় খুঁজে আনতে হয়, সহস্র বাহু মেলে সে-ই তাকে আকর্ষণ ক'রে টেনে আনে না, সেখানেও এত ভোগের নামে দুর্ভোগ হচ্চে এ কেমন ক'রেই হয়? এইসব পুণ্যস্থলীতে কত ভাল কায

কত লোকশিক্ষা হতে পারতো, হতোও তো একদিন তাই। সব গিয়ে এখন মোহন্তী-অনাচারেই সে সব প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তিত হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর তা' থেকে রক্ষা করতে আসছে কি না বিদেশীর হাত! এতে লজ্জায় মরে যেতে হয় না? তা' হোক এথেকে মোহন্তী নষ্ট হতে পারে, কিন্তু মঠের যা কার্য্য তাও কি আর পুনঃ সংস্থাপিত হয়ে উঠবে? না মাঝে থেকে দশের অন্নলাভের ও জ্ঞানার্জ্জনের মুক্ত দ্বারটীই রুদ্ধ হয়ে যাবে? হায় মানুষের ভোগতৃষ্ণ স্বার্থান্ধ চিত্ত!

সত্যি যতই দেখছি, মানুষের উপর যেন একটা দারুণ বিতৃষ্ণা আসছে। অথচ এই মানুষের মধ্যেই দেবতা দেখেছি, আজও দেখছি— এরা সব কি তাঁদের সঙ্গে একই উপাদানে গঠিত? নর-নারায়ণ এবং নর-পিশাচ দুইই জগতে আছে। উপায় কি, জগতের এযে বৈচিত্র্য! এবং—হিন্দুর শাস্ত্র তাই কর্ম্মফল দিয়েই এই বিস্ময়কর প্রশ্নের একমাত্র সমাধান করে রেখেছেন। না হলে যে মানুষকে দিশাহারা হয়ে যেতে হতো। কে' জানে কি কর্ম্মে এমন মন নিয়েই মানুষে জন্মায়, যাতে শক্তির এত বড় অপব্যবহার করে ফেলে। জনসেবার দেশপূজার এত বড় বড় সুযোগকে ব্যর্থ হতে দিয়ে নিজেও নষ্ট হয়, দশজনকেও বিনষ্ট করে দেয়।

গোপেশ্বরে এক প্রকাণ্ড ত্রিশূলের গায়ে গোর্খারাজের বিজয় কাহিনী ক্ষোদিত রয়েছে দেখা গেল। এই পর্য্যন্ত নেপাল অধিকারভুক্ত হয়েছিল। গোপেশ্বর থেকে আরও তিন মাইল এসে অলকানন্দার পুল পার হয়ে বেলা দশটার সময় আমরা লালসাঙ্গা বা চমোলী পৌঁছলাম। এইখান হতেই কেদারখণ্ড শেষ হয়ে প্রকৃতপক্ষে বদরী-

নারায়ণের পথ আরম্ভ হলো। এইবার আমরা বদরীর ফেরৎযাত্রীও অনেক পেতে লাগলেম। তাদের কাছে জানা গেল, সে রাস্তাতেও বরফের অপ্রতুলতা নেই, চড়াইও স্থানে স্থানে বেশ চড়া রকমই। যা-হোকগে, ওসব কথাতে আর আগের মতন অতটা কাণ দিইনে। যখন এতদূর আসাই গেছে, তখন যে রকম হ'বার হবেই, বদরীনারায়ণের যা মনে আছে তাই করবেন। দয়া থাকে কেদারের মত নিজে হাতে ধরে টেনে নিয়ে কোলে নেবেন, না পারেন, ফিরিয়ে দেবেন। এখন ঘোরতর অদৃষ্টবাদী হওয়া ভিন্ন আর তো কোন পথ নেই।

চমৌলীর নাম ডাকটা যতদূর শুনে এসেছিলেম, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সে রকমটা বিশেষ কিছু দেখা গেল না। দোকান পশার আছে, পোষ্টাফিস, ডাকঘর, থানা, হাঁসপাতাল তাও আছে। তা'ছাড়া শোনা গেল আরও খানিক উপরে নাকি একটা ফৌজদারী আদালত ও ট্রেজারী আছে, একজন ডেপুটী কালেক্টর সেখানে থাকেন। বদরী-কেদার দুই তীর্থই এঁর এলাকাধীন। এখানে চমৌলীনাথ নামক মহাদেবের মন্দির চন্দ্রপাণ্ডে নামক কালেক্টর সাহেব প্রতিষ্ঠা করেন। লালসাঙ্গা নামের কারণ শোনা গেল অলকানন্দার উপরের ঐ পুলের প্রথমাবস্থার রক্তোজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা!

কেদারের পথে ঘি ৬৲ টাকা সের উঠে পথে ৩৲ সের অবধি নেমেছিল। গতকল্য ২৷৷০ টাকা সের পাওয়া গিয়েছে, আজ এখানে ২।০ সের পাওয়া গেল। সরষের তেলের বনপথে কিছু অভাব ঘটেছিল, আজ ১।০ সের পাওয়া গেল। আলু ।০ সের। চাল, মুগের ডাল, ভাল ময়দা পাওয়া যায় তাও ৷৷৵০ সের। বাদাম ২৲ সের। ভাল খাবার পাওয়া যায়। লুচি,

জিলিপি, মুগের লাড্ডু, মিঠাই এসব যথেষ্ট আছে, তবে আমাদের বাজারের খাবার তো নেওয়া হয় না, তাই উপকরণই সংগ্রহ হ'ল।

জলকষ্টটা এখানে যথেষ্ট ভোগ করতে হ'লো। অলকানন্দায় নেমে স্নান করতে গেলে চড়াই উৎরাই ওঠানামা এত বেশি যে সে লোভ সম্বরণ করতে বাধ্য হলেম।

পুল পার হয়ে বেলাবেলি বদরীর পথ ধরা গেল। প্রকাণ্ড খাড়া পাহাড়, গায়ে তার একটা তৃণ গুল্মও জন্মাতে পায় না। সঙ্কীর্ণসলিলা অলকানন্দার ধারে ধারে চলেছি। গাছ পালার নাম গন্ধও নেই, শুধু নিরেট পাথরের বিরাটস্তূপ। পথ কিন্তু অতি সুন্দর, সুপ্রশস্ত, বাঁকের মুখে খানিকটা যেন দালানের মত চওড়া সুপরিসর স্থান। শুধু মাইল আড়াইএর মধ্যে তৃণ গুল্ম দেখা গেল না, এই যা একটু অভিনবত্ব!

আবার দেখতে দেখতে এক অপূর্ব্ব স্বপ্নপুরীর মতই সহসা সবুজে গোলাপীতে লালে সাদায় চারিদিকে যেন আনন্দ-রশ্মি বিকশিত হয়ে উঠ্‌লো। এখানে গাছভরা ডালিম ফুল (এ পথে এই প্রথম), ওখানে পদ্ম-করবীর স্নিগ্ধ গোলাপী ফুলের থোলো, আতস বাজীর আলোর মতন উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌লো। কলাগাছ, মূলোক্ষেত, কপিক্ষেত, পেঁয়াজ-কলি সব কিছুরই প্রাচুর্য্য দেখতে পেলেম

দেখে খুব আনন্দ হয়েছিল বটে, কিন্তু আমাদের ভাগ্যক্রমে বদরীর ফেরৎযাত্রীরা কপি মূলো প্রভৃতি কিনে নেওয়ায় তার ডাঁটা-পাতাগুলোই আমাদের জন্যে বাকি প'ড়ে ছিল। তীর্থযাত্রায় পেঁয়াজ অভক্ষ্য, তাই অবশিষ্ট মূলো কপিপাতা ও কাঁচা কলাই ।০ হিসাবে সের দিয়ে যথালাভ বোধে ক্রয় করা গেল। এপথে সব চেয়ে দুর্দ্দশা তরিতরকারিরই, আলু

খেতে খেতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হয়। তবু গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে শাক পেলেই আমরা কিনে নিই।

মোচা গাছে গাছে ঝুলচে, কিন্তু দিতে চায় না, বিশ্বাস কলা খারাপ হয়ে যাবে। তবু সেই ঠোঁটে কলার ছোট্ট মোচা তিন আনা দিয়েও পেলে আমরা ছাড়িনে। ব্যঞ্জনপ্রিয় বাঙ্গালীর পক্ষে এই দীর্ঘকাল ধ'রে নিরামিষ আলু মাত্র সার হলে চলে কি? তবু কুমড়ো ও কাঁচকলা মাঝে মাঝে দেখা দেয় তাই বেঁচে থাকা।

আমাদের সঙ্গের পাণ দিন পনের পরেই ফুরিয়ে গেছলো, কিন্তু পঙ্কদিদির পাণ দু' একদিন আগে মাত্র শেষ হয়েছে, পাণের অভাবে তিনি একেবারে মচ্ছিভঙ্গ হয়ে পড়েছেন। তোমাদের মেসো মশাই শুদ্ধ তাঁর দুঃখে একান্ত ম্রিয়মাণ। দেরাদূনে টেলিগ্রাম গেছে বদরীতে যেন পাণের পার্শ্বেল পাঠান হয়। এ দু'দিন তিনি আমারই পরামর্শে কচি অশ্বত্থ-পাতা পাণের মত করে সেজে খেয়ে দুধের সাধ ঘোলে মেটাচ্ছিলেন। মঠ চটিতে নাকি পাণ পাওয়া যায় শোনা গেছে, তাই ডাণ্ডি থেকে নেমেই ফণীবাবু মণিহারা ফণীর মতই পাণ খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন। আজ দুপুরবেলাতেও চমৌলীতে মায় তার উপরতলার কাছারীতে শুদ্ধ ভদ্রলোক এই পাণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। যাহোক এখন দেবতা ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে আর তোমাদের পাঁচজনের কল্যাণে চারটীখানি পাহাড়ী পাণ পাওয়া গিয়ে তোমাদের মেসোমশাইটীর মুখে একটুখানি হাসি দেখা গেল! তিনি বিলক্ষণ দাম দিয়ে যতটী পারলেন কিনে নিলেন। এ পাণ দেখতে ঠিক পাণের মত না হলেও খেতে প্রায় সেই রকমই।— অশথপাতার চাইতে ভাল। আমার জানা ছিল অশথপাতা, অশথ ছাল,

অশথের কচি মাঞ্জরী স্ত্রীরোগের মহৌষধ, তাই সেই ভরসায় এই পাতা খাওয়ার পরামর্শটা তাঁকে আমিই দিয়েছিলুম যে অন্ততঃ এতে উপকার ভিন্ন অপকার করবে না। আমার দাদাবাবু সংস্কার করে নেওয়া ভালবাসতেন, গতানুগতিকতা তিনি কোনও বিষয়েই পছন্দ করতেন না। কচি অশথপাতার এবং মুথাঘাসের ঘণ্ট একবার আমাদের বাড়ীতে রান্না হয়। এদুটী জিনিষই মানুষের শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী তাই তাঁর ইচ্ছা ছিল, এগুলি আমাদের নিত্যসেব্য মধ্যে গণ্য হয়। সেই সব স্মরণ ক'রে আমার পাণের অভাব পূরণ করতে এই অশথপাতার কথাই মনে পড়েছিল। এর সঙ্গে দারচিনি পাতা মিশিয়ে দিলে মন্দ হয় না। আমাদের চুঁচ্‌ড়োর বাড়ীতে দারচিনি গাছ ছিল, পাতা ছিঁড়ে খাওয়া— সে বোধ হয় তোমরাও খেয়েছ? কেদার-পথ দারচিনি, তেজপাতা, আখরোটের কচি পাতায় ঝলমল করচে। লালচে রংএর কচি জামপাতার মত অজস্র পাতাগুলির বাহার, অসংখ্য সাদা গোলাপের সঙ্গে সঙ্গে ভারি চমৎকার!

মঠ ছেড়ে আমরা আর এক মাইল দূরে ছিন্‌কা চটিতে চ'লে এলাম। স্থানটী বেশ খটখটে পরিচ্ছন্ন। দোকানগুলি দোতলা, দু'একটী আবার বেশ রংচঙে। কবাটও অনেকগুলির আছে। সামনেটী বেশ চওড়া, এর মধ্যখানে একটী বড়গোছের অশথ গাছ, তার তলাটী পাথরের বেদী ক'রে বাঁধান। কতকগুলি যাত্রী সেইখানেই খাওয়া দাওয়া ক'রে সেই খানেই রাত্রিবাসের জোগাড় করছিল। সন্ধ্যাবেলাতেই নির্মেঘ আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ দেখা যাচ্ছিল।

ছিন্‌কায় একটা পার্ব্বত্য বস্তুজাতের এজেন্সি গোছ আছে। এদেরই

উপর তলায় একটা আর নিচের তলায় একটা ঘর আমরা পেলাম। বেশ ঝরঝরে পরিষ্কার, চালে বা দরজায় মাথা ঠেকে না। শীতও এখানে কম। সন্ধ্যার পর সেই পাথরের চাতালে কিছুক্ষণ বসে থাকা গেল। প্রস্ফুট জ্যোৎস্নায় এবং মৃদুমন্দ দক্ষিণী বাতাসে শরীর মন যেন জুড়িয়ে গেল। অনেকদিন এদের এমন করে উপভোগ করতে পারা যায়নি। ভীমকান্ত পর্ব্বতমালাকে চন্দ্রালোকে যেন দৈত্যপুরীর নিদ্রিত প্রহরী-বৃন্দের মত শান্ত ভাবাপন্ন দেখাচ্ছিল। ক'দিন থেকেই কোকিল পাপিয়া বউকথাকওদের সাড়াস্মুড়ি পাওয়া যাচ্ছিল,—আজও পেলেম। পার্ব্বত্য-ভূমে এইবার নব বসন্ত দেখা দিচ্চে!

এখান থেকেই চামর, পশুচর্ম্ম, ভোট ও তিব্বতের কম্বল, বিশুদ্ধ অবিশুদ্ধ শিলাজিত, মমেরি, জহরমহরা প্রভৃতির প্রাচুর্য্য দেখা দিল। আমাদের দোকানদার আমাদের অশেষপ্রকারে বুঝাতে চেষ্টা করলে যে উপরে উঠলে আমরা এই সকল দ্রব্য আরও প্রচুর পরিমাণেই দেখতে পাবো, কিন্তু তার কাছে ছাড়া শিলাজিত আর কারু কাছে বিশুদ্ধ থাকা সম্ভবই নয়, অতএব আমরা যেন অনর্থক ঠকে না আসি ইত্যাদি।

ভোট কম্বল দশহাত লম্বা সাড়ে তিন হাত চওড়ার দাম ৪০৲ টাকা। কয়েকটা দেখালে, সে তেমন ভাল ঠেকলো না। শিলাজিতের ব্যবহার সম্বন্ধীয় একটা ছাপান ব্যবস্থা পত্র দিলে। দেখা গেল, এই ঔষধটী সর্ব্বরোগেই বিভিন্ন অনুপানের সঙ্গে মকরধ্বজের মতই সেবন করা যায়। ক্ষয়রোগ ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতির এ মহৌষধ, হার্টেরও টনিক। বিশুদ্ধ শিলাজিত ১৲ তোলা মাত্র। শিলাজিত পাথর খুব উঁচু নিরেট পাহাড়ের মাথার উপর জন্মায়, অনেক কষ্টে আহরণ করে আনতে হয়। দেখতে

কর্কশ ঝামার মত। এদের চূর্ণ ক'রে জলে ফেলে রোদের তাপে রাখতে হয়। তারপর খাঁটি দুধ, ত্রিফলার ক্বাথ, আরও কয়েকটী দ্রব্যের সঙ্গে মিলিয়ে ক্রমাগত ডাইলিউট করতে করতে যেটা তলায় বাকি থেকে যায় সেইটাই বিশুদ্ধ। আর আগুনের তাপে পাক ক'রে তৈরি কর অবিশুদ্ধ—সে নাকি খুব অপকারী। বিশুদ্ধ শিলাজিত ঈষ... ও হাতে নিয়ে দেখলে তার কালো রঙের মধ্যে থেকে লাল্‌চে আভা দেখতে পাওয়া যায়, তাছাড়া আর কিছু বুঝতে পারা যায় না।

এখানে ঘি ২।• সের, সরষের তেল ১।০ সের পাওয়া গেল।

পরদিন বুধবার মধ্যাহ্ন যাপনের ব্যবস্থা হলো পিপল কোঠীতে।

পূর্ব্বেই লিখেছি এদিকের পাহাড়গুলো রীতিমতই পাহাড়। ধূম্রায়মান, গভীর তরঙ্গমালা সদৃশ, অথবা সমুচ্চ গগনস্পর্শ-প্রয়াসী বিরাট বিকট দৈত্যের মতই স্পর্দ্ধাভরে চারিদিককে ঘিরে ফেলেছে। এদের নগ্নগাত্রে কোথাও আচ্ছাদন বস্ত্রের নাম গন্ধ মাত্র নেই, ক্বচিৎ কোনখানে এক আধটা ঝাউগাছ হঠাৎ সবুজের আঁক কাটার মতন সেই নগ্ন ধূসরতার মধ্যখানে হঠাৎ প্রকাশ পাচ্ছিল। কেবল চটির কাছাকাছি কলাগাছ এবং ক্ষেত খামার অল্প স্বল্প আছে। গ্রাম এপথে বড় একটা দেখাই যায় নি, খুব দূরে দূরে একেবারে খাড়া পাহাড়ের মাথার উপরে উপ... যেসব গ্রাম দেখা যাচ্ছিল, সেদিকে চাইতেই যেন ভয় করে। পাকদাণ্ডীর পথ দিয়ে কেমন করেই যে অত উঁচুতে মানুষে আসা যাওয়া করতে পারে, সে আমরা ভেবেই পাই নে! মনে হয় ওদের সঙ্গে এপৃথিবীর কোন সংস্রব থাকতে পারা সম্ভবই নয়। কিন্তু এক রকম তারা হয়ত আছে ভাল। অভাব তো সভ্যতার বিস্তৃতিতে বাড়ছে বৈ কমছে না, চারিদিকে অসন্তোষের

বহ্নিজ্বালা ছাড়া শান্তি কার কোথায় আছে? ওদের ক্ষুদ্র জগতে ওরা হয়ত সুখেই থাকে, ওদের জীবন পথের বাইরের জগতের সঙ্গে ওদের তো কোনই পরিচয় নেই।

পিপল কোঠী জায়গাটা বেশ বড়—অতবড় নামজাদা চমৌলীর চাইতেও মন্দ ঠেকলো না। তিব্বতী মালের এখানে খুবই আমদানী দেখা গেল। বাজার ভর্ত্তি নানারকম পশুচর্ম্ম, সুন্দর সুন্দর কুকৃরি ও কম্বল। আর ধবল চামরের রাশিতে যেন শরৎকালের কাশফুলের শোভা ধ'রে আছে। তাছাড়া শিলাজিত, জহরমহরার পাথর সবই পাওয়া যায়। এই পাথর গোলাপজলে ঘষে খেলে ও লাগালে ডয়েবিটিশ রোগীর ব্রণ কার্ব্বাঙ্কলে পরিণত হয় না। বাবা এটা খুবই ব্যবহার করতেন দেখেছ ত? তিব্বতের কাঠের বাটী, গালচে আসন, কম্বল, লুই প্রভৃতি অনেক সুন্দর সুন্দর বস্তুজাত দেখা গেল। এক খানা বাঘের ছাল প্রকাণ্ড বড়, দাম বল্লে ১৬০৲ টাকা, তবু ট্যান করা তেমন ভাল নয়। এসব জিনিষ এপথে কৈ তেমন সস্তা ঠেকলো না! যাই হোক এখন তো দেবদর্শনে চলেছি, ফেরার পথে তখন যা হয় কিছু দেখা যাবে।

এখানে খুব বড় বড় ফুলের পল্‌নীরো গোলাপের গাছ দেখা গেল। অন্য গোলাপ যেমন অজস্র ফোটে, এ তা' ফোটে না, এবং এতে গোলাপের নিজস্ব সুগন্ধ আছে।

পিপল কোঠীতেও তরকারীর মধ্যে সেই সনাতন আলু কুমড়ো—আর বেশি কিছু নেই, তবে অন্য জিনিষ অনেক আছে—যথা বাদাম, কিসমিস, মাঘনা মসলা, প্রায় সব রকম ডাল, মনোহারি দ্রব্যাদি।

যার যে টুকুর অভাব ঘটেছিল কেনা গেল। সহরে একটু জলের অভাব দেখলুম। দূরে দু'টী মাত্র কল, অথচ দুদিকের যাত্রীর ভিড় নেহাৎ কম নয়!

বৈকালে দু'মাইল এসে গরুড় গঙ্গা পাওয়া গেল। মধ্যে ছোট নদী, দু'পাশে ঘরবাড়ী দোকান পশার। দোকানে দোকানে জিলিপি ভাজা হচ্চে, নিম্‌কি, মিঠাই, পকৌড়ি, কচৌরি, সব কিছুই তৈরি হচ্ছিল।

নদীর উপরকার পুলটী বোধ করি কোনরূপ জখম হয়ে থাকবে, সেটিকে কাঁটাগাছের বোঝা ফেলে দুদিক থেকে বন্ধ করেছে। আর পাথরের উপর মোটা মোটা চেরা কাঠ ফেলে একটী নূতন পুল যাত্রীদের জন্য তৈরি হয়েছে। আমরা তাতেই নদী পার হলেম।

গরুড় গঙ্গায় স্নানদান করতে হয়। এবেলায় স্নান করতে ভরসা হলো না তাই স্থির হলো ফিরতি বেলায় হবে। রাত্রে এখানে কাটালেও এদেশে প্রাতঃস্নান তো সুবিধা নয়, এই ভেবে মাইল দুই আরও এগিয়ে যাওয়া গেল। পথে একটা আধ-মেরামতী পুলের উপর দিয়ে ভয়ে ভয়ে পার হলেম, অবশ্য সেটাকে পুলের চেয়ে সাঁকো বলাই অধিক সঙ্গত। মাইল দেড়েক হাঁটা গেল।

রাস্তা কি সুন্দর! আট দশ ফিটের ক' নয়। মাঝে মাঝে যেন ফরাসডাঙ্গার বারদোয়ারির গঙ্গার উপরকার দৌড়দার টানা দালানের মত। পাহাড়গুলি খাড়া এবং চায জমির অভাবে কেমন যেন একটু রুক্ষ মূর্ত্তি বটে, তবে পার্ব্বত্য শোভার এও এক নূতনতর সমাবেশ। পথে চলতে চলতে কত কথাই মনে পড়ছিল। মা বাবার সঙ্গে আজমীরের পাহাড় দিয়ে সাবিত্রী যাত্রার কথা এ যাত্রার মধ্যে বারে

বারেই মনে পড়ে। সে কি অনাবিল আনন্দেরই দিন ছিল! হিমালয়ের বক্ষে এসে বাবার অফুরন্ত উজ্জ্বল স্মৃতি মনের মধ্যে আরও যেন উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। সে দেখানো, শেখানো, বোঝানো—সে যে এবয়সেরও চির জীবনেরই প্রার্থিত! সে শক্তি সে অভিজ্ঞতা সে জ্ঞান আর কার আছে?

আরও মাইল খানেক এসে ঠংনী চটিতে রাত কাটান গেল। মামুলী চটি, তবে সর্ব্বত্রই দোতালার ঘর পাওয়া যাচ্চে, এই য স্থবিধে।

পাতাল গঙ্গা পার হওয়া গেল। ছোট্ট পুল, স্প্যান পঞ্চাশ মাত্র গোলাপ কুঠীতে বিশ্রাম নিয়ে কুমার চটিতে ডেরাডাণ্ডা গাড়া হলো।

স্থানটী মন্দ নয়, উপর তলার তু'খানা বড় বড় ঘর বারান্দা পাওয়া গিয়েছিল। সামনেই খাবারের দোকান, মিষ্টরসপ্রিয় ফণীবাবু গরম জিলিপির খবর নিতে ভুল্লেন না। কিন্তু তুর্ভাগ্যক্রমে তখন জিলিপির পরিবর্ত্তে তাঁকে গৃহজাত নিমকি গজা দিয়েই কাজ সারতে হল।

দোকানদারটার কাছে যতটুকু পারি প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাস আদায়ের সন্ধান করে এলুম। কিছুই খুঁজে পাইনে! নূতন কথার মধ্যে দোকানী জানালে যে ডেপুটী কমিশনার এবং ইঞ্জিনিয়ার সাহেবদ্বয় টুরে বেরিয়ে খুব শিকার ক'রে বেড়াচ্চেন। সেদিন খুব বড় একটা বরাহের পাঠিয়েছেন, হয়ত পথে আমরা দেখে থাকবো। (তা কিন্তু আমরা দেখিনি।) আরো সে বল্লে যে সাহেবেরা প্রায়ই জোশিমঠের উপর চ মাইল গিয়ে যে বন আছে তাতেই শিকার করে আসেন। তপোবন নামক স্থান সেই পথেই। আমার অভিজ্ঞান শকুন্তলের সেই দৃশ্য

মনে পড়ে গেল—রাজা দুষ্মন্ত হরিণ শিকার করতে উদ্যত হয়ে ধনুকে জ্যা আরোপিত করেছেন, এমন সময় নেপথ্যে শব্দ শোনা গেল "ভো ভো রাজন্ ! আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ।"—এখনকার দুষ্মন্তরা কি এ অনুজ্ঞাপালন কর্ব্বেন ?

দোকানী বল্লে, "আপনারা সেখানে যেতে পারবেন না, ওদের বলবুদ্ধি ভরসা সবই বেশি। অবশ্য এদেশী গাইড ও 'হেল্পার' ব্যতীত ওসব পথে যাবার উপায় নেই তাও ঠিক। টুরিষ্ট সাহেবেরা যেখানে যায়, তাঁবু ফেলে, সঙ্গে পাহাড়ী থাকে, অনেক দুর্গমস্থানে যেখানে কোন ভারতবর্ষীয় কোন দিন পা ফেলেনি, ওরা সেসবখানে অনায়াসেই চ'লে যায়। ফটো তোলে, ম্যাপ আঁকে,—আমরা সেসব দেখে শুনে হাঁ করে চেয়ে থাকি।"

লোকটী ঠিকই বলেছে। গতবর্ষেও চার জন ইউরোপীয় এভারেষ্টে ওঠবার চেষ্টা করেছিলেন। দু'জনের সেই অখণ্ড তুষাররাশিতেই চির-বিশ্রামলাভ ঘটলো, দু'জনে ২৩ হাজার ফিট উঠে বিজয়ীর আনন্দ নিয়ে ফিরে এলো। আর আমরা মোটে ১৩ হাজার ফিট কেদারে উঠে শ্বাসকষ্টে আধমরা!—তবে কথা এই, ওরা এর জন্যে রীতিমত তৈরি হয়ে আসে। বুকে পিঠে অক্সিজেন সিলিণ্ডার বাঁধা থাকে। আর তার উপর ভরসা—সে ত বটেই! দুর্দ্দমনীয় বেগবান উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকলে কি আর মানুষকে দিয়ে জাতিকে দিয়ে অমন সব অসাধ্য-সাধন করিয়ে তুলে সমস্ত পৃথিবীময় বিজয় কেতন উড়িয়ে দেওয়াতে পারে? এইটের অভাবেই না মানুষ নিরীহ নিস্পৃহ, একটা মনগড়া বৈরাগ্যের কাঁথা মুড়ি দিয়ে জীবনটাকে কোন প্রকারে শেষ করে ফেলে

ঢুকিয়ে দিয়ে চলে যায়। ক্লাইভের মনে যদি ভরসা ও উদ্দাম উচ্চাকাঙ্ক্ষার এতটুকু অভাব থেকে যেত, তাহলে কি আজ ভারতের তপোভূমি ইউরোপীয়ের শিকারক্ষেত্র হতে পারতো? দেখতে শুনতে ভোগ করতে এবং পরকে দুর্ভোগ করাতে ওরাই জানে ওরাই শিখেছে। আমরা শুধু কূপমণ্ডূকের মত নিজের নিজের নির্দ্দিষ্ট কোটরটীর মধ্যে স্থায়ী হয়ে মিটমিট্ ক'রে চেয়ে থাকবো এবং হয় ওদের খুব তারিফ দেবো, না হয় ক্ষেপে নিন্দে করবো। আমরা বেঁচে থাকার কোন অর্থ আছে মনে করাকেও লজ্জাবোধ করি। হাঁচতে কাসতে আমরা আমাদের অক্ষমতাকে ঢাকা দেবার জন্যে আধ্যাত্মিকতার দোহাই পেড়ে মোহ-মুদ্গর আওড়াই এবং বেঁচে থাকবার একমাত্র উদ্দেশ্য বুঝে রেখেছি যেন তেন প্রকারেণ দিনপাত করা। যারা বাঁচতে জানে ভগবান তাদেরই বাঁচতে দেন অথচ আশ্চর্য্য এই যে বৈরাগ্যময় বিরক্ত নিস্পৃহ আমাদের চেয়ে মরণকে দিব্য সহজ হাসিমুখে ওরাই বরণ করেও নিতে পারে। এই যে সব বিপদ-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়া এর মধ্যে কি কিছু কম বীরত্ব, না মরণকে তুচ্ছ করবার শক্তি বড্ডই কম বোঝায়?—যতই ওদের নিচু ক'রে নিজেদের বাড়াতে চেষ্টা করি, কোন দিক দিয়েই তার পথ যেন খুঁজে পাওয়া যায় না! অথচ আমরা অনুকরণ করি ওদের এমন কয়েকটী বিশেষ জিনিষকে, হয়ত ওদের মধ্যে ঐ কয়টীর শুধু অনুকরণ না করবারই মতন।

একঘেয়ে আলুর কাণ্ড আর যার যাই হোক, পঙ্কুর আর সইছেনা সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে! অবশ্য এরই মধ্যে রকমফেরও চলেছে। শাকশুক্তো ঝোল চপ্ কাটলেট কোর্ম্মা কালিয়া সবই হচ্ছে, কিন্তু

চারবেলার খাবারে প্রধান অংশ নিয়ে রেখেছেন সেই আলুই তো। ডালবাটা ধোঁকা কচুরি কুল আমচুরের অম্বল পুদিনার চাটনী আমলকা কাঞ্চন কুঁড়ির আচার—এসবও পর্য্যায়ক্রমে চলছে, কিন্তু কেদারের ধাক্কার সেই অরুচি ও গা বমি ভাব, সেটা যেন আর যেতেই চাইচে না। তার দুর্ভোগ অল্প বিস্তর সবাই ভোগ করচে। আসল কথা মৎস্যাশী বাঙ্গালী এই দীর্ঘদিনের তপস্যার মধ্যে আর সব যদি বা সইতে পারচে, কিন্তু নিরামিষ খাওয়াটাকে আর যেন বরদাস্ত করতে পারছে না। আমাদের দলের মধ্যে অবশ্য নিরামিশীর সংখ্যাই বেশি, এ বিষয়ে ভোট নিতে গেলে তাঁদেরই জয় হবে।

তা তাঁরা একরকম দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় রয়েছেন ভালই, কোন ঝঞ্ঝট নেই। আশা থাকলেই আকাঙ্ক্ষাও থাকে। এই দেখে শুনে ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলে গেছেন,—

—"সুখদা,—নিরাশা।"

দুপুর বেলা বিশ্রামের বড় বেশি অবকাশ ঘটলো না। খাওয়া দাওয়ার পরই একটা হাওয়ার ঝাপ্টা এসে অদূরবর্ত্তী উনানের আগুন খানিক উড়িয়ে নিয়ে এলো। সেই একটী ক্ষণের উড়ে পড়া কয়েকটী ফুল্‌কিতেই অনেক কিছু ঘটিয়ে দিলে কারু শাড়ী, কারু ছাতা, কারু কম্বল, কারু মটকার চাদর, কারু বা বিছানার চাদর পুড়ে গেল। পাছে কাঠের ঘরে আগুন লাগে সেই ভয়ে আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুল্লে। জল ঢেলে তুলারাম তক্ষণই আগুন নিবিয়ে দিলে।

চারটের সময় বেরিয়ে পড়া গেল। ১৯শে মে বৃহস্পতিবার তিন

মাইল আসার পর খনোটী চটিতে কুলির[illegible] [illegible]শ্রাম করতে বসে পড়লে, পায়ে হেঁটেই বেরিয়ে পড়লাম। এ[illegible] [illegible]প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন পথ, এমন মেঘচ্ছায়া বিজড়িত ক্ষণ রৌদ্রচ্ছা[illegible] [illegible]কিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল অপরাহ্ণে, এই নির্ম্মল পার্ব্বত্যভূমে পথ চলায় [illegible] [illegible]কি আনন্দ! নির্জ্জন যদিও আর একে বলা চলে না—বদরীনাথের [illegible] যাত্রীদের দ্বারায় এপথ প্রায়ই কোলাহল মুখরিত হয়ে থাকে। দলে [illegible]লে যাত্রীদল মহোৎসাহে নেমে আসচে। কেদার থেকে যাদের নেমে আসতে দেখেছিলেম, তাদের অনেকেরই সঙ্গে দেখা হলো। আমরা একটু বিশেষ আস্তে চলেছি। দেবপ্রয়াগে আমাদের যারা সহযাত্রী ছিল, কেদার পৌঁছে তাদের সেখান থেকে ফিরতে দেখেছি।

আমাদের চলা কম হয়, বিশ্রাম বেশি হয়, চাকর বাকর কুলিদলের নিত্য নিত্য রোগটীও লেগেই আছে—একে দীর্ঘপথ, বিঘ্নও অনেক রকম।

খানোটীর পর হইতেই ধোঁয়ার মত ধূম্র খাড়া পাহাড়গুলো একটু ভদ্র ভাব ধারণ করতে আরম্ভ করেছে দেখছি! পাহাড়ের গায়ে গায়ে চাষের জমি এবং ছোট ছোট গ্রামও ই[illegible]স্ততঃ দেখা দিতে লাগলো। সেই সাদা গোলাপের রাশি, সে[illegible] ফের এদিকে এসে দেখা দিয়েছে!—"বসন্ত না আসিতেই আগে আসে দক্ষিণ পবন।" —এ যেন সবাই মিলেই বলতে সুরু [illegible]রে দিয়েছে,—এসেছে—আর দেরি নেই গো, আর দেরি নেই! সবাই মিলেই যেন সমান ভাবে, সমান লয়ে, সমস্বরেই উচ্চারণ করে উঠ্‌লো,—"এসেছে, এসেছে—যাঁর জন্য তোমাদের এই অভিযান, তাঁর পথের রেখা,—তাঁর পায়ের চিহ্ন

—ঐ দেখ তোমার চোখের সামনে ধরা দিয়েছে!—আর দেরি নেই —আর দেরি নেই।"

আঃ, যেখানে এই শস্যভারাকুলা শ্যামা পৃথ্বীমায়ের মোহিনী মূর্ত্তি চোখে পড়ে, প্রাণ জুড়িয়ে যায়। আমরা যে—সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা মাতৃমূর্ত্তি দেখতেই অভ্যস্ত। মাকে রুক্ষকেশী রুদ্রবেশী দেখলে প্রাণ যেন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায়, মনে সুখ থাকে না।

জোশি মঠের যতই কাছাকাছি হচ্চি, লাল গোলাপী গোলাপের বাগান আর সেই সাদা গোলাপের লতার আমদানি ততই বাড়ছে! গ্রামও খুব ঘন ঘন এবং বেশ বড় বড় বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামও দেখতে পাওয়া যাচ্চে। বাহ্য লক্ষণে এবং কল্পনায় মিলিয়ে জোশিমঠকে বেশ একটী সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিদ্যাপীঠসমন্বিত আদর্শ নগরী রূপেই গড়ে রাখলেম। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের প্রতি আমার শ্রদ্ধা সে হয়ত আমার জ্ঞানোন্মেষাবধি। তাঁর সম্বন্ধে যেখানে যা পেয়েছি খুব ছোট বেলা থেকেই গ্রাস করে রেখেছি। তাঁর প্রধান চারি মঠের মধ্যের প্রথম মঠ,—আচ্ছা এ নিয়ে একটা কিছু লিখিলেও তো মন্দ হয় না! শৃঙ্গেরীমঠ নিয়ে আমার বিদ্যারণ্য নাটক আছে, এবার জোশিমঠ নিয়ে কোনও একটা নাটক লিখলে হয়।

আচ্ছা আগে ত দেখেই আসি কি ব্যাপার! কত শত শত বর্ষের কত জ্ঞান ধর্ম্ম বিদ্যার সমাবেশে কত মহত্তম ও বৃহত্তম ব্যাপারের আয়োজনে না জানি এ কতই আশ্চর্য্য দর্শন হবে!

রাত্রে জোশিমঠ থেকে মাত্র তিন ফার্লং দূরে ঝরকুল্লায় এক দোকান বাড়ীর দোতালার উপর বাসা নেওয়া হলো, যেহেতু মহীপৎ

উত্তরাখণ্ডের পত্র

জোশিমঠ থেকে ঘুরে এসে এই বাসাটী আমাদের জন্যে ঠিক করে রেখেছিল। উপরের ফেরৎ যাত্রীর ভিড়ে জোশিমঠে নাকি আমাদের বাহিনীর উপযুক্ত জায়গা নেই।

বাসাটী মন্দ নয়। উপরেই রান্নাঘর, পাশে একটা পাহাড়েরই পাথরের ছাদ, আর পাঁচিল দিয়ে ঘেরা জায়গায় জলের কল আছে। এদিকে যেমন ঝরণার সঙ্গে পাইপ বসিয়ে কল করা হয় সেই রকমই —খুব মোটা ধারার জল চব্বিশ ঘণ্টাই আছে। এর পাশেই একজন কলিকাতাবাসী ধনী শেঠের সুন্দর ও সুরক্ষিত গোলাপ বাগ। এই ফুল না কি প্রত্যহ বদরীনাথের পূজার জন্য এখান থেকে প্রেরিত হয়। এই বাড়ী ও দোকান এও ঐ শেঠজীরই কৃত।

রাত্রে জোশিমঠে পৌছিতে না পারায় মনটা কিছু ক্ষুণ্ণ হয়ে রইলো। উষিমঠ দেখে বিশ্বাস হয়েছিল, উষিমঠ যখন অমন, জোশিমঠ নিশ্চয় আরও কত বড়! ঠাকুর দেবতা সাধু সন্ত না জানি কতই সেখানে আছেন! শিব শিব ব্যোম্ ব্যোম্ রবে হয়ত সেখানের বাতাস আকাশ মুখরিত হয়ে রয়েছে! যজ্ঞীয় হোমের গন্ধে ধূমের সুবাসে, এই সন্ধ্যাবেলায় আরতি প্রদীপের আলোয় ও ঘণ্টা কাঁসরে না জানি কতই সুপবিত্র সৌন্দর্য্যের সমাবেশ হয়ে উঠেছে, দর্শকদলের শ্রদ্ধাবদাননত চিত্ত মর্ত্ত্যভূমির উর্দ্ধলোকে বিচরণ ক'রে বেড়াচ্চে!— আর আমরা কিছুই দেখতে পেলেম না—পথের ধারে শুধু শুধু পড়ে রইলেম।

মহীপৎটার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই! নাই বা ভাল বাড়ী পাওয়া যেত। ভাল বাড়ীর আশা করে তো আর আমরা এতদূরে ছুটে আসিনি!

উত্তরাখণ্ডের পত্র

শ্রীমান্ অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কল্যাণবরেষু

"ততঃ ক্রোশদ্বয়ে পুণ্যং জ্যোতির্ধামশুভপ্রদং।
নৃসিংহরূপী ভগবান যত্রাস্তে মুক্তিদায়কঃ॥"

সকালে পায়ে হেঁটেই আমরা সেই জোশিমঠ বা জ্যোতির্মঠে প্রবেশ করলাম। আমাদের যান বাহন আমাদের সঙ্গে এলো। কিন্তু জোশিমঠে পৌঁছে মনটা একেবারেই হতাশার চরমে পৌঁছে গেল। এই কি সেই চিরবিখ্যাত, ভগবান শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষের সুপ্রসিদ্ধ চারি বিদ্যাপীঠের প্রধানতম জ্যোতির্মঠ? অত সকালে দোকান-পশার তখনও সব খোলা হয় নি। নাই হোকগে, তবু তাদের আকার প্রকার থেকেই তাদের অবস্থার বিষয়ে যতটা জানতে পারা গেল, সে খুব আশাপ্রদ নয়। সহরে বাড়ীঘরের সংখ্যাও তথৈবচ! হরি হরি! এই জোশিমঠ! এস্থান গন্ধমাদন পর্ব্বতের দ্বারদেশে ব'লে কথিত আছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এর উচ্চতা পাঁচ হাজার ফিট। এখন এই জ্যোতির্মঠের শঙ্করাচার্য্য ব'লে কেউ নেই। বদরীনাথের রাওল সাহেব শীতকালে বদরীধামের মন্দির বন্ধ হলে এইখানে এসে বাস করেন। এখন তিনি বদরীধামে গিয়েছেন। উখীমঠের রাওল-প্রাসাদের মত এখানে জমকালো প্রাসাদ-ভবন নেই, ঘর বাড়ী সবই সাধারণ। পুরাতনকালে বদরীনাথের তরফ থেকে তৈরি করা ধর্ম্মশালা ও মন্দির যা আছে, এখন তাকে আর ধর্ম্মশালা বলা চলে না। তাতে দোকানদারেরা তাদের দোকানে যারা সওদা করবে তাদেরই থাকতে দেয়। পূর্ব্বপদ্ধতি অনুসারে বদরীনাথের অর্থ হতে নৃসিংহ মন্দিরে কিছু অন্নাদি ভোগ ব্যবস্থা ছিল, সেই প্রসাদ "সদাব্রত" করা হতো, এখন তা' নেই, এখন সেই ভোগ আর সদাব্রত করা হয় না, পূজারী

এবং তাদের সম্পর্কিতগণই সে সব গ্রহণ করে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমেদাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দশঙ্কর বেণী বদরী যাত্রাকালে এখানে এসে এর এই সব দুর্দ্দশা দেখে কালী কম্লীর দ্বারায় একটী ধর্ম্মশালা এবং যাত্রীদের জন্য সদাব্রতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জোশিমঠে সরকারী ডাকখানা, তারঘর, ঔষধালয়, কুলী এজেন্সি আছে। এখান হতে সোজা পথ নীতিপাশ হয়ে তিব্বত যাত্রা করায়, অন্য একটী রাস্তা বদরীর দিকে গিয়েছে। এখান থেকে বদরী ১৮ মাইল, হরিদ্বার ২১৬ মাইল, কোটদ্বার রেলষ্টেশন ১২৭ মাইল, রামনগর রেলষ্টেশন ১৪৬ মাইল।

প্রধান মন্দিরে নরসিংহ মূর্ত্তি, অন্যত্র লক্ষ্মী দেবী আছেন। বাইরে একটী পাষাণ চত্বরে এঁদের বাহন গরুড়টী প্রচুর বস্ত্রালঙ্কারে সেজে গুজে ব'সে ব'সে পয়সা আদায় করচেন।

উখী মঠে তবু যেমন হোক একটা সংস্কৃত পাঠশালা ও একটা ভার্ণাকুলার স্কুল স্থাপিত হয়েছে, এখানে ওসবের আপদ বালাই কিছুই নেই!

শঙ্করাচার্য্যের জীবনীতে লিখিত আছে যে এই স্থানেই ভগবান শঙ্কর বেদব্যাসের দর্শন লাভ ও ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য তাঁর উপদেশ প্রাপ্ত হন। তাঁরই উপদেশ অনুসারে ভারতের চার প্রান্তে তিনি চারটী মঠ স্থাপন করেন। ঐ মঠের মধ্যে উত্তরে জ্যোতির্মঠ, দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠ, পূর্ব্বে পুরীর গোবর্দ্ধন মঠ, এবং পশ্চিমে কাশ্মীর রাজ্যে সারদা মঠ প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক নিজের প্রধান প্রধান শিষ্যবর্গের হাতে এদের সমস্ত ভার অর্পণ করেছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের পর বহুকাল ধ'রেই এই মঠ-চতুষ্টয় খুব ভাল ভাবেই চলেছিল। এদের অধ্যক্ষগণ শঙ্করাচার্য্য নামেই প্রসিদ্ধ এবং সাধারণ্যে

পূজিত হয়ে এসেছেন। আজও অন্য তিন মঠে এই নিয়মই চ'লে আসচে, কেবল জ্যোতির্মঠ যা ভগবান শঙ্কর সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করেন, সেই মঠটীই করাল কালের সর্ব্বধ্বংসী কঠোর কবলে পতিত হয়ে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। শেষ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যরহিত হয়ে মৃত্যু হবার পর দুরাচারের কবলে পড়ে নষ্ট ভ্রষ্ট হয়েছে। যেখানে প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ এবং ধর্ম্মাচার্য্যগণের নিবাস ছিল এখন সেখানে সে সবের ভগ্নাবশেষ মাত্র পতিত আছে।

শেষ শঙ্করাচার্য্যের দেহাবসানের পর কিছুকাল এই স্থানে কত্তুরী জাতির অধিকার স্থাপিত হয়। তার পর গড়বাল রাজের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হলে মহারাজ গড়বাল একবার এই ধর্ম্ম মঠকে পুনঃসংস্কৃত করতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি পাণ্ডুকেশ্বর নিবাসী বদরীনাথের পুরোহিতের হাতে জ্যোতির্মঠ প্রদান ক'রে তাঁকে এইখানেই বসবাস করতে অনুরোধ করেন এবং অনেক জমিজায়গীর দেবোত্তর ক'রে দিয়ে ঐ বদরী পুরোহিতকে এই প্রদেশের সমস্ত মন্দিরাদির প্রধান অধ্যক্ষরূপে 'রাওল' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ঐ সময়ের পূজারী দণ্ডীস্বামী অত্যন্ত সাধুশীল এবং বৈরাগ্যযুক্ত মহাত্মা লোক ছিলেন, তাই জোশিমঠের নাম একবার আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তাঁর জীবিতকাল অবধি জোশিমঠ পুনশ্চ বিখ্যাতি লাভ করেছিল। তারপর কালের স্রোতে দণ্ডীস্বামী গত হলেন। গড়বালরাজের হাত থেকে উত্তরাখণ্ডের এই অংশ—এই প্রধান অংশই—ইংরাজরাজের হাতে চলে এল। বিধর্ম্মী গবর্ণমেন্ট ধর্ম্মকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন না, এই সুযোগকে বর্ম্ম ক'রে নিয়ে রাওলেরা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলো। দণ্ডধারণ ত্যাগ ক'রে ব্রহ্মচারী রাওল অসবর্ণা স্ত্রীকে প্রথমে গুপ্তভাবে পরে প্রকাশ্যেই গ্রহণ করলে। মন্দিরের যে

বিপুল সম্পত্তি ধর্ম্মকার্য্য, পূর্ত্তকার্য্য, বিদ্যা ও অন্নদানাদির জন্য উৎসর্গিত, তাই দিয়ে আপনাদের ভোগবিলাস এবং অসবর্ণা স্ত্রীর সন্ততিদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কাযে লাগাতে লাগলো। এই প্রকারে বেদব্যাসের তপস্যা-ক্ষেত্র, শঙ্করাচার্য্যের সংস্থাপিত জ্যোতির্ম্মঠ পীঠ, পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে পড়ল।

সম্প্রতি শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের দৃষ্টি এই দিকে পতিত হয়েছে। তাঁরা এই পুণ্যভূমির জীর্ণোদ্ধারপূর্ব্বক, যজ্ঞশালা ধর্ম্মশালা মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাবেন শুনলেম। অর্থাভাবে কায অগ্রসর হতে পারচে না। যাঁরা ভারতের এই মহাতীর্থের উদ্ধার কামনা করেন, যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করতে ইচ্ছা করলে ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল, বেনারস, ঠিকানায় পাঠাতে পারেন।

শ্যামপ্রস্তরনির্ম্মিত নৃসিংহ মূর্ত্তিটী দর্শনীয়। এখানের পূজারীও রাওলের স্বদেশী। দক্ষিণী-ব্রাহ্মণ, পঞ্চদ্রাবিড়ী থেকেই নিযুক্ত হন। রাওল সাহেব নিজেই এঁদের নিযুক্ত ক'রে থাকেন। পূর্ব্বে এঁরা ব্রহ্মচারী হতেন, এখন রাওলের দেখাদেখি ভ্রষ্টাচারী ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে থাকেন।—

নৃসিংহ মন্দিরের কিছু দূরে বাসুদেবের বিশাল মূর্ত্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। এর সঙ্গে সংসৃষ্ট অপর মন্দিরে নবদুর্গা দেবী প্রতিষ্ঠিতা। এই মন্দিরের পূজারীও দক্ষিণী ব্রাহ্মণ।

বর্ত্তমান জোশিমঠের অর্দ্ধমাইল পশ্চিমে একটু চড়াই উঠে দুটী জীর্ণশীর্ণ মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। ঐ মন্দির দুটী "জ্যোতিশ্বর মহাদেব" এবং "ভক্তবৎসল ভগবান" এর। পুরাকালীন জ্যোতির্ম্মঠ এই স্থানেই ছিল, এখন ঐ দুটীই পুরাতনের শেষ চিহ্ন। ঐ মন্দিরে

পূজাদির কোন ব্যবস্থাই নেই, মাসে একবার সংক্রান্তির দিনটীতে মাত্র নৃসিংহ মন্দির থেকে কিছু পূজাদ্রব্য নিয়ে কোনও ব্রাহ্মণ এসে পূজা করে যান শুনলেম।

জোশি মঠ থেকে আমরা নীতিপাসের পথ ছেড়ে বদরীর রাস্তা ধরলেম। এতদিনের সেই সুনির্ম্মিত সুসংস্কৃত সুপ্রশস্ত রাজপথ ধীর বক্রগতিতে নীতিপাসের দিকে চ'লে গেল। ঐ পথে তিব্বত চীন প্রভৃতির সঙ্গে বাণিজ্য চলে এবং তাদের উপর কড়া পাহারা রাখা হয়। তারই জন্য অমন আট দশ ফুট চওড়া রাস্তা ঐ দুর্গম পাহাড়ের বুক চিরে তৈরি হচ্চে, নিত্যই তাকে সংস্কার করা হচ্চে, —নৈলে এ কি তীর্থযাত্রীর জন্যে? রাস্তা যখনই ভাগ হয়েছে তখনই বুঝেছিলাম। পথে প'ড়ে আর চক্ষুকর্ণের বিবাদ রইলো না। পথ স্থানে স্থানে খুব সঙ্কীর্ণ, ভাঙ্গা চোরা, জায়গায় জায়গায় তা' মেরামত হচ্চে, কোথাও বা তাও হয়নি। সর্ব্বত্র রাস্তাও নেই, এবড়োখেবড়ো মোটা পাথর ছড়ানো। অনেকবার ডাণ্ডি থেকে নামতে হলো, সঙ্কীর্ণ বা সঙ্কটময় স্থানে ডাণ্ডি থেকে নেমে চলাই নিরাপদ। তাছাড়া কুলীদেরও ওসব স্থানে কাঁধে বোঝা নিতে খুবই কষ্ট হয়, এই উভয়পক্ষীয় অসুবিধা দূর করবার উপায় পায়ে হাঁটা। ওদের কষ্ট দেখে মাইলের পর মাইল ঠায় ডাণ্ডি চ'ড়ে ব'সে থাকতে কষ্ট হয়, নিজের অক্ষমতা ভুলে না গিয়ে পারা যায় না। আমাদের দলের সকলেই অল্প বিস্তর হাঁটতে আরম্ভ করেছেন। এবছর বরফের জন্যে এখনও নীতিপাসের রাস্তা বন্ধ। বরফ কিছু গ'লে গেলে ঐ পথ মুক্ত হবে, এবং তখন তিব্বত ও ভোট থেকে দলে দলে ব্যবসাদাররা এদিকে

আসবে। তিব্বতে বিদেশীর প্রবেশ নিষেধ, তবে আজ কাল ঘড়ি এবং সৌখীন দ্রব্য সব ঘুষ দিয়ে দিয়ে খানিকটা পর্য্যন্ত কেউ কেউ যায় অবশ্য লুকিয়ে চুরিয়ে।

বিষ্ণুপ্রয়াগে স্নান আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কি ভীষণ মূর্ত্তিই এই সঙ্গমস্থলের! এঁকে স্থিতিশীল বিষ্ণুনাম না দিয়ে 'মহারুদ্র' নাম দিলেই খাপ খেতো। কার সাধ্য ঐ গর্জ্জনশীল উল্লম্ফনশালী ফেনপুঞ্জ পরিশোভিত সলিল রাশির দিকে চেয়ে থাকে! পুল পার হবার সময় চোখে পড়লো ধৌলির বা বিষ্ণুগঙ্গার জল ঘোলের মত ঘোলাটে, আর অলকানন্দার শ্বেতফেনরাশিবিমণ্ডিত শুভ্রবর্ণ জলরাশি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের বাধা প্রাণপণ বলে ঠেলে ফেলে দিয়ে উন্মত্তের মত দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্যবৎ ছুটে আসচে। দুজনের দুই দিক হতে গভীর কলরোলে ভীষণ গর্জ্জনে গান চলেছে! জল চক্রাকারে সঘনে মথিত হচ্চে—ভয়াবহ দৃশ্য!

ক্ষুদ্রকুটীর গৃহে বিষ্ণুমূর্ত্তি।

প্রমথ বিশ্বাস নামে একটী বাঙ্গালী ছেলের সঙ্গে দেখা হলো। তোমাদের লিখেছিলেম এখানে আসবার আগে দেরাদূনের বাঙ্গালীরা মিলে আমায় তাঁদের সাহিত্যসভায় একটা অভিনন্দন দান করেন। সে সময় কুম্ভ মেলা এবং গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে বাইরের বাঙ্গালীও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি পীযূষকান্তি ঘোষ মহাশয়ের অভিভাষণের মধ্যে এই ছেলেটীর নাম উল্লিখিত হতে শুনে ছিলাম, আরও শুনেছিলাম, ইনি পায়ে হেঁটে বোম্বাই থেকে কুম্ভ স্নানে এসেছেন, এবং গঙ্গোত্রী হয়ে বদরী যাত্রা করবেন।

ছেলেটী আমাকে আমারই সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন, অর্থাৎ আমার এপথে আসার কথা ছিল এসেছি কিনা? তারপর বল্লেন, "সেদিন সেই একবার দেখেছিলাম, কিন্তু মনে হচ্ছে, আপনিই তিনি।"

এঁর কাছে গঙ্গোত্রী পথের যে সংবাদ পাওয়া গেল, তাতে মনের আশা মনের মধ্যেই পুনশ্চ লয় পেলে। ঐ পথ থেকে ত্রিযুগী নারায়ণ দিয়ে (গড়বাল ও বৃটিশ সীমা দিয়ে) কেদার যেতে ইনি এক জায়গায় ৮ মাইল সমানে চড়াই পেয়েছিলেন। বরফ নাকি কেদারের চেয়ে অনেক বেশি। জুটো চটি বরফের ভিতর ঢেকে আছে। তা ছাড়া গঙ্গোত্রী আবার কেদারের চাইতে উঁচুতেও বেশি। সে সব অবশ্য বারান্তরের কথা, সঙ্গত মতন প্রস্তুত হয়ে এলে এর পরে যদি কখনও হয়। এখন তো যে পথে চলেছি তারই কর্ত্তব্য শেষ হোক।

ফটো সংগ্রহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন, কিছুই পাননি। সে হিসাবে বরং আমি ত কিছু পেয়েছি। আমাদের যে ক্যামেরা না এনেই সব মাটী হয়েছে! কত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য সব রয়েছে তোলবার মতন। এসময়ে কোনো ফটোগ্রাফার কেনই যে এ পথে ফটো তুলতে আসে না! এলে নিশ্চয়ই খুব বিক্রি হয়। অনেকেই ত ফটো খুঁজছে। ছবি থেকে তোলা ফটো, তাই লোকে কিনচে, অন্য কিছু না পেয়ে।

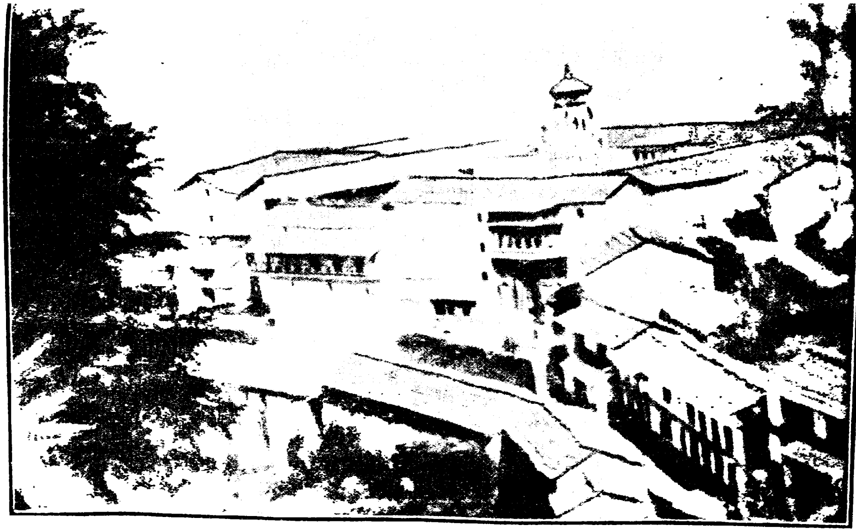
রাস্তা প্রথম কতকটা বেশি খারাপ, তারপর নেহাৎ মন্দ নয়। এপথ কেদার থেকে ফেরার সময় যে জঙ্গলের পাথুরে পথ পেয়েছিলাম সেই ধরণের। অনেক জায়গায় থাক থাক শ্লেট পাথরের সিঁড়ি

গোছের এলোমেলো পথ। এরকম পথগুলো প্রায়ই সমতলের মধ্য দিয়ে বা কম বরফের উপর দিয়ে হয় তাই রক্ষা!

ওদিকে মাঝে মাঝে ভাল তৈরি রাস্তাও পাওয়া গেছে সে রাস্তা সেই খাড়া পাহাড়ের নৈবেদ্য বাড়া ও দু'দিকের দুটো প্রকাণ্ডাকার পাহাড়ের চাপে ভীতা দীনা মলিনা, সঙ্কীর্ণা, অলকানন্দার তীরে তীরে। পাহাড়গুলোর আকার নানা প্রকারের। কোনটা বিশ্বম্ভরের বিরাট জঠরের উপযুক্ত ভোগ-নৈবেদ্যের মতই উচ্চচূড় হয়ে উঠে গেছে। কোনটাকে দেখলে মনে হয় মিসরের একটা পিরামিডকে টেনে এনে তার আয়তন আরও খানিকটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এক একটার বৌদ্ধস্তূপের আকার। কোনটার মাথার উপর দিয়ে হাজারটা ছোট বড় চূড়া উঠে যেন একটা বিশাল দুর্ভেদ্য দুর্গের গম্বুজের মত দেখাচ্চে! এদের দেখে স্কটের লেডি অব দি লেকের বর্ণনাগুলো মনে পড়ছিল,—

"The rocky summits split and rent,
Form'd turret, dome or battlement
Or seem'd fantastically set—
With cupola or minaret."

কিন্তু এই শুষ্করুক্ষমূর্তি পাহাড়গুলোর বংশোলীন পথটার উপর দিয়ে যাবার সময় আমার মনটা যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে থাকে, এ আমি বারে বারেই অনুভব না ক'রে পারি না। এ পথের পর আরণ্যপথ এলে, যতই তা দুরারোহণীয়ই হোক, তবু মনের উপর তার শ্যামলতার ছায়াপাত না হয়ে যায় না। শ্যামে ও শ্যামায় ভক্তি



উখিমঠ

শ্রীকেদারনাথ যাত্রী

ঙ্গালীর অস্থিমজ্জাগত ব'লেই কি এরকমটা হয়? না "বঙ্গভূমি-
মাঙ্গিনীর" সঙ্গে যুগ যুগের চিরসম্বন্ধে সংবদ্ধ বলে? অথবা সব
টাতেই মিলে আমাদের মনের মধ্যে একটী স্থর বেজে ওঠে—মন
নতে থাকে,—

তাই শ্যামরূপ ভালবাসি,
নয়ন মুদিয়ে দেখি ব্রহ্মময়ী এলোকেশী।"

বাংলা মায়ের সহোদরা বোন মাসীমারাও আমাদের কম শ্রদ্ধার
য, তাঁদের এই তুষার-বরণী অপূর্ব্ব মূর্ত্তি বা ধূসরাঞ্চলা পার্ব্বতী রূপ
ছু কম মনোলোভা নয়, তবু মায়ের মুখখানিই সন্তানের চির
ভরপ্রদ।

ধোবিঘাট চটির নামটা বেশ আশাপ্রদ বটে! মনে করেছিলাম
লকানন্দার ঘাটে ধোপারা বুঝি যাত্রীদের জন্যে কাপড় কাচে, আমরাও
চিয়ে নেবো। ও হরি!—কোথায় কি?—সারি সারি কতকগুলা
কতলা ঘর, তারই এক খানা ঠিক করে উনানে চায়ের জল চড়িয়ে
য়ে তুলারামটা ঘুমিয়ে পড়েছে। মহীপৎ এসে তাকে ঠেলে তুল্লে।
চারী আজ একটু অসুস্থ ছিল। জোশিমঠে আমরা যখন মন্দিরাদি
খছিলেম, ও আমাদের দেখতে না পেয়ে সোজা চলে এসেছে।
ষ্ণুপ্রয়াগে ওর সঙ্গে দেখা না হওয়ায় চা আজ তৈরি হয়নি। ওর
ছেই সব থাকত, চা-খোর ক'জনের পক্ষে আজকের সকালটা ঠিক
প্রভাত হয়নি বোধ হয়!

অলকানন্দার পূর্ব্বের সে মূর্ত্তি বিষ্ণুপ্রয়াগেই শেষ হয়ে গেছে। আহা,
লর এমন রং কখনো দেখিনি! ওপালের মত ঝকঝকে, পান্নার

মত নীলাভ-সবুজ, না কিসের মতই যে বল্‌বো উপমা খুঁজে পাইনে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের উপর ক্রমাগত আছাড় খেতে খেতে সে যে কি শ্বেত ফেনোচ্ছল তরঙ্গ! কি কল-গম্ভীর নাদ!—কখনো সে রব কাণে মৃদঙ্গের আওয়াজ এনে দেয়, কখনো রেলগাড়ীর গতি স্মরণ করিয়ে দেয়, কখনো বেণু-বীণা সারেঙ্গের পাখোয়াজের সম্মিলিত রব তোলে। গালিয়াথগড়ের পথ থেকে লাম্‌গড় বা রামগড় পর্য্যন্ত সাড়ে তিন মাইল পর্য্যন্ত সে যে কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতেই এই সুন্দরী চির-তরুণী কল্লোলিনী আমাদের পথের সাথী হয়ে সঙ্গে সঙ্গে চল্লেন, সে একরকম অবর্ণনীয়! ইন্দ্রসভার অপ্সরীশ্রেষ্ঠা রূপসী-উর্ব্বশীর মতই এই নদীকুলরাণীটীও তাঁর চরণমঞ্জীরের অপূর্ব্ব রবে তীরভূমি মুখরিত ক'রে নৃত্যভঙ্গিমায় চঞ্চল হয়ে চলে যাচ্চেন। ছোটবেলার এই গানটীই মূর্ত্তিমতী হয়ে যেন থেকে থেকে মনে পড়ছিল,—

"তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে বহিয়া যায়।"—

হিল্লোল যত, কল্লোলও তেমনই!—উনি যেন গিরিরাজসুতা পার্ব্বতী,—বাল্যলীলায় ক্রীড়া ক'রে বেড়াচ্ছেন। ওঁর দিকে চেয়ে চেয়ে ঐ রূপে রসে শব্দে স্পর্শে মন যেন বিমুগ্ধ হয়ে কোথায় তলিয়ে যায়। মনে মনে বলি,—

"তুমি চরণভঙ্গে নাচত রঙ্গে,—
রিনিকি রিণিকি রিণি রিণি!"

পাণ্ডুকেশ্বরে যোগবদরী দেখলেম। পঞ্চকেদারের মত বদরীও পাঁচটী। যোগবদরী, ধ্যানবদরী, আদিবদরী, বৃদ্ধবদরী এবং ভবিষ্য-বদরী। এই যোগবদরী এবং আসল বদরী ধ্যানবদরী। অন্য তিন

নকে দেখা আমাদের কপালে হয়ে উঠবে না। তাঁদের পথ না কি
তি দুর্গম, অন্ততঃ দুজনের।

পাঁচখানি তাম্রশাসন দেখিয়ে পাণ্ডারা বল্লেন, এগুলি পঞ্চপাণ্ডবের
প্রদত্ত শাসনপত্র। আসলে কি, সেটা নাকি সম্প্রতি এসিয়াটিক
সাসাইটির বিচার্চ্চ সমিতির দ্বারা পরীক্ষা হয়ে গেছে। দুখানা প্যাকিং
াক্সতেই রয়েছে, একখানা নাকি পৌড়ী থেকে ফেরৎ আসেনি। তুমি
লে পড়তে পারতে। আমরা চেষ্টা করে পারলুম না।

এখানের পুরোহিত বাসুদেব আয়ার মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ। তিনি
কদারের শূদ্র জাতীয় লিঙ্গায়েৎ কেদার রাওলের একটু নিন্দা করলেন।
দরীর রাওল সম্বন্ধে বল্লেন,—"লোকে লোককে মন্দ বলতেই ভালবাসে।
নিন্দা আপনারা যথেষ্টই শুনতে পাবেন, তবে যতটা রটে তার সবটাই
ত্য হয় না।" অর্থাৎ তাঁর মতে, বদরীর রাওল সাহেব লোক মন্দ নন,
তবে পাঁচজনের স্বার্থ সঙ্ঘর্ষ যেখানে আছে সেখানে নিন্দা স্তুতি অতি
হজেই উঠে পড়ে।

সঙ্গীরা ঠাকুর দেখেই কর্ত্তব্য সমাধা করে সন্তুষ্টচিত্তে বেরিয়ে পড়েন,
চাঁদের মটো হচ্ছে, "আগে চল্ আগে চল্ ভাই!"—কাযেই আমাকেও
তাড়াতাড়ি অগ্রসর হ'তে হলো। ইচ্ছা ছিল যতটুকু পাওয়া যায়
একটু খোঁজ খবর নেবো। পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন কিছু খবর পাওয়ার
উপায় দেখতে পাইনে! সমস্ত মন্দিরই শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত—ব্যস!
অবশ্য তা' হতেও পারে। আদি শঙ্করাচার্য্যের পর জোশি মঠের শঙ্করা-
চার্য্য উপাধিধারী মঠাধিষ্ঠাতারাই হয়ত এসব করে থাকবেন। তবে
এই যে উত্তরাখণ্ডের সর্ব্বত্রই দক্ষিণাপথের-ব্রাহ্মণ-প্রভাব আজও প্রবল-

ভাবে বর্ত্তমান রয়েছে, এ আদিব্যক্তিটীরই নিজস্ব কীর্ত্তি! সে সময় বৌদ্ধ প্রভাব, উত্তরে সনাতন ধর্ম্মী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব ঘটায়, তিনি সম্ভবতঃ এই নিয়ম করতে বাধ্য হয়েছিলেন, অথবা এ' তাঁর প্রতিভাস্বর কিনা তাও ঠিক বলা যায় না! এ পচা মাল আর কতকাল ধ'রেই চালানো চলবে জানি না। একদিন যা তাজা বলে' এসেছিল, আজ তা' পচে গিয়েও চলতে থাকে কেন? যে অঞ্চলেরই লোক উপযুক্ত হোন তাঁকেই এসব বড় পদে নিয়োগ করা উচিত। কিন্তু এসব ব্যবস্থা করে কে?—এবং করলেই বা তা' মানবে কে? যুক্তির চেয়ে এদেশে যে প্রথাই বড়।

পাণ্ডুকেশ্বর নাকি পাণ্ডু রাজার তপস্যাক্ষেত্র এবং পঞ্চপাণ্ডবের জন্মস্থান।

ঘাট চটিতে অলকানন্দা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে ধরা দিলেও তাঁর সেই সদ্য বরফগলা জলধারা আর ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জনে ভীত হয়ে আমরা অবগাহনের লোভ ছেড়ে দিলেম। একটী ছোট ঝরণা, সেও অবশ্য বরফ গলা, তবু কম জল, রোদের তাপ লাগছে, তারই জলে গরম জল মিলিয়ে স্নান করতে হলো। বহুদিন পরে নদীর ধারে এসেও নদীস্নানের সুখ পাওয়া গেল না, তাতে মনটা কিছু ক্ষুণ্ণ হলো। কিন্তু এখন অসুখ বিসুখের ভয়ই সব চেয়ে বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে, কোন রকমে ভালয় ভালয় এ'ক'টা দিন কেটে গেলেই বাঁচি।

শুক্রবার বেলাবেলি ঘাটচটি থেকে বেরিয়ে পড়া গেল। নদীর ধারে ধারে আঁকা বাঁকা নানা ছাঁদের পথ চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই চির দিবানিশির, সেই অজানা অনাদিকালের অশ্রান্ত গম্ভীর নাদ!

পথের ধারে আবার সেই আরণ্য কুসুমের সম্ভার! সেই ফুলে ভরা গোলাপ লতা, সেই নানা বর্ণের পুষ্পগুচ্ছ, পত্ররাজি। ঘাটচটি থেকে

নন্দিকেশ্বরী ও পাণ্ডুকেশ্বর পর্য্যন্ত পথ প্রায় নদীর সামান্য উপর দিয়ে গিয়েছে। জ্যামিতির সকল সম্পর্ক-বিযুক্ত নানা আকারের ক্ষেতগুলিতে খুব লঙ্কা গাছ জন্মেছে, লঙ্কা এখনও কিন্তু ফলতে আরম্ভ করেনি। করলে একটু সুবিধা হতো।

এ অঞ্চলের পার্ব্বত্য কন্যাগণকে অনেকখানি সঙ্গতিপন্না দেখলেম। এদিকের মতন এ'কদিনই এদের সেই কম্বল পরা মূর্ত্তি আর দেখতে পাইনে। তার পরিবর্ত্তে খুব জমকালো ছিটের ঘাঘরা, টিকলো নাকে সোণার ঘেরদার নথ, কাণে অনেকগুলো ক'রে সোণার মাকড়ি আর হাতে গলায় রূপোর ঝিলিমিলির সঙ্গে কাঁড়িখানেক পলার মালা। মেয়েরা বোঝা বইছে, ঘাস কাটছে, মাটী নিড়াচ্চে, তুঁষ ঝাড়ছে, আর আমাদের দেখতে পেলই ছুঁচসূতা চাইছে। না পেলে দশ কথা শুনিয়ে দিচ্চে। এটা ওদের অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে আর কি! যাদের গায়ে অতগুলো সেলাই করা পোষাক, তাদের নিশ্চয়ই ছুঁচ সূতোর অভাবটা তত বেশি নয়।

এই পথটী খুবই সুন্দর। রামগড় চটি পর্য্যন্ত যত ফুল, ততো বন! পাহাড়ের মাথার দিকে চাইলে নিবিড় জঙ্গল দেখতে পাওয়া যায়। এই সব বনে বনে প্রচুর পরিমাণ ভূর্জ্জপত্রের গাছ আছে। মধ্যে মধ্যে বরফের উপর দিয়ে চলতে হলো।

রামগড় থেকে হনুমান চটি পর্য্যন্ত এই মোটামুটি তিন মাইল পথ দেখতেও যেমন সুন্দর আবার ভীষণও তেমনই। পাণ্ডুকেশ্বর থেকে রামগড় আসতে তিন মাইল পথে চার বার আমাদের বরফ পার হতে হ'য়েছিল। এর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বরফের স্তূপটীর অবস্থা সব চাইতে মন্দ!

এই বরফের জমাট রাস্তাগুলি চারটী পুলের উপর চেপে বসে আছে। এদের কথা আমরা দেরাদুন থেকে আসবার আগেই গবর্ণমেণ্ট কমিউনিকে বেরিয়েছিল। এর মধ্যের দুটী স্তূপ লম্বায় এক বা দেড় ফার্লং, অপর দুটী আমাদের চলনপথের মাপে খুব বেশি নয়,—সিকি ফার্লংটাক হতে পারে। প্রথমটীর পুল ভাঙ্গা কাঠ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। পুল তৈরির জন্যে নূতন কাঠ আনা হয়েছে, কিন্তু তৈরির উপায় নেই।

রবর-সোল জুতোয় পা ভিজলো না বটে, কিন্তু পিছলে যাচ্ছিল। তবু এখানের বরফে আর কেদারের বরফে ঐ হাজার ফিটের যোগ্যই প্রভেদ! সেখানের বরফ সেখানেরই তুষারপাতের ফল, সেই তুষার পাত তখনও অশ্রান্তভাবে চলছে, তাই তা' কোমল এবং পিচ্ছিল। তা'তে পা পিছলায়, পুঁতে যায়, শুধু তাই নয়, সর্ব্বশরীরই পুঁতে যেতে সমর্থ—চোরাবালির মত। বিশেষতঃ তুষারপাত চলায় অত্যন্ত শীতার্ত্ত করে। কিন্তু এখানের এই সব যে তুষারস্তূপ এগুলি জমাট কঠিন,—প্রায় প্রস্তরীভূত। এরা উচ্চ পর্ব্বতের সানুদেশ হতে সূর্য্যতাপে তরল ও ক্রমশ স্খলিত হয়ে কাদার তালের মত নেমে পড়েছে। এখনও কোথাও কোথাও প্রকাণ্ড পাহাড়ের মাথার সঙ্গে ঢালু হয়ে বরফের পাহাড় রূপে বর্ত্তে রয়েছে। এই জমাট হয়ে চাপ [illegible] বরফের রাশির তলা থেকে কলকল শব্দে অলকানন্দার জলের ধারা গলিত বরফে বর্দ্ধিততর হয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে বেরুচ্চে, অবশ্য চোকে দেখা যাচ্চে না, শুধু তার ভীম গর্জ্জন শ্রুতি বধির করছে। উপরটা কঠিন বরফের আচ্ছাদন দিয়ে ঢাকা এবং সেইখান দিয়ে আমরা চলেছি! এ পথের এই-ই বিপদ! বরফ যখন গলে, একেবারে নীচে থেকে গলে। গলতে গলতে কোন্ সময় কোনখানে

ভিতর থেকে বরফ ক্ষয় পেয়ে থাকবে, তার তো কিছুই স্থিরতা নেই, সেই সময় মানুষের পা যদি সেই অপক্ষীয়মান পাতলা স্তরের উপর পতিত হয়, একেবারে গভীর গহ্বরশায়ী হয়ে প্রচণ্ড স্রোতোহত হতে হতে কোথায় কি যে হয়ে যাবে, সে বর্ণনায় কায কি! অত্যন্ত সাবধানে এই রকম বরফের পথ পার হতে হয়। যেখানে পথের উপর ঠাস জমাট বরফ সেগুলি তত বিপদসঙ্কুল নয়। পড়লে কিছু আঘাত লাগবে, অথবা হাতটা পাটা ভেঙ্গেও না হয় যেতে পারে, অতলের তলে তলিয়ে যাবার ভয় তো আর নেই।

যেখানে ভয়, ভক্তিও বুঝি সেইখানেই? যিনি—"ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং"—

তিনিই আবার "গতি প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্"—এবং—

তাঁরই পদ "মহোচ্চ"। এই যে অগ্রসর হচ্চি, পথ ক্রমশঃই ভয়াবহ হয়ে উঠ্‌ছে, এর দুর্গমতায় প্রাণের মধ্যে একদিকে একটা ভয় ও সন্দেহের দোলনা সবেগে দুল্‌ছে, আবার আর এক দিক থেকে অজ্ঞাত-দর্শনের একটা বিপুল পুলক ও দুরাকাঙ্ক্ষার তরঙ্গ তীব্রবেগে জীবন বেলায় আছাড় খেয়ে পড়ছে। একদিকে শঙ্কিত ভীরু চিত্ত সভয়ে প্রশ্ন করে ওঠে—"আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে?"—আবার এর উলটো দিক থেকে বিস্মিত বিমুগ্ধ হৃদয় এই চলোর্ম্মিময়ী নৃত্যপরা অলকানন্দার মতই বিপুল বেগে দুলতে থাকে, নাচতে থাকে, মন যেন আনন্দে উদ্দাম হয়ে উঠে বলতে থাকে—"আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ!"

এই চারিদিকে ফলে ফুলে আলোকে পুলকে রূপে রসে গন্ধে মাতোয়ারা, পাখীর গানে মন মাতানো নব বসন্তের সম্মোহন মূর্ত্তি!

আবার তখনই দেখ—ঘন তুষার পরিবৃত ভীষণ পর্ব্বতের পদপ্রান্তে ধূ ধূ ধূ ধূ হিম-প্রান্তর! আকাশের কালো মেঘ পাহাড়ের শুভ্রতায় ভীমকান্ত হয়ে উঠেছে। সুবিপুল মেঘ-পর্ব্বত, সুবিস্তৃত হিমালয়ে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। যেন অযুত অযুত মত্ত মাতঙ্গ শুণ্ডে শুণ্ডে তুণ্ডে তুণ্ডে জড়াজড়ি ক'রে সমস্ত আকাশ পৃথিবীকে ঘিরে ফেলেছে। এর মধ্যে অমল-ধবল ঐরাবতের বংশাবলীই অবশ্য সমধিক।

এই রৌদ্র,—এই বৃষ্টি,—এই সমক্ষ পর্ব্বতচূড়া ঘন কুয়াসার জালে সমাবৃত হওয়া, আর ঐ চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গের উচ্চ চূড়ে তুষারবর্ষণ দৃশ্য! আবার ঠিক ঐ সঙ্গেই এরই উল্টো দিকে চিরশ্যামল পত্রপুষ্প সমাচ্ছন্ন পর্ব্বতের অঙ্গে বাসন্তী রৌদ্রের নয়নরঞ্জন ঝিলমিলানী দেখা যাচ্চে! এর মাঝে মাঝে সমুজ্জ্বল বর্ণচ্ছটায় পেখম ধরা ময়ূরের মত; অথবা যেন ইন্দ্রধনুর সপ্ত বর্ণের অপরূপ সমাবেশ! যেন সেই,—"খেলে যায় রৌদ্র ছায়ায়,—বর্ষা আসে,—বসন্ত।" সেই বর্ণনাটা সাক্ষাৎ সজীব হয়ে ওঠে।

এক্ষণই সহজ সুন্দর পথে স্বচ্ছন্দ বিচরণ, তক্ষণই অর্দ্ধ গলিত তুষারাবৃত কঠিন বর্ত্মে ডাণ্ডিবাহকের সহায়তায় অতিকষ্টে আতিবাহন! এই যে বরফের পথ, তা' এ মন্দ কি? চারবারের পথকে একত্র করলে আধমাইল বা ছয় ফার্লং তো হবে, এর প্রথমটাই যা ভয়ের, বাকিগুলো বেশ জমাট বাঁধা ও উর্দ্ধে অধে সুদূর বিস্তৃত। সেগুলো যেন বরফের ময়দানের ন্যায়, দুরমুস করার মত অনেকটা শক্ত ও সুগম হয়ে গেছে। —অর্থাৎ কিনা কুশপুত্তলিকার প্রয়োজন ঘটবে না।

নদীর উপর এদিকটার প্রায় সর্ব্বত্রই দশ বিশ হাত বরফ জ'মে

আছে। যেখানে একটু আবরণ পাতলা সেখান থেকে গভীর গর্জ্জনে সে তার নিজের অস্তিত্ব তীব্রকণ্ঠে ঘোষণা করতে করতে চলে যাচ্ছে। দূরে অদূরে আশে পাশে সর্ব্বত্র দিয়েই তুষার পর্ব্বতের মাথা থেকে তীব্র গর্জ্জনে গলিত তুষার জলপ্রপাতের রূপে নীচে আছড়ে পড়ছে। এর উচ্চতার হিসাবে কোন কোনখানের এই জলপ্রপাতের গর্জ্জন ও তর্জ্জন দুইই ভয়ঙ্কর এবং মনোহর! প্রচণ্ড বেগে নীচে প'ড়ে ঐ জলধারা কোথাও কোথাও ধোঁয়ার মত বাতাসে উড়ে যাচ্চে।

ও দিকের কেদার পথে সোম প্রয়াগের সোমগঙ্গা ঐ ভাবেই নেমেছে। আরও কত স্থানে কতই অজ্ঞাতনামা অখ্যাতকীর্ত্তি ঝরণা ঐ ভাবে জল-প্রপাতরূপে দর্শকের নয়ন মন পরিতৃপ্তি এবং তৃষ্ণার্ত্তের তৃষ্ণা দূর করতে করতে ক্রমশঃ অলকানন্দার কলেবর বর্দ্ধিত করচে তার কোনই হিসাব আছে কি!

হনুমান চটিতে খিচুড়ি খেয়ে সেদিনও কেদারের মত খুব সকাল সকাল বেরিয়ে পড়া গেল। কেদারে বেলা পড়লেই তুষারপাত হয়, এখানেও চারিদিকের বরফের কাণ্ডকারখানা দেখে আমরা তুষার বৃষ্টির ভয়ে সকাল সকালই বেরিয়ে পড়লেম।—সেদিন শনিবার।

যে সমস্ত উঁচু পাহাড়ের মাথা বরফের আস্তরণে ঢাকা, তাদের গা বয়ে বয়ে সেই আধ গলা বরফের চাদর তাদের পায়ের উপর নেমে আসচে, আজও গড়িয়ে পড়চে দেখলুম। ওদেরই পাশে পাশে ছোট পর্ব্বত-শিশুরা সবুজ পোষাক দিয়ে গা ঢেকে সুন্দর শোভায় ব'সে আছে। ঠিক যেন শ্বেত কেশ-শ্মশ্রু শুক্লাম্বরধারী বৃদ্ধ প্রপিতামহের পাশে, নব-কিশলয়কোমল নবীন সুন্দর শিশু প্রপৌত্র তার সৌম্য মূর্ত্তিটী নিয়ে

বিরাজ করচে। এ পথে এই দৃশ্যটী যেমন অভূতপূর্ব্ব,—তেমনই অপরূপ!

অলকানন্দা এদিকে একেবারে জমাট বেঁধে গিয়েছেন। ক্বচিৎ কোথাও তুষাররাশির তলদেশ থেকে তীব্র আর্ত্তনাদ শ্রুত হচ্চে। ছোট ছেলেকে যদি তার স্বাধীন উল্লম্ফন থেকে জোর করে ধ'রে এনে কোলে চেপে রাখা যায়, সে যেমন ঘোরতর বিদ্রোহ ঘোষণা করতে থাকে, এই চপলা পর্ব্বতরাজ-কন্যাটিরও সেই সানন্দ স্বাধীন গতির প্রচণ্ড বাধায় তেমনিতর একটা তীব্র প্রতিবাদ চলছিল।

যতই উপরে উঠে যাচ্চি, ততই অলকার জমাট মূর্ত্তি ও বরফের শ্বেতদৃশ্য প্রকটিত হয়ে উঠ্‌ছে। এবেলাতেও আমাদের পাঁচ জায়গায় বরফ পার হতে হলো। এর মধ্যের দু'জায়গাতে প্রায় তিন সাড়ে তিন ফার্লং ক'রে বিস্তৃতি। একস্থানে দু'ধারে বরফ ময়দানের মধ্য দিয়ে একটুখানি সঙ্কীর্ণ পথ, তার পাশেই হাত চার পাঁচ পুরু বরফের একটা শূন্যগর্ভ গুহা তৈরি হয়ে আছে। এক জায়গায় ঐরূপ অর্দ্ধগলিত তুষারের মধ্য দিয়ে উপরের ঝরণা ও নিচের তুষারগলিত বারি ঘোর রোলে ছুটে যাচ্চে। একটি দরিদ্রা বৃদ্ধার পথের সম্বল পোঁটলাটী ঐ স্রোতে প'ড়ে মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হয়ে গেল! শুনলুম একটি বাঙ্গালী স্ত্রীলোক একটা বরফ পথে প'ড়ে হাত ভেঙ্গেছেন। আমাদের সঙ্গে লোক বেশী, প্রত্যেকেরই প্রায় দু'জন ক'রে পরিচালক, হাতে বর্শা দেওয়া লাঠি, লাঠিটা পুঁতে ও একজন দক্ষ লোকের হাত শক্ত ক'রে ধ'রে রাখলে পড়বার ভয় কম থাকে, কিন্তু অনাথ আতুর অসহায় যারা? আহা,

দেখলে দুঃখ এবং লজ্জার শেষ থাকে না। কি কষ্টেই তারা এই সকল কঠিন পথ অতিবাহন করছে! পুণ্য যদি হয় তো এদেরই।

কেদারের মত এ বরফে পা পোঁতে না ব'লে জুতোও ভেজে না। যদিও ভয়ানক ঠাণ্ডা ঠেকছিল, তবু শীত তেমন বোধ হয়নি, বরং অনাবশ্যক মনে হওয়ায় হাতের দস্তানা দুটো খুলে ফেলা গেল।

আসল কথা কেদারে বদরীতে অনেকখানি তফাৎ আছে। প্রথমতঃ হাজার মাইল উচ্চতা, দ্বিতীয়তঃ এটা পূর্ব্বদিকে, কেদার উত্তরে। তৃতীয়তঃ কেদারের পশ্চাতেই চিরতুষারাবৃত হিমাচলের সিত শুভ্র অভ্রভেদী তুষারশৃঙ্গ, সেখানে বারমাস তুষারপাত হওয়াতে বাতাস অত্যন্ত ঠাণ্ডা হয়েই থাকে,—বর্ত্তমানে সেখানে তুষারবৃষ্টি চলছিল, এখানে এখন কিছুদিন থেকেই তা' বন্ধ হয়ে গেছে।

দিন বেশ খরতর রৌদ্রকরোজ্জ্বল। যদিও দূরের উঁচ পাহাড়-গুলোতে তুষারপাত হচ্চে দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু আমাদের পথের উপরে মেঘের ছায়াটুকুও পড়েনি। তবে পথ? তা, সে কিন্তু কেদার পথের চাইতে ভাল কিছুই দেখতে পেলেম না!

ও হরি! এরই নাম ভাল? যত চড়াই তেমনই বড় বড় পাথরের হড়হড়ে রাস্তা। কোথাও বনের মধ্য দিয়ে তার গতি, কোথাও খাড়া উঁচ চড়াই, কোথাও ভাঙ্গাচোরা উৎরাই।—তারপর এক যায়গায়—সে যে কি ভয়ানক পথহীন পথ, সে আর বলবার নয়! সে যে কত পথ বলতে পারিনে। হয়ত মাপ হিসাবে এক ফার্লং অথবা তার চাইতেও কিছু একটু কম হলেও হতে পারে, কিন্তু তখন মনে হচ্ছিল এ যেন অনাদি-

কালের সেই অনন্ত পথ! আর আমাদের অফুরন্ত পথ চলার শেষ সীমাতেই যেন এরও শেষ সীমা! এর তলার দিকে গড়ানে পথের মধ্যে অলকানন্দার জমাটের উপর দিয়ে এপার ওপার পর্ব্বত সব বরফ দিয়ে ঢাকা, আর যেখান দিয়ে চলেছি সেখানকার সে কি অবস্থা! পথটা বরফ ভেঙ্গে প'ড়ে ধ্বসিয়ে নিয়ে নেমে চলে গ্যাছে। ভাঙ্গা চোরা আঁকা বাঁকা, জলে ভেজা আলগা বালি, পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে এক একটী পা ফেলে ঠিক অসহায় অন্ধের মতই সন্তর্পণে লাঠি পুঁতে চলেছি! ডাণ্ডি-ওয়ালাদের সহ্যের সীমা নেই, নিজের প্রাণকে তুচ্ছ ক'রে একজন অক্লান্ত-ভাবে সমানেই সঙ্গে রয়েছে, তবু কি ভয় যায়? সে আনন্দের পথ চলা যেন ফুরিয়ে গেল। একটা দুশ্ছেদ্য বিষম ভয়ের চাপে বুকটা যেন তুষারাচ্ছন্ন পাহাড়ের মতই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। ব্যাকুল চিত্ত থেকে যেন একটা কাতর অবেদন উঠে এলো,—

"আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে?"—

তখন সত্য করেই অন্তরের মধ্য থেকে আকুল আহ্বান উত্থিত হতে লাগলো,—"হে অশক্তের বন্ধু! অক্ষমের সখা! শিশুও তো চাঁদ ধরবার জন্যে উদ্বাহু হয়ে থাকে, সে কি তার অপরাধ? এত দূরেই যখন নিয়ে এলে তবে আর একটুখানির জন্যে বঞ্চিত কর না"।—"শক্তিং শরীরে হৃদয়ে চ ভক্তিং।"—ভক্তির অভাব বলেই শক্তিরও এত অভাব বোধ করচি। না হলে এই যে এত বৃদ্ধ, পঙ্গু, বালক, অশক্ত অনাচ্ছাদিত দরিদ্র সবই তো তোমার দর্শনে চলেছে, তাদের চিত্তের সবল ভক্তি ও স্থির বিশ্বাসের বলেই তারা বলীয়ান হয়ে আনন্দ করতে করতে চলেছে। আর যত ভয় ভবনা অবিশ্বাস কি আমাদেরই?

এইখানে একটা কথা বলতে ভুলেছি। আজকের যাত্রারম্ভে প্রথম এক মাইলের মধ্যেই একটী শোচনীয় ঘটনা চোখে প'ড়ে গেছ্‌ল।

পথের একটী বাঁকের কাছে যাত্রাপথের একটুখানি ভিতর দিকে সরে ব'সে একটী গেরুয়া পরা মেয়ে প্রণাম করার মত অবস্থায় ম'রে আছেন। আমরা প্রথমটা তাঁকে মৃত ব'লে বুঝতে পারিনি, কিন্তু লোকেরা বলাবলি করছিল এবং পুলিশও এসে পৌছলে জানা গেল, ঐ অবস্থাতেই হার্টফেল করেছে। মেয়েটী কোন্‌দেশের জান্‌তে পারিনি। মনটা বড়ই ক্লিষ্ট হলো।

বাস্তবিকই আশ্চর্য্য বোধ হলো যখন এতদিনের এত কষ্ট ও পথক্লেশের পর চারিদিকের উচ্চ তুষারচূড় পর্ব্বতের বেষ্টনীর মধ্যস্থিত অধিত্যকার মত বিস্তৃত বদরীক্ষেত্র এবং তার মন্দিরগৃহ হর্ম্ম্যাদি বিভূষিত মূর্ত্তি চোখে পড়লো। সমস্ত ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হয়ে গিয়ে মনে হলো, "অপরূপ রূপ এ কি হেরিলাম, হেরিলাম!" কেদার দেখে যত ভয় হয়েছিল, একে দেখে তেমনই আনন্দ হলো।

দেবদর্শনী বদরী থেকে পাঁচ ফার্লং আগে, সেইখান থেকেই পুরী প্রথম চোখে পড়ে। পাথর দিয়ে সাজান একটী কুটীরে গরুড়ের মূর্ত্তি নিয়ে একজন পুরোহিত ব'সে আছেন। আর কোথাও কিছুই নেই। কিন্তু বদরীধামের অপ্রত্যাশিত দৃশ্য চোখে প'ড়ে অনেকখানিই পথক্লেশ প্রশমিত করে দিলে।

এখনও কিন্তু বরফের শেষ হয়নি। আবার একটা বরফাচ্ছন্ন পথ পার হ'তে হলো। অলকানন্দার পুল ভেঙ্গে রয়েছে, আবার একটা কষ্টকর ও ভীতিজনক রাস্তা দিয়ে নেমে কাঠের পুল পার হয়ে তেমনই ক'রে উঠে

উত্তরাখণ্ডের পত্র

এবার আমারা বদরী পুরীতে প্রবেশ করলেম। পথ চলার এইখানেই সমাপ্তি হলো।

তখন এই কথাটাই সর্ব্বপ্রথম মনে হলো, সত্যকারের পথ চলার শেষে কি এমনি করে হাত ধ'রে তোমার পায়ের কাছে আমায় টেনে নেবে? আজ বারে বারেই মনে পড়ে যাচ্ছিল কান্তকবির সেই গানটা—

"আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে,
তুমি অভাগারে চেয়েছ।"

কবি হয়ত আমার মত অবস্থায় পড়েই এ গান গেয়ে উঠেছিলেন!

আমিও তো এ পথে ঠিক মনখুলে আসিনি, থেকে থেকে পিছন দিকেই মন ফিরেছে। ভক্তবৎসলই শুনেছিলেম দেখছি অভক্তের প্রতিও বাৎসল্য খুব কম রাখেন না!

তুমি যাই হও, 'সগুণো নির্গুণো বা'—এই হিমপর্ব্বতেশ্বর বদরীনাথ নামেই তৃপ্ত চিত্তে তোমায় আমি প্রণাম করচি। 'রূপবিবর্জ্জিতের'—এই নামরূপেই যেন আমার ভক্তি-প্রীতি অচলা হয়!

বদরীক্ষেত্রের দু'ধারে দুই বিশালকায় পর্ব্বত আকাশে মাথা ঠেকিয়ে দিয়ে যেন বদ্ধ পদ্মাসনে ধ্যাননিমগ্ন হয়ে আছেন। এদের মস্তকোপরি কলধৌত শুভ্র শিরোচ্ছদ বক্ষে গলিতস্খলিত তুষারের শ্বেত যজ্ঞসূত্র, সর্ব্বাঙ্গে স্ফুরৎপ্রভ হীরকমণিদ্যুতিপ্রতিম তপঃজ্যোতি,—এঁদের নাম নর এবং নারায়ণ। এই নর-নারায়ণের মধ্যভূমি বদরীপুরী। এর পূর্ব্ব প্রান্তে অলকানন্দা কল কল কল্লোলে প্রবাহিতা। নারায়ণ পর্ব্বতের উপরকার তুষাররাশি এই অলকা দেবীর জন্ম-সূতিকা। এখানের দৃশ্য দেখলে কি একটা অনির্ব্বচনীয় ভক্তিভরে হৃদয় প্লাবিত হয়ে যায়, মন যেন প্রশান্ত

হয়ে আসে। ছিন্‌কা চটী পার হবার পর থেকে একটু আধটু, ক্রমশ সিয়াসেন হতেই তুষারকিরীটী হিমাচল আমাদের পাশে পাশেই চ'লে এসে, পাণ্ডুকেশ্বরের পর থেকে ঐ তুষার আশে পাশে এমন কি পায়ের তলায় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। এখন এখানে দাঁড়িয়ে তুষারাবৃত হিমালয়ের সারি সারি পর্ব্বতশ্রেণী অস্তগামী সূর্য্য কিরণে যেন একটা অনির্ব্বচনীয় মহিমময় দ্যুতিতে নূতন বেশে দেখা দিলে!

এদের মাথায় গায়ে পদপ্রান্তে সর্ব্বত্রই যেন সাদায় সাদায় কুন্দ ধবল ফুলের মালায় ঢেকে রেখেছে। যেন কৈলাসপতির উদ্দেশ্যে অযুতে অযুতে শ্বেত ধুতুরার এবং বৈকুণ্ঠেশ্বরের উদ্দেশ্যে অম্লান মল্লিকার রাশিতে বিশ্বদেবতার চির উপাসিকা প্রকৃতি দেবী তাঁর সমস্ত কানন কন্দরকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। সত্যং শিবং সুন্দরম্‌কে এই সত্ত্বগুণাত্মক শুভ্র অমলতা ভিন্ন আর কি-ই বা দেবার আছে? মঙ্গলের মঙ্গলময়ত্বও যে ঐ অম্লান শুভ্রতায় পরিব্যাপ্ত। আর, সুন্দর? সে আর কি বলবো? ঐ অভ্রভেদী চিরতুষারাবৃত ধবলগিরি শৃঙ্গব্যাপী, যা বদরীনারায়ণের উত্তরভাগে দূর হতে সূর্য্যাস্তের সমুদয় উজ্জ্বলতা এবং তার সমুজ্জ্বলতর প্রতপ্ত কিরণ দ্বারায় রঞ্জিত হয়ে, রজতগিরি নয়, স্বর্ণ পর্ব্বত বা কাঞ্চনজঙ্ঘারূপে নির্ম্মল নীল আকাশের মাঝখানে চারিদিকের সীমাহীন রজত শুভ্রতার মধ্যভাগে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি ঝলসিত করছে—কে আছ কোথায়?—স্নেহাস্পদ প্রেমাস্পদ ভক্তিভাজন! প্রিয়! প্রিয়তর! প্রিয়তম! একবার এসে দেখে যাও!—দেখে যাও—জীবনের এ যে এক সুমহান্ সার্থকতা, নয়নের এ যে অনির্ব্বচনীয় পরিতৃপ্তি!

এত রূপ, এত শোভা, এত অপার্থিব সৌন্দর্য্য এই এতদূরে, এই

দুরূহ দুঃখ-দারুণ ক্লেশ-কঠোর পথের পারে এমন প্রচুরতররূপে সাজান ছিল, এ কি ভাবতে পেরেছিলুম? হ্যা সুন্দর বটে! চির সুন্দরের চির সৌন্দর্য্যের কণামাত্র হোক, তবু এ তাঁর সেই অনন্ত অসীম রূপেরই মূর্ত্ত বিকাশ! এ সৌন্দর্য্যের কাছে বাক্য মন স্তব্ধ হয়।

বদরীপুরী বেশ বড় সহর। ডাক্তারখানা, তার-ঘর, ধর্ম্মশালাসমূহ দোকান পশার যথেষ্ট। দোকানে দোকানে মুদিখানার সমস্ত জিনিষপত্র, মিছরি বাতাসা মেওয়া মিঠাই মোণ্ডা কিছুরই অপ্রতুলতা নেই। হালুইকরের দোকানে লুচি, কচুরি, বড় বড় পাঁপর, পাহাড়ী শাক ও আলুর 'পকৌড়ি' ভাজা ভূজি চলছে। সিমের তরকারী, আলু কাঁচকলার চচ্চড়ি, জিলিপি, পেঁড়া, মুগের ও সুজির বরফি, গজা, নিমকি সবই তৈরি হচ্চে। ঘি যদিও ৪৲ ক'রে সের; কিন্তু তেমন উৎকৃষ্ট ঘি সহজে সহর দেশে পাওয়া যায় না। দোকান পসার দেখে কালীঘাট মনে পড়ছিল।

জগন্নাথক্ষেত্রের মত এখানেও নারায়ণের অন্নভোগ হয়। লক্ষ্মীর রান্নাঘরে হাঁড়ি হাঁড়ি ডাল ভাত তৈরি হচ্চে। সেই মহাপ্রসাদ যাত্রীরা খেতে পায়, রন্ধন নিষিদ্ধ। এখানেও মহাপ্রসাদে জাতিভেদ নেই। পাণ্ডারা মহাপ্রসাদ যাত্রীদের দেয়। একরকম বড় ঘটি বা পিতলের বড় বড় বাঁটলোয় ক'রে ডাল এবং ভাত এই দুই জিনিষই রান্না হয়ে বদরীজীর সামনের অঙ্গনে জমা হচ্চে, ভোগ লাগবে। জগন্নাথের মতন বদরীনাথ বাহান্ন ভোগ খান না অথবা পান্ না। কোথায় পাবেন? যে দুর্গম গিরিসঙ্কটের উপর চ'ড়ে ব'সে আছেন! কত কষ্টে ধাক্কা খেতে খেতে, ধাক্কা খাওয়াতে খাওয়াতে, ছাগলের পিঠে

চাটি চাটি ক'রে মাল উঠছে। তাতে যে অত দোকান পসার সাজিয়েছে এই ওদের খুব বাহাতুরী!

আমাদের বদরীর পাণ্ডা বস্তিরাম ঈশ্বরীপ্রসাদ দেরাদুনে পঙ্কুর সঙ্গে পাকাপাকি করে নিয়ে জামিন স্বরূপ এযাবৎ নিজের গোমস্তা মহাতাপ সিংহকে আমাদের সঙ্গে দিয়ে রেখেছিলেন। বদরীর পাণ্ডাদের স্থায়ী বাস দেবপ্রয়াগে। বদরী ও দেবপ্রয়াগের পাণ্ডা একই। সেখানে পাণ্ডার ভাইপো ও ভাগ্নে আমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ক'রে আবার ডবল করে পাকা করে রাখেন। এখানে এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা হলো। আমাদের প্রতীক্ষা করছিলেন।

মহাতাপ সিংকে কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই পাঠান হয়েছিল। ইতিমধ্যে আমাদের ক্রমাগতই কেদারের পাণ্ডাজীকে মনে পড়ছিল। পাণ্ডাশ্রেণীতে যে অমন ভদ্র বিনীত এবং স্নেহশীল লোক আছেন, আগে তার কোন ধারণাই ছিল না। কেদারের তিন মাইল পূর্ব্বে থেকে তাঁদের সমস্ত পরিবার এগিয়ে এসে আমাদের কত যত্নই না করেছিলেন। এঁদের সে রকম কিছুই দেখা গেল না। তবে এসে পৌছলে দেখা গেল যে এঁরাও একখানি ভাল বাড়ীতেই আমাদের নিয়ে এলেন। ঘরগুলি বেশ বড় বড়, দরজা জানালা এখানে সকল বাড়ীতেই আছে। কিন্তু এই বাড়ীটা নূতন তৈরী এবং এর গায়েই বরফের স্তূপ রয়েছে ব'লে বাড়ীটা বেশী ঠাণ্ডা হওয়ায় অন্য একটী খটখটে দেখে বাড়ীতে আমাদের বাসা ঐ পাণ্ডারাই স্থির করে দিলেন। এরও মেঝেতে চেটাইএর উপর কোমল পুরু ভোট কম্বল বিস্তৃত এবং কার্পেট পাতা। কুলীদের জিনিষপত্র নিয়ে পাণ্ডার লোকদের সঙ্গে নূতন বাসায় যেতে ব'লে আমরা এই বাড়ীতেই কিছু

বিশ্রামাদি ক'রে নিয়ে কাপড় চোপড় বদলে দেব দর্শনে চল্লেম। মন্দিরের নীচেই প্রকাণ্ড বাঁধান চৌবাচ্ছায় গরম জলের ঝরণা নেমে শীতার্ত্ত পথিকদের জন্যে সর্ব্বদাই প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, সেই জল আনিয়ে নেওয়া হলো। পানীয় অবশ্য সে জল নয়, ঝরণার জল গরম করে খাওয়া হলো। শুধু খেলে দাঁত খসে যায়।

আমাদের সঙ্গে উখিমঠের ও জোশিমঠের দুই রাওলের নামেই রিয়াসত টিহিরির কাউন্সিলের মেম্বর ও চিফ জজ পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদের চিঠি ছিল। দেরাদুনের উকিল শরৎচন্দ্র সিংহের সাহায্যে রাজা নরেন্দ্র সহায়েরও (বর্ত্তমান রাজার খুল্লতাত এবং রাজার বিলাত প্রবাসকালে তাৎকালীন রাজপ্রতিনিধি এবং রিজেণ্ট) পত্রোত্তর দেব প্রয়াগে পাওয়া গিয়েছিল। উখিমঠের রাওল এই পত্র পেয়েই আমাদের মন্দিরাদি দর্শনের সুব্যবস্থা করে দেন। এখানের রাওলের নামের পত্রখানিও তাঁকে দেবার জন্যে পাণ্ডাদের হাতে দেওয়া হলো।

বদরীনাথের মোহান্ত বা রাওল ছ'মাস জোশিমঠে ও ছ'মাস বদরীতে বাস করেন। ইনি জাতিতে দক্ষিণী নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ। তিনি স্বহস্তে বদরীনাথের পূজা করেন, তিনি ছাড়া বিগ্রহস্পর্শের অধিকার আর দ্বিতীয় ব্যক্তির নেই। এটী কিন্তু অতি [illegible]কার ব্যবস্থা! আমরা রাওলজীকে অপরাহ্নে ভোগ নিবেদন ও সন্ধ্যায় শয়ন আরতি করতে, প্রত্যুষে মঙ্গল আরতি, প্রভাতে দেব বিগ্রহকে স্বহস্তে স্নান অঙ্গরাগাদি ক'রে পূজা করতে দেখেছি। এতটা যে দেবৈশ্বর্য্য ভোগাধিকারী তবু যা হোক দেবতার কতকটা সেবাও ত করতে হয়।

বদরীনাথের মন্দির সুবৃহৎ।—নূতন সংস্কার করা হয়েছে। অঙ্গনটী

বেশ প্রশস্ত। ভোগোৎসর্গের সময়ে গিয়ে দেখি ন স্থানং তিল ধারয়েৎ। লোকে লোকারণ্য! এতদূরেও দর্শকের ভিড় তো বড় সোজা হয়নি! কেদারে গিয়ে কিন্তু বিশ পঁচিশের বেশি লোকই দেখিনি। প্রায় শতাবধি হাঁড়িতে ডাল ভাত। মোটা মোটা আলোচালের ভাত আর খোসাশুদ্ধ কড়াইএর ডাল হাঁড়ি থেকে উঁচু হয়ে উঠেছে।

রাওল সাহেবের নামের সেই চিঠি আমাদের পাণ্ডা তাঁকে পাঠাননি তা' জানা গেল। কিন্তু কেন পাঠাননি সেটা তখন সঠিক জানা যায়নি। তাঁরা বল্লেন, "এ সময় দেখা হওয়া সম্ভব নয়।" অথচ আমাদের দেবদর্শনেরও কোন উপায় দেখা গেল না। বাইরের এ ভিড় ছাড়া খবর পাওয়া গেল যে ভিতরে দুই শত সাধু সন্ত ধাঁটী আগলে আছেন। (এই সাধুর দলপতিকে আমরা পথে দেখেছি, ইনি নাকি কাশীর অন্নপূর্ণা মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা, সঙ্গে অতগুলি দলবল।)

আগে আগে চোপদাররা লাল পাগড়ী বেঁধে সোণার আশাসোটা নিয়ে দেখা দিলে। রাওল সাহেব এলেন। রাওল সাহেবের বয়স নেহাৎই কম, ত্রিশের তো অনধিকই হবে। গরম কাপড়ের পাজামা, আচকান, কাণ ঢাকা টুপি পরা, পা খালি। মন্দিরে ঢুকে গিয়ে খানিক পরে এক স্বর্ণখচিত পাণিশঙ্খ হাতে বেরিয়ে এসে তিনি ভোগোৎসর্গ করলেন। তারপর যখন মন্দির প্রদক্ষিণ ক'রে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন পঙ্কু তাঁর নামের চিঠিখানা লোক দিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিয়ে পরক্ষণে নিজেই তাঁর সম্মুখীন হলো।

দু' একটা কুশল প্রশ্ন ক'রে পার্শ্ববর্ত্তী কর্ম্মচারীকে আমাদের ঠাকুর দেখার ব্যবস্থা করতে আদেশ দিয়ে রাওল সাহেব প্রস্থান করলেন।

প্রথম ভিড়টা একটু কমে গেলে, বাকি লোকদের সরিয়ে দিয়ে রাওল সাহেবের কর্ম্মচারী আমাদের একেবারে মন্দির দ্বারের সাম্‌নে এনে ঠাকুর দেখালে। এত ভিড়ের মধ্যে যে এ ভাবে অভীষ্ট দেবতার দর্শন লাভ করতে পার্ব্বো, সে আশা ছিল না।

মন্দির-গর্ভ অন্ধকার, সম্মুখে উজ্জ্বল দীপালোক, তা'তেই অজস্র বনফুলের মালা পরা বিগ্রহ মূর্ত্তি যতদূর সম্ভব দেখা গেল। বিশাল পথের বদরীলাল, নিজে কিন্তু বামনাবতারের মতই খর্ব্বদেহে অধিষ্ঠিত। এখানে শুধুই দর্শন,—স্পর্শন বা পূজা নেই। তা নাই থাক, তবু মনপ্রাণ তৃপ্ত হোল।

মা লক্ষ্মী একটী ছোট্ট মন্দিরে বদরীজীর মন্দিরের বামভাগে রন্ধনশালার এলাকায় প্রতিষ্ঠিতা। এই দিকটাই বৈকুণ্ঠেশ্বরের অন্তঃপুর বিভাগ। রান্নাঘরটী সুবৃহৎ। ভিতর দিয়ে একটী ঝরণা ঝরছে, তাতেই রান্নাবান্না হয়।

গণেশ, গরুড়, হনুমান সবাই বৃহৎ অঙ্গনের এদিক ওদিকে আস্তানা গেড়ে পূজা নিচ্চেন, পয়সা জমা করচেন।

নূতন বাসাটী বেশ খটখটে, গরমও অনেকটা। তুলারাম, মহাতাপ বিছানা পেতে চায়ের জল চড়িয়ে রেখে দিয়েছিল

বদরীপুরীর ভিতরেও স্থানে স্থানে পথে ঘাটে এখনও চাঁই চাঁই বরফ পড়ে আছে। গলির মধ্যে জমা বরফ থেকে জল ঝ'রে পিছল হয়ে রয়েছে। আমাদের বাসার ঠিক পিছন দিকেই একটা ছাতওয়ালা দরজাহীন ঘরের মধ্যে এক কুড়ি ইঞ্চি পুরু ফুট দশেক লম্বা বরফের স্তূপ যে কেমন করেই ঢুকে বসে আছে, বুঝতে পারা গেল না! বাড়ীর ছাদে,

বারান্দার কার্ণিসে, প্রাচীরের তলায় গড়িয়ে প'ড়ে জ'মে থাকা বরফের গাদার অভাব মোটেই নেই। তা' নাই থাক্, তবু কেদারের পর এ সব দৃশ্য এবং এখানের শীত আমাদের কিছু বেশি বোধ হলো না। এ শীত যতই থাক, বেশ উপভোগের মত শীত। উজ্জ্বল অপরাহ্নে শুভ্র গিরিশৃঙ্গ পথঘাট, ময়দান, পথিপার্শ্ব সমস্তই যেন শরৎ-জ্যোৎস্নার মতই ঝলমল করচে। সূর্য্যাস্তের শেষ রশ্মি তার উপর অপরূপ শোভা ও ঔজ্জ্বল্য বিকীর্ণ করে রেখেছে। সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল আরক্ত আভা মন্দিরের স্বর্ণচূড়ায় প্রতিফলিত হচ্চে। তা, অলকানন্দার শীতল জলে রক্ত পদ্ম ফুটিয়ে তুলেছে। আর চারিদিক থেকে সহস্র ভক্ত-কণ্ঠে সঘনে উচ্চারিত হচ্চে—

"জয় বদরীবিশাল লালকী জয়!"

শ্রীমান্ অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,—কল্যাণবরেষু—

আমি এখানে পৌছে তোমাদের চিঠি-পত্র পাবার আশা করেছিলেম, সব্বাইকারই কতকগুলি ক'রে চিঠি এসেছে, তোমাদেরই চিঠি নেই! দেরাদুনের পত্রে বীরুর কাছে খবর পেলুম ইনি তাকে চিঠি দিয়েছেন এবং আমাকেও দিচ্চেন। কি জানি, হয়ত কাল সে সব আসবে। এখানে আমরা এখন দু'দিন আছি! দেরাদুন থেকে প্রেরিত পাণের ও পঙ্কুর সিগারেটের পার্শ্বেলও এসে পৌছয়নি, কাল যদি আসে।

রাত্রে মহাতাপ জানালে মহাপ্রসাদ আসবে, রান্নার দরকার নেই। সুখবর! কারণ আমাদের বামুন চাকর আশু পরশু দুজনেই অসুখে পড়েছে। আজ আশু তো পায়ের ব্যথার জন্য কাণ্ডি চ'ড়েই এলো,

রান্না করতে হলে নিজেদেরই নড়তে হবে। কিন্তু মনে মনে একটু সন্দিগ্ধ হয়ে থাকা গেল, আমাদের এই জন ষোল লোককে আহার জোগাবার মত আগ্রহ পাণ্ডাদের এ পর্য্যন্ত কোন ব্যবহারেই তো দেখতে পাই নি! কিন্তু যথাকালে দেখা গেল, পাণ্ডাজীরা জন পঞ্চাশেক লোকের উপযুক্ত : হাঁড়ি ভাত, এক হাঁড়ি ডাল, প্রচুর পরিমাণে তিন চার রকম ব্যঞ্জন, মোরব্বা, আচার, পাঁপর ভাজা, কয়প্রকারের মিষ্টান্ন আরও নানারূপ চেনা অচেনা সুখাদ্য পাঠিয়েছেন। বল্লেন আজকের যাত্রী ভোজটা ওঁদেরই দেয়। আমরা আমাদের খাবার যোগ্য রেখে কুলিদের জন্যে দিলুম। তাদেরও আজকের খাওয়াটা পাণ্ডাদের কাছে পাওনা।

এখানে শ্বাসকষ্ট তেমন কিছু হয়নি বটে, তবু রাত্রে বুকে একটা ভার বোধ ও প্যালপিটেশন হয়ে ভাল ঘুম হয়নি, কিন্তু তাহোক মনটা বড্ড তৃপ্তিতে ও শান্তিতে ভরে রয়েছে। প্রত্যূষে তৈরি হয়ে নিয়ে মন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা গেল। আমাদের ইচ্ছা অত সকালের বিষম ভিড়ে তপ্তকুণ্ডে স্নানার্থ না গিয়ে, প্রথমে শুচি বস্ত্রে দেবদর্শন ও পিতৃতর্পণ সেরে নিয়ে পরে স্নান করা যাবে। এ কথা শুনে কিন্তু পাণ্ডারা খুব চটে গেল। এই নিয়ে পঙ্কুর সঙ্গে একটু বাদানুবাদের পর তারা অগত্যাই অপ্রসন্নচিত্তে থেমে পড়ল। তাদের দলের একটি কম বয়সী ছেলে অপর একজনকে লক্ষ্য করে আমাদের শুনিয়ে বল্লে, "এরা দান পুণ্য কিছুই করতে আসেনি, সদাব্রতর চিঠি এনেছে।"

তখন আমরা এ ঠাট্টার মানে বুঝিনি যে, সে চিঠি সেই রাওল সাহেবের নামের চিঠি! এর মধ্যে অনেক কথা আছে, সে কথা পরে লিখছি।

নারদগঙ্গা ঘাট, ঋষিধারা, কূর্ম্মধারা, প্রহ্লাদধারা এবং ব্রহ্মকপাল, তপ্তকুণ্ড এইগুলি স্নানের যোগ্য স্থান। এর মধ্যে ব্রহ্মকপালে তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করতে হয়। এখানের পুরোহিত বেশ নির্ভুল মন্ত্রে আমাদের পিণ্ডদানাদি করিয়ে দিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। দক্ষিণা ও দান দ্রব্য তাঁদের মনঃপূত না হওয়ায় তাঁরা বিশেষরূপ রুষ্ট হয়ে উঠলেন। দু'জন বড়লোক এসেছে কাজেই আশাটা কিছু কিঞ্চিৎ বেশী হয়েই গেছলো।

বদরীতে প্রধানতঃ চার শ্রেণীর পাণ্ডা বা পুরোহিত আছে। প্রধান জোশি মঠের রাওল, ইনি স্বহস্তে বিগ্রহের সমস্ত সেবা পূজা করতে বাধ্য এবং দেব-প্রণামী ও ভেটের দ্রব্যাদি সমস্তই এঁর প্রাপ্য। পূর্ব্বে এঁদের ব্রহ্মচারী হওয়াই নিয়ম ছিল, মধ্যে সে সব নিয়ম গিয়ে এঁর পূর্ব্ববর্ত্তী রাওল অসবর্ণ বিবাহ পর্য্যন্ত করেছিলেন। এঁর সময়ে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু চরিত্র সম্বন্ধে এঁরও খুব সুনাম নেই। পূর্ব্বে গড়বাল রাজের অধিকার থাকায় এঁরা কিছু শঙ্কিত থাকতেন, এখন তাঁর তো আর এঁদের কোন অন্যায়ের দণ্ড দেবার সামর্থ্য নেই, কাজেই এঁরা নির্ভয় হয়ে বৈদেশিক রাজত্বের রক্ষাকবচ এঁটে যথেচ্ছাচার করচেন!

দ্বিতীয়তঃ পাণ্ডার দল—এঁরা আবার দুভাগে বিভক্ত, ডিমরী এবং দেবপ্রয়াগী। এঁদের পাওনা ডিমরীর মন্দির পরিক্রমার সময়, এবং দেব-প্রয়াগীদের তপ্তকুণ্ডে। (সেই জন্যেই আমরা প্রথমে তপ্তকুণ্ডে স্নান করবো না বলায় তাঁরা অমন চটে উঠেছিলেন! আমরা তো এসব তখন জানতুম না।)

তৃতীয়তঃ ব্রহ্মকপালের পুরোহিতবর্গ, এঁরা হঠবাল, কোঠিয়াল এবং

সত্তি জাতীয় ব্রাহ্মণ। এর মধ্যে আবার এত ছোট-খাট বিভাগ আছে সে সব মনে ক'রে রাখাও যায় না। এক এক দেবতার পূজারী এক এক জাতীয় ব্রাহ্মণ। সরোল, গাদাড়ী এই দুই শ্রেণী থেকে ডিমরী, হঠবাল, তুরিয়াল কোঠিয়াল কত রকমেরই ব্রাহ্মণ আছে। তাদের কেউ কেউ ভোগ রাঁধে, লক্ষ্মী মন্দিরে, গণেশ, কণ্টাকর্ণ, ক্ষেত্রপাল মন্দিরে পূজা করে, কেউ বদরীনাথের ভূষণ বস্ত্রাদি যোগান দেয়, এই রকম নানা জাতীয় ব্রাহ্মণ নানা কাযে নিযুক্ত থাকে। অন্যত্র যেমন দেবল ব্রাহ্মণকে হীন ধরা হয়, এখানে তা নয়। এখানে দেবল ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ধরা হয়, তাই এত শ্রেণীর ব্রাহ্মণের পূজারীত্ব। ব্রহ্মকপালের ব্রাহ্মণরা শ্রদ্ধাদি করিয়ে দক্ষিণা এবং শয্যা দান ঘোড়া দান হাতি দান ইত্যাদির জন্যে বিষম পীড়াপীড়ি করে থাকেন। পাণ্ডাদের সঙ্গে এঁদের মনোমালিন্য আছে তা বুঝতে পারা গেল। পঞ্চু যখন হাতি-ঘোড়ার দাম দিলে না, ওঁরা বল্লেন, "বুঝেছি দেব-প্রয়াগীরা দিতে বারণ করে দিয়েছে!"—তারা কিন্তু কিছুই দিতে থুতে বারণ করেনি, এটা এঁদের নিতান্তই মনগড়া অভিযোগ!

এখান থেকে বসুধারা প্রায় চার মাইল উপরে। ৮০০ গজ উপর থেকে বরফ গলা জলের ঝরণা নেমে থাকে, এবার কিন্তু এখনও জল জমে বরফ হয়ে রয়েছে, কাযেই দেখবার মত কিছু নূতন নয়।

দু'মাইল দূরে মানা গ্রামের নিকট ব্যাস গুহা। কথিত আছে এই-খানে বসেই বেদব্যাস চতুর্ব্বেদ ও শ্রীমদ্ভাগবত গীতা সঙ্কলন করেছিলেন। ঐ মানা গ্রাম তিব্বত যাওয়ার একটা রাস্তা। এর অধিবাসী তিনহাজার, এরা ভারতবর্ষের অনেক ভাষা জানে এবং দোভাষীর কাজ করে।

উত্তরাখণ্ডের পত্র

এখানের পৌরাণিক কথা এই যে, নর এবং নারায়ণ ঋষিদ্বয় সর্ব্বপ্রথম এই স্থানে তপস্যায় নিযুক্ত আছেন দেখে নারদ তাঁদের কাছে উপদেশ গ্রহণ করেন এবং নারদকুণ্ড যেখানে, সেখানে বসে তপস্যা করে সিদ্ধ হন। তারপর কতশত দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি এবং রাজর্ষি এখানের পুণ্যক্ষেত্রে তপঃসিদ্ধ হয়েছেন এবং বেদব্যাস এইখানে জগতের প্রথম গ্রন্থ বেদ সঙ্কলন করেন।

এখানের ইতিহাস সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায় তা এই:—যে মূর্ত্তিকে নারদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, উত্তর কালে বৌদ্ধ প্রভাব সময়ে সেই নারদ শিলা উৎপাটিত হয়ে অলকানন্দায় নিক্ষিপ্ত হয়। শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ নিরশন ক'রে ভারতবর্ষের চারিপ্রান্তে চারি মঠ স্থাপন করেন, তারপর রামানুজ স্বামী প্রাচীন ভাগবত ধর্ম্মের প্রচার করেন, তিনিই এখানের তপ্তকুণ্ডের নিকটস্থ গরুড় গুহার ঐ প্রাচীন নারদশিলা নারদকুণ্ড হতে উদ্ধার ক'রে পুনঃ স্থাপিত করেন এবং তাঁর এক শিষ্যকে এর সেবা পূজার ভার দিয়ে যান। এই মূর্ত্তি আজও মূল মূর্ত্তি ব'লে কথিত হয়ে থাকে। এই মূর্ত্তি ধ্যানাবস্থিত কমলাসন মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে অনেক রকম জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। কেউ বলে এই মূর্ত্তি নারদ স্থাপিত নারায়ণ মূর্ত্তি, আবার কারু কারু মতে এ মূর্ত্তি নাকি বুদ্ধ ভগবানের এবং এই মন্দিরটীও বৌদ্ধ মন্দির—শঙ্করাচা বৌদ্ধ পরাভব ক'রে এই মন্দির মায় মন্দিরাধিষ্ঠিত বুদ্ধদেবকে নারায়ণে পরিবর্ত্তিত করে দিয়েছেন। জৈনরা বলে ইনি ঋষভদেব। কিছুই আশ্চর্য্য নয়!—পুরীর মন্দিরের সম্বন্ধেও বুদ্ধ মূর্ত্তির কাহিনীর সঙ্গে জাতিভেদহীন অন্নসত্রের যে ব্যবস্থা, এখানেও সেটী বর্ত্তমান রয়েছে। হয়ত ছিল তাই এক সময়ে। আর আমাদের তো তাতে কোন আপত্তিও

নেই। বুদ্ধদেবকে তো আমরা ভগবানের নবম অবতার রূপে ধরেই নিয়েছি এবং এই বলে আমাদের উপাস্যকে সকল জাতি নীতিকুল গোত্রের উপরে তুলে ধরেছি ;—

"যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং নো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥"

আবার আর এক মতে বদরীনাথের বর্ত্তমান মন্দির রামানুজ সম্প্রদায়ী বরদরাজস্বামীর প্রেরণায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে গাড়োয়ালের রাজা তৈরি করে দিয়েছিলেন। মন্দিরশীর্ষের স্বর্ণ কলস প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী অহল্যাবাইএর দান ব'লে শুনলেম। মন্দিরের সংস্কার করা হয়েছে দেখলেম। বিকানীরের অধিবাসী কলকাতার ধনকুবের শেঠজীদের অনেকেরই যত্নে ও অর্থে এদিকের অনেক মন্দির সংস্কার ও নির্ম্মাণ এবং কেদার বদরী তুঙ্গনাথের দুর্গম যাত্রাপথ তৈরি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, আশা করি ভবিষ্যতেও হতে থাকবে। বদরীধামের শেষ সাড়ে আঠার মাইল এবং কেদার পথের শেষ সাত মাইলের মধ্যে মধ্যে বরফাবৃত স্থানের মাইল দুই বাদ দিয়ে বাকিটা যদি এঁদের ভিতরকার দুএকজন সত্যকার ধনবান শেঠজীর (আমাদের মত নকল শেঠ ও শেঠানী নয়!—এ পথে একটু অবস্থাপন্ন লোক দেখলেই সকলে তাদের শেঠ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে থাকে।) অনুগ্রহ দৃষ্টি পতিত হয়, তাহলে তাঁরা, তাঁদের পুত্র পৌত্রাদি, কত আশীর্ব্বাদই যে হাজার হাজার যাত্রীর কাছ থেকে লাভ করতে থাকবেন তা বলা

যায় না। নিজে যে দুঃখটা ভোগ করা যায়, সেটা অন্যে না পায় এ ইচ্ছা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, এবং শক্তিমানের পক্ষে এ ইচ্ছা পূর্ণ করে ফেলা অসম্ভব বা অস্বাভাবিকও নয়।

আমাদের কাছে এ সব অপ্রতিবিধেয়, তাই বদরীনাথের কাছে প্রার্থনা জানালুম তিনিই যেন তাঁর কোন সুযোগ্য ভক্তের চিত্তে এর জন্যে প্রেরণা দান করেন।

একজন ফটোগ্রাফারের সঙ্গে দেখা হলো। ফটো একখানি বই পেলুম না! এদেশের একটী লেখকের লেখা একটী বদরী বন্দনা একজনের কাছে লিখে নিই, পরে এর ছাপাও একটী পাওয়া গেল। সেই বন্দনাটী এই ;—

"পবন মন্দ সুগন্ধশীতল হেমমন্দির শোভিতম্।
শেষ সুমিরণ করত নিশিদিন ধরত ধ্যান মহেশ্বরম্॥
শক্তি গৌরী গণেশ শারদ নারদ মুনি উচ্চারণম্।
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের ধূনীধর ধূপদীপ প্রকাশিতম্।
যক্ষ কিন্নর করত কৌতুক জ্ঞান গন্ধর্ব্ব সুশোভিতম্।"

আরও কি কি আছে, মনে পড়ছে না।

বদরী পুরীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নানা মুনির আরও নানা মত জানতে পারা গেল। কিম্বদন্তী বলে যে কেদারের মন্দির তখন এইখানে ছিল এবং বদরীনাথ পূর্ব্বে নাকি তিব্বতের থালাং মঠে থাকতেন। সেখানে তিব্বতীরা চমরী গরু কেটে তাই ওঁকে নিবেদন করতো, তাইতে দুঃখিত ও বিতৃষ্ণ হয়ে উঠে থালাং মঠ ত্যাগ করে ছয় মাসের শিশুর মূর্ত্তিতে এখানে এসে বরফের উপর বসে বসে কাঁদছিলেন ; এ

দিকে পার্ব্বতী দেবী দয়া পরবশ হয়ে মহাদেবকে সেই সময় জিজ্ঞাসা করছিলেন, "আপনার অধিষ্ঠিত ক্ষেত্রে এই মূহূর্ত্তে কেউ অভাব-গ্রস্ত আছে কিনা ?"

মহাদেব উত্তর দেন, "কেউ অভাবগ্রস্ত নেই।" এমন সময় পার্ব্বতী সেই শিশুর ক্রন্দনে আকৃষ্ট হয়ে বেরিয়ে গিয়ে শিশুটীকে দেখে ব্যস্ত হয়ে তাকে কোলে করে নিয়ে এলেন এবং মহাদেবকে ভৎসনা করে বল্লেন, "আপনি যে বল্লেন কেউ অভাবগ্রস্ত নেই,—দেখুন দেখি এর কত অভাব !"

মহাদেব হেসে বল্লেন, "দেবি, ও আবার শিশু কোথায় ? ওতো একটা মস্তবড় ঠগ ! ওকে এখনই বার ক'রে দাও নাহলে ওই তোমায় বার করবে।"

পার্ব্বতী দেবী সে কথায় কর্ণপাত না করে শিশুটীকে পরম স্নেহে প্রতিপালন করতে লাগলেন।

তারপর একদিন অলকানন্দায় দুজন স্নান করতে গেছেন, ফিরে এসে দেখেন, মন্দিরের দোর বন্ধ। ডাকাডাকি করতে বদরীজী ভেতর থেকে ডেকে বল্লেন, "এ মন্দির এখন আমার হলো, তোমরা অন্যত্র পথ দেখ।"

তখন মহাদেব খুব হাসতে লাগলেন, আর গৌরীদেবী লজ্জায় অধোমুখী হলেন। অতঃপর তাঁরা দুজনে কেদার পর্ব্বতের বাসিন্দা হয়েছেন।

এমনই অনেক কাহিনী এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। কেদার আর বদরী ভূমি নাকি আগে পাশাপাশি ছিল, একজন পুরোহিত দুজায়গায়

পূজা করতো, তাতে তার স্ত্রী ভাত রেঁধে জোগাতে পারতো না ব'লে ঠাকুরদের ধ'রে ধ'রে এখন দুজনকে দশদিনের পথ ব্যবধানে সরিয়ে দিয়েছেন ইত্যাদি। অবশ্য এ সবই ভিত্তিহীন গাঁজাখুরি গল্প মাত্র! গল্প রচনা করতে মানুষ স্বভাবতঃই ভালবাসে।

মহাভারত বনপর্ব্বে পাণ্ডবগণের তীর্থভ্রমণ প্রসঙ্গে বদরী কেদারনাথের উল্লেখ দেখা যায়। ঐ গ্রন্থে এতদঞ্চলে যে সকল অপরাপর তীর্থ, পর্ব্বত, আশ্রমাদির নাম বর্ণিত হয়েছে, বর্ত্তমানে তাদের অধিকাংশেরই অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। স্বর্গে অস্ত্রবিদ্যাশিক্ষারত অর্জ্জুনের দীর্ঘ অদর্শনে উৎকণ্ঠিত তদীয় ভ্রাতৃগণ দ্রৌপদীর সমভিব্যাহারে তাঁর দর্শন কামনায় লোমশ ঋষির সঙ্গে এই অঞ্চলে আগমন করেছিলেন।

তে বয়ং তং নরব্যাঘ্রং সর্ব্বে বীরং দিদৃক্ষবঃ
প্রবেক্ষ্যামো মহাবাহো পর্ব্বতং গন্ধমাদনম্ ॥২২
বিশালা বদরী যত্র নরনারায়ণাশ্রমঃ।
তং সদাধ্যুষিতং যক্ষৈর্দ্রক্ষ্যামো গিরিমুত্তমম্ ॥২৩
কুবেরনলিনীং রম্যাং রাক্ষসৈরভিষেবিতাম্।
পদ্ভিরেব গমিষ্যামস্তপ্যমানা মহত্তপঃ ॥২৪
ন চ যানবতা শক্যো গন্তুং দেশো বৃকোদর।
ন নৃশংসেন লুব্ধেন নাপ্রশান্তেন ভারত ॥২৫

(বনপর্ব্বম্, ১৪১ অধ্যায়)

—"সেই নরব্যাঘ্র অর্জ্জুনকে দর্শনেচ্ছু হয়ে আমরা সকলে গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রবেশ করিব যে স্থানে নরনারায়ণাশ্রম বিশালা বদরী বিদ্যমান। সর্ব্বদা যক্ষগণে অধ্যুষিত সেই উত্তম গিরি আমরা দর্শন করিব। অনন্তর

আমরা অতিকঠোর তপস্যার অনুষ্ঠানপূর্ব্বক রাক্ষসগণ-সেবিত রম্য কুবের সরোবরে পদব্রজে গমন করিব। হে বৃকোদর, সেই দেশে যানারোহী নৃশংস লুব্ধ ও অপ্রশান্ত ব্যক্তিগণ গমন করিতে সমর্থ হয় না।"

দদৃশুর্ব্বিবিধাশ্চর্য্যং কৈলাসং পর্ব্বতোত্তমম্।
তস্যাভ্যাসে তু দদৃশুর্নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥ ১৮
উপেতং পাদপৈর্দ্দিব্যৈঃ সদাপুষ্পফলোপগৈঃ।
দদৃশুস্তাঞ্চ বদরীং বৃত্তস্কন্ধাং মনোরমাম্ ॥ ১৯

(বনপর্ব্ব ১৪৫ অধ্যায়)

—"তাঁহারা বিবিধ আশ্চর্য্যসম্পন্ন গিরিশ্রেষ্ঠ কৈলাস দর্শন করিলেন। তাঁহারা সমীপস্থ নরনারায়ণাশ্রম দর্শন করিলেন। অনন্তর সর্ব্বদা ফলপুষ্পশালী রমণীয় পাদপসমূহযুক্ত মনোরম বদরী দর্শন করিলেন।"

এই প্রসঙ্গে বদরী প্রদেশের এক বিবরণও দেওয়া হয়েছে, তা থেকে এক অংশ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

* * সদা দিব্যাং মহর্ষিগণসেবিতাম্।
মদপ্রমুদিতৈর্নিত্যং নানাদ্বিজগণৈর্যুতাম্ ॥ ২২
অদংশমশকে দেশে বহুমূলফলোদকে।
নীলশাদ্বলসংচ্ছন্নে দেবগন্ধর্ব্বসেবিতে ॥ ২৩
সুসমীকৃতভূভাগে স্বভাববিহিতে শুভে।
জাতাং হিমমৃদুস্পর্শে দেশেঽপহতকণ্টকে ॥ ২৪

(১৪৫ অধ্যায়)

—"দিব্যা বদরী সদা মহর্ষিগণসেবিত ও বহু দ্বিজগণ অধ্যুষিত। ঐ দেশ দংশ মশকাদি শূন্য, বহু ফলযুক্ত, নীলবর্ণ শৈবাল সমাচ্ছন্ন এবং

দেব গন্ধর্ব্বগণ তথায় বাস করিয়া থাকেন। ঐ শুভ প্রদেশ স্বাভাবতঃই সমতল এবং হিম সম্পর্কে সুখসেব্য। ঐ দেশ কণ্টকশূন্য।"

তামুপেত্য মহাত্মানঃ সহ তৈব্রাহ্মণর্ষভৈঃ।
অবতেরুস্ততঃ সর্ব্বে রাক্ষসস্কন্ধতঃ শনৈঃ॥ ২৫
ততস্তমাশ্রমং রম্যং নরনারায়ণাশ্রিতম্।
দদৃশুঃ পাণ্ডবা রাজন্ সহিতা দ্বিজপুঙ্গবৈঃ॥ ২৬

—"মহাত্মা পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণগণের সহিত বদরী উপনীত হইয়া রাক্ষসস্কন্ধ হইতে অবতরণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ব্রাহ্মণের সহিত সেই রম্য নারায়ণাশ্রম দর্শন করিলেন।"

পাণ্ডবগণ বদরিকাশ্রমে কিছুকাল বাস করেন। অনন্তর তাঁরা অর্জ্জুনের সন্ধানে আরও উত্তরে গমন করলেন। নরনারায়ণাশ্রম হতে বাহির হয়ে ক্রমাগত উত্তর মুখে গমন করে তাঁরা সপ্তদশ দিবসে হিমালয়ের পৃষ্ঠদেশে রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার আশ্রমে গমন করেন। তারপর সেখান হ'তে উত্তর মুখে তিন দিন চ'লে যাবার পর চতুর্থ দিন কৈলাস পর্ব্বতে উপস্থিত হন।

বলা বাহুল্য এই কৈলাসই আধুনিক তিব্বতরাজ্যের অন্তর্গত মানস-সরোবরের সমীপবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ কৈলাসগিরি। ব নারায়ণাশ্রম আগমনের পথে ১৪৫ অধ্যায়ে বর্ণিত কৈলাস হ'তে এটা সম্পূর্ণই বিভিন্ন। প্রথমোক্ত কৈলাস বর্ত্তমান কেদার পর্ব্বত। আধুনিক কালেও কেদারের পরবর্ত্তী ধবল পর্ব্বতের এই সংজ্ঞা দেখা যায়। মহাভারতের এই অংশ রচনাকালেও কেদার কৈলাস নামে পরিচিত তা' এই থেকে বোঝা যায়।

ক্বচিৎ পদ্ভ্যাং ততোঽগচ্ছদ্রাক্ষসৈরুহ্যতে ক্বচিৎ।
তত্রতত্র মহাতেজা ভ্রাতৃভিঃ সহ সুব্রতঃ॥ ১৫
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা বহূন্ ক্লেশান্ বিচিন্তয়ন্।
সিংহ ব্যাঘ্র গজাকীর্ণামুদীচীং প্রযযৌ দিশম্॥ ১৬
অবেক্ষমাণঃ কৈলাসং মৈনাকঞ্চৈব পর্ব্বতম্।
গন্ধমাদনপাদাংশ্চ শ্বেতঞ্চাপি শিলোচ্চয়ম্॥ ১৭
উপর্য্যুপরি শৈলস্য বহ্বীশ্চ সরিতঃ শিবাঃ।
পৃষ্ঠং হিমবতঃ পুণ্যং যযৌ সপ্তদশেঽহনি॥ ১৮
দদৃশুঃ পাণ্ডবা রাজন্ গন্ধমাদনমন্তিকাৎ।
পৃষ্ঠে হিমবতঃ পুণ্যে নানাদ্রুমলতাবৃতে। ১৯
সলিলাবর্ত্তসঞ্জাতৈঃ পুষ্পিতৈশ্চ মহীরুহৈঃ।
সমাবৃতং পুণ্যতমমাশ্রমং বৃষপর্ব্বণঃ। ২০ (১৫৮ অধ্যায়)

—"ভ্রাতৃগণ সহিত যুধিষ্ঠির কোনস্থানে পদব্রজে, কোথাও রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তিনি সিংহ ব্যাঘ্র গজসমাকীর্ণ উত্তর দিকে গমন করিতে করিতে বহুবিধ পথের ক্লেশের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি কৈলাস, মৈনাকপর্ব্বত, গন্ধমাদনগিরির পাদদেশ প্রস্তরখণ্ড সমাবেশে শ্বেতবর্ণ দেখিলেন। শৈলসমূহের উপরে উপরে তিনি বহুবিধ নদী দেখিলেন। এইরূপে ক্রমাগত যাত্রা করিয়া সপ্তদশ দিবসে তাঁহারা হিমালয় পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে উপনীত হইলেন। তথায় গন্ধমাদন পর্ব্বতের নিকটে, নানাবিধ তরুলতাসমাচ্ছন্ন হিমালয়ের পৃষ্ঠে বিবিধপুষ্পিত বৃক্ষ ও সলিলাবর্ত্ত সমুদয়ে সমাবৃত রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার পরম পবিত্র আশ্রম দর্শন করিলেন।"

ঐখানে তাঁরা সপ্তদিবস বাস করেন। অষ্টম দিবসে রাজর্ষির অনুমতি লইয়া তাঁরা সেখান হতে উত্তরদিকে প্রস্থান করলেন।

তেঽনুজ্ঞাতা মহাত্মানঃ প্রযযুর্দ্দিশমুত্তরাম্ ॥ ২৭

*　　　　*　　　　*

পদাতিভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং প্রাতিষ্ঠত যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩০

নানাদ্রুমনিরোধেষু বসন্তঃ শৈলসানুষু।

পর্ব্বতং বিবিশুঃ শ্বেতং চতুর্থেঽহনি পাণ্ডবাঃ ॥ ৩১

মহাভ্রঘনসঙ্কাশং সলিলোপহিতম্ শুভম্।

মণিকাঞ্চনরূপস্য শিলানাঞ্চ সমুচ্চয়ান্। ৩২

"যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। নানাদ্রুমযুক্ত শৈলসমূহের সানুদেশে বাস করতঃ চতুর্থ দিবসে পাণ্ডবগণ শ্বেত বা কৈলাস পর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন। ঐ পর্ব্বতের আকার ঘনঘটার ন্যায়, উহাতে জলাশয় আছে এবং মণিকাঞ্চন রৌপ্যের স্তূপ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে।"

মহাভারতে অলকনন্দা নদী বদরীপ্রভবা ব'লে উল্লিখিত হয়েছে। যথা—

এষা শিবজলা পুণ্যা যাতি সৌম্য মহানদী।

বদরীপ্রভবা রাজন্ দেবর্ষিগণসেবিতা ॥—(বনপর্ব্ব, ১৪২ অধ্যায়, শ্লোক ৪)

এই মহানদী গঙ্গা বা অলকনন্দা ব'লে টীকাকার নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যা করেছেন। কয়েকটী শ্লোক পরে আকাশগঙ্গা নামে আবার তার উল্লেখ দেখা যায়। এখন ইনিই সেই অলকানন্দা নামধারিণী পুণ্যসলিলা নদী।

উত্তরাখণ্ডের পত্র

শ্রীমতী কল্পনা দেবী—কল্যাণীয়াসু—

বদরীনাথে খুব আনন্দেই কেটে গেল। সুন্দর দৃশ্য এবং সর্ব্বদাই যেন দেবভাবে ভাবিত হয়ে থাকা, তীর্থস্থানের যা মাহাত্ম্য তা' প্রত্যক্ষ অনুভূত হচ্ছিল। বাস্তবিকই তো আর দেবতা সমস্ত সংসার ছেড়ে এসে এইখানের এই মন্দিরটীতেই লুকিয়ে বসে নেই, তবু সব জেনে শুনেও যে এই কষ্ট করে আসা, তার মধ্যে অ্যাডভেনচারের অনেকখানি লোভের সঙ্গে মেলানো যে ভক্তির প্রবণতা একটু খানিও আছে, সেইটুকুই আমাদের তীর্থদর্শনকে সুফল প্রদান করে। হিন্দু তার সকল কাজের সঙ্গেই একটা আধ্যাত্মিকতার আবরণ দিয়ে সেটাকে পবিত্র করতে চেয়েছিল। খাওয়া বেড়ানো সবতা'তেই শুধু নিজের লোভটাকে জাহির না করে' সে সেইগুলির সঙ্গে দেবতার নাম সংযোগ করে শোভন করে নিয়েছিল। নৈলে শঙ্করাচার্য্য ভারতের চার প্রান্তে চারটী প্রধান মঠ না করে' ওগুলিকে তদানীন্তন রাজধানীতেই তো অক্লেশে প্রকাণ্ড একটী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে স্থাপন করতে পারতেন!

এইবার আমাদের ফেরবার পালা। মনটাও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে, আকর্ষণও কেটে গেছে, কিন্তু ১৮৩ মাইল ফিরতে হবে মনে হলেই যেন ভয় করচে।

২৩শে সোমবার বেলা নটার সময় বেরিয়ে আমরা দুপুরবেলা লাম্বগড় এবং রাত্রে ঘাট চটিতে থাকলুম। ফটোগ্রাফারকে বলা হ'ল যা' কিছু ফটো তুলবে, আমাদের যেন পাঠায়। আমাদের দুইটা গ্রুপ্ সে তুল্লে।

২৪শে খনোটীতে দুপুরবেলায়, রাত্রে পাতাল গঙ্গা। দিনটা ভাল ছিল না, মেঘলা, জোর হাওয়াও বইছিল, আমাদের থেকে খানিক দূরে

একখানা লম্বা চালায় আগুন ধরে খুব ভয় পাইয়েছিল। সেখানে আমাদের কুলিগুলো ভাত রাঁধছিল, আহা বেচারারা! ভাল করে সেবেলা খেতেও পেলে না।

পাতাল গঙ্গায় গিয়ে পাতালগর্ভে নামতে নামতেই এইদিন আমাদের নিয়মের বহির্ভূত ব্যাপার ঘটল,—অর্থাৎ রাত হয়ে গেল। এদিকে চটিতে পৌঁছে জানা গেল, ভীষণ রকম ভিড় হয়েছে, কোথাও বেশি ঘর পাওয়া যাচ্চে না। আমাদের এ পর্য্যন্ত এ রকম দুর্দ্দশা হয়নি। একটু ভয় সকলেই পেলুম। তুলারাম খুব বকুনি খেলে, কিন্তু তাতে তো আর অবস্থা বদলালো না। এদিকে রাত হয়ে গেছে, আরও মাইল কতক যে এগুনো যাবে তারও সময় নেই।

অগত্যা সেই নীচের তলার দুখানি পাতাল ঘরেই ঢুকে বসা গেল। অনেকেই রাগ করে বল্লেন, আজ আমরা বসেই রাত কাটাব, এর মধ্যে আর শুচ্চি না! তোমার সেজ মাসীমাও যখন চটে উঠল, তখন তাকে আমি খুব বকুনি দিলুম। এতদিন কোন অসুবিধা হয়নি বলেই যে একদিনও হবে না, এমন আশা করেই কি এই দীর্ঘ পথে বেরিয়েছিলে? পঙ্কু তো কই কোন কষ্ট বোধ কচ্চে না, মনে কর না কেন এও একটা আমোদ!

যাহোক উপরতলার বড় ঘরে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা ছিলেন, তাঁরা আমাদের অবস্থা দেখে সেইটেই দিলেন। দুঃখ দূর হল।

২৫শে পিপলকোটিতে রূপার কাজ করা কুক্রী, ফারের টুপি, শিলাজিত প্রভৃতি কেনা হল। তোমার সেজ মাসীমা দুটো পাহাড়ী কুকুর ছানা কিনে নিয়েছে। তারা খানিক ডাণ্ডি চেপে, খানিক কোলে,

খানিক চলে খাসা যাচ্ছে। দেখতে খুব সুশ্রী, কিন্তু এত শীতের জীব গরম দেশে গিয়ে পৌঁছবে কিনা সন্দেহ! রাত্রে ছিন্‌কায় গোর্খা সৈন্যদলের জন্য তৈরি দোতলা ভাল বাড়ীতে বাসা পাওয়া গেল। হ্যাঁ, লিখতে ভুলে গেছি, আজ সকালেই পাতাল-গঙ্গা থেকে বেরুবার সময় আমাদের কেদারের পাণ্ডাজী এসে পৌঁছেচেন। তিনি কেদারে পৌঁছে কার মুখে শুনেছেন যে, পথে আমাদের নাকি সর্ব্বস্ব চুরি গেছে। সেই শুনেই ছুটে এসেছেন।

বাঁচা গেছে! কুলিগুলো সব রুগিয়ে পড়্‌ছে, তুলারামটাও অসুস্থ হয়েছে, নূতন দুটো লোক নিয়ে পাণ্ডাজী আসায়, খুব উপকার হল। তাছাড়া উনি সঙ্গে থাকলে ঢের বল ভরসা ও সুবিধা পাওয়া যায়।

সন্ধ্যার পর একটা কুকুর বিকট চীৎকার করে ছুটে এসে উপরে উঠল, ভয়ে সেটা কাঁপছিল। দেখা গেল, তার গলা থেকে রক্ত পড়ছে। পাণ্ডাজী বল্লেন, ওকে বাঘে ধরেছিল। বাঘ নিশ্চয় কাছেই আছে। কি ভাগ্যি যে সিঁড়ির দোর ছিল! আমরা তো দোর দিয়েও সন্ত্রস্ত হয়ে রইলুম।

২৬শে মৈঠানায়, ঐদিন বৈকালে নন্দপ্রয়াগ সহরে, রাত্রে সোন্‌লায় পৌঁছানো হ'ল। নন্দপ্রয়াগে খুব বেশি কলেরা হচ্ছিল বলে, এখানে থাকা হ'ল না। এদেশের লোকেরা এই রোগকে ভয়ানক ভয় করে, আমাদের কুলিগুলো সহরের রাস্তা মাড়াতেই রাজী হ'ল না। ভারত-স্বেচ্ছাসেবক-সমিতির যে ছেলেটী আমায় শ্রীনগরে সন্ধ্যাবেলায় রাস্তায় বেড়াতে দেখে বাসায় পৌঁছে দিতে এসেছিল, তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। ছেলেটী বল্লে, রোগ এখন থেমে গেছে। দেশে প্রায় লোক

নেই, সব ভয়ে পালিয়েছে। আপনারা থাকবেন না সে ভালই, তবে পথে দেখে যেতে পারেন।

সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ ঘরবাড়ী, খুব পরিচ্ছন্ন সহর। হয়ত অসুখের জন্যই অতটা পরিষ্কার করা হয়েছে। দোকান বেশ বড় বড় আছে, তবে সবই প্রায় বন্ধ, দু একটী মাত্র খোলা ছিল। একটা থেকে আমরা চন্দনকাঠের কলম ও বদরীনাথের মূর্ত্তি-ছাপা এনামেল করা সেফটিপিন যা পাওয়া গেল, কিনে নিলুম। ফণীবাবু পঙ্কু ও পাণ্ডাজী ব্যস্ত হতে থাকলেও আমাদের কেনার আগ্রহ দমাতে পারলেন না। এ পথে একে ত কিছুই নেই, এই একটু যা পেলুম তাও ছেড়ে যাব? নন্দা দেবী বলে' যে ২৫০০০ ফিটের হিমালয় শৃঙ্গ আছে তাতেই নাকি নন্দা দেবীর মন্দির। সেখান থেকে নিঃসৃত নন্দ গঙ্গা ও অলকানন্দার সম্মিলন এই নন্দ প্রয়াগে।

ইতিমধ্যে একটা কোন চটিতে—ছিন্‌কাতেই বুঝি, দোকানদারের ছেলেকে পঙ্কু ওষুধ দিয়ে গেছল, তাতেই তার পুরনো রক্তামাশয় সেরে গেছে। সে পঙ্কুকে কিছু প্রণামী দিতে চাইলে, শেষটা টাকা দিতে না পেরে একছড়া কাঁচকলা পাকা উপহার দিলে। এদেশে ও জিনিষটা তো আর বাজে জিনিষ নয়! ওই বা পায় কে?

এদিকে ফসলের মধ্যে গম, যব, কলাই, তামাক এবং আলু এই কয়টী জিনিষই হয়। এছাড়া মঠ চটিতে পিঁয়াজ এবং চটুপিপলীর পথে জনারের ক্ষেত দু' পাঁচখানা মাত্র দেখেছি। এদিকে শাকশব্‌জির বড়ই অভাব। মশলার মধ্যে কিছু লঙ্কা গাছ রোপণ করা হচ্চে দেখা গেছে। কলাগাছ কমবেশি সর্ব্বত্রই। এদিক্‌টায় পাকা পাহাড়ী কলা কিছু বেশি বেশি দেখতে পাচ্চি, দেখতে কাঁচকলা পাকার মতই, তবে একটা খেয়ে দেখলুম

আঠা গন্ধ নেই। দুদিন থেকে সরষের তেলটার দাম কমেছে, ১।০সের মিলছে। চাল ॥/০ ॥৵০ এবং চালটা কিছু ভালও হচ্চে। ঘি ২॥০ টাকা সের ছিল, আজ ২৲ সের পাওয়া গেল। এদিকে একটু যে সস্তা হবে, তা' বাহ্য লক্ষণেই বোঝা যাচ্ছিল।

গৌচর চটির কাছাকাছি, আমাদের বাঁহাতি পাহাড়ের মাথায় হঠাৎ একটা প্রশস্ত গোচারণের মাঠ দেখতে পাওয়া গেল। লম্বা চৌড়া মাঠটী আধ মাইলের উপর হতে পারে। শুনলেম, এই ময়দানটী নাকি এদিকে গোচারণের দুঃখ দেখে এখানে আগত কোন পূর্ব্ব দেশীয় রাজা এখানের জমিদারদের কাছ থেকে নিষ্কর করে' কিনে নিয়ে সাধারণকে দান করে গেছেন। ঐ গোচারণের মাঠের নাম থেকে নিকটস্থ চটির এবং গ্রামের নামও গৌচর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মাঠের কাছাকাছি আমাদের ওপারে সুদৃশ্য সুফলা শস্যক্ষেত্রের মধ্যে এবং নদীর ধারে বহুতর সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রাম দেখা গেল। ওদের কয়েকটী গ্রামের নাম,—সোনারগাঁ, পুলসর, তৌজিয়ালি, কান্‌লা ইত্যাদি। এর মধ্যে সোনারগাঁ এ প্রদেশের স্বর্ণকারদের জন্য বিখ্যাত। এ অঞ্চলের অধিকাংশ সোনা রূপা এবং জহরতের কাজ এদের দিয়েই তৈরি হয়।

এই সব গ্রাম থেকে গৌচরের মাঠে অনেক গরু মহিষ চরতে আসে। একটা প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় ডাণ্ডি নামিয়ে কুলিরা তামাক খেতে বসল। ওরা একটুখানি কি পাতায় পাথর ঠুকে আগুন জেলে শুক্‌নো তামাক কল্কে করে খায়। আমি এই সময়টায় আশপাশ থেকে যতদূর পারি সংবাদ সংগ্রহ করে নিই।

একটী গ্রামিক খুব সুন্দর মজবুত একখানা দড়ির বোনা চ্যাটাই গোছ

জিনিষ নিয়ে যাচ্ছিল। পাণ্ডাজী বল্লেন, এখানকার লোকেরা সব কাজেই একটু সৌখীন।—কোন সময় ওই গড়গুলি বেশ উন্নতিশীল রাজ্য সমূহ ছিল আর কি!

১৩ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় সোন্‌লা পৌঁছান গেল। একটা কুলি সমানেই ভুগছে। বদরীর পথে কদিনের জন্য একটা নূতন লোক নেওয়া হয়েছিল, রামগড় থেকে পুরনো রোগীটাই আবার বাহাল হল। একবেলা আমার অজ্ঞাতে তাকে ওরাই অন্য ডাণ্ডির সঙ্গে বদল করে' দিয়েছিল, কারণ আমার ওজন যার সঙ্গে বদল করা হয় তার চাইতে কত সের বেশি। লোকটা একটুও সারেনি, কাজেই এই বদল করার ফলে যার সঙ্গে বদল করা হয়েছিল, তাকে খুবই কষ্ট পেতে হয়েছে।

কদিনই একটু হাঁটা বেশি হচ্চে। লোকটা একেবারেই ঝিগিয়ে পড়েছে, ওষুধ পথ্যি সমানেই দিয়ে সঙ্গে রাখা হয়েছে। আশা, বেচারা যদিই সেরে ওঠে।

সকাল বিকাল তোমার সেজ মাসীমা দু' মাইল এবং পঙ্কু চার মাইল করে কুলি দিচ্চে, বাকি তিন চার মাইল চলা যাচ্চে। মন্দ লাগচে না। পথ চলার আনন্দ প্রচুরতরই পাচ্চি। মধ্যে মধ্যে একটু ক্লান্ত করলেও এখানের সে ক্লান্তি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না।

সকাল সকাল সোন্‌লা ব্রিজ পার হয়ে চলতে আরম্ভ করলেম। আমার আশে পাশে উপরে নীচে সকল দিকেই ছোট বড় গ্রাম। নন্দপ্রয়াগের কিছু আগে থেকেই সেই যে প্লেনটা আরম্ভ হয়েছে, সেটা সমানেই চলেছে।

পারে না বহিতে নদী জলভার,
"মাঠে মাঠে ধান ধরেনাক আর,
ডাকিছে কোয়েল, গাহিছে,
দোয়েল,
তোমার কানন-সভাতে।"

এ-রূপ শুধু বাঙ্‌লারই একচেটে নয়, বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার বাহিরে সুদূর পর্ব্বতাকীর্ণ এই হিমালয় প্রদেশেও ভারতীয় এই চির-পরিচিত শ্যাম-স্নিগ্ধ রূপের অপ্রতুলতা দেখলেম না। নদীর তীর থেকে পাহাড়ের গা বয়ে মাথা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমুদয় ভূমি ভাগই নূতন শস্যে ঝলমল করচে। এখানটীকে একটী উপত্যকা বলতে পারা যায়। নন্দ-প্রয়াগ হতে কর্ণপ্রয়াগ কুড়ি মাইল, তারপর নগবাস্থ পর্য্যন্ত আট নয় মাইলের অধিকাংশ পথই এই উপত্যকার ভিতর দিয়ে। অবশ্য আমাদের যাত্রাপথ সর্ব্বত্রই প্রায় পাহাড়ের গা দিয়েই তৈরি এবং কর্ণপ্রয়াগের পথে বেশ রীতিমত একটী তিন মাইলের চড়াইও ছিল, পথটী নূতন নিয়মে তৈরি বলে তেমন কষ্টকর নয়।

সোন্‌লা থেকে তিন মাইল বাদে লাদাস্থ ...ছ আমরা একটা ভীষণ ঝড় বৃষ্টি পেলেম। পশ্চিম দিক্ থেকে ঘন কালো অন্ধকার করা মেঘের পর্ব্বত ঠিক যেন শত সহস্র মত্ত-মাতঙ্গের মতই তাদের বিকট শুণ্ড তুলিয়ে সবেগে ছুটে এল।

কিছুক্ষণের জন্য সেই অসংখ্য পর্ব্বতশ্রেণী, নিবিড় বনরাজি, কলোচ্ছ্বাসময় নদী-জল, নবীন তৃণাস্তৃতক্ষেত্র পৃথিবীর যত কিছু দৃশ্য সমস্তই একটা নিকষ কালো অভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কোথাও কিছু যেন আর এ বিশ্ব-সংসারে বাকি আছে বলে মনে হ'ল না। মনে হ'ল, হঠাৎ যেন প্রলয় হতে বসেছে। হঠাৎ দিদির লেখা সেই কবিতাটা মনে পড়ে গেল।

"সংহর সংহর রুদ্র! এ তব সংহার-বেশ,
সম্বর তাণ্ডব-নৃত্য, হে শম্ভু, হে প্রমথেশ!
মৃত্যুঞ্জয় জটাজাল, বদ্ধ কর মহাকাল,
প্রজ্বলিত নেত্রানলে শ্বাসরুদ্ধ হ'ল শেষ,—
ক্ষান্ত দাও ক্ষিপ্র নৃত্যে, শ্মশান হয়েছে দেশ।"

তারপর সেই বিরাট কালোর মধ্যে থেকে শ্বেত শুভ্র পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের স্তর ছুটে বেরিয়ে পড়ে পাহাড়ের মাথায় গায়ে, আমাদের দোরের সামনে দিয়ে পথের পরে' নদীর তীরে রাশি রাশি হাওয়ায় ওড়া পেঁজা তুলোর মত ঝড়ের হাওয়ায় থেকে থেকে এঁকে বেঁকে ছুটে নেচে হৈ হৈ করে বেড়াতে লাগল। কতকগুলো আবার গাছের ডালের গায়ে গায়ে জড়িয়ে গেল। তারপর মুষলের ধারে বৃষ্টি নেমে এল। এরকম বৃষ্টি এ পথে বেরিয়ে একদিনও আমরা পাইনি। আর তেমনি কি ঝড়!

যাহোক আমাদের আশ্রয়ও মিলেছে, গরম গরম খাদ্য, পানীয়ও প্রস্তুত। তবে কিনা কাণ্ডির আরোহিণীরা সময় মত না এসে পৌঁছানয় উদ্বেগের সীমা ছিল না। পঞ্চু সেই ঝড় জল মাথায় করে' তাদের খুঁজতে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, এমন সময় পাণ্ডাজী তাদের সঙ্গে করে এসে পড়লেন। বাঁচা গেল।

পাণ্ডাজীর যত্নের সীমা নেই!

কর্ণপ্রয়াগে পৌঁছাতে খুব বেশি দেরি হয়নি। বৃষ্টি মধ্যে মধ্যে

দুএকবার অল্প স্বল্প এসেছিল, সে ভেজ মত বৃষ্টি নয়। কর্ণপ্রয়াগে স্নানের ঘাটে নামতে খুব বেশি কষ্ট না; কিন্তু কপালক্রমে স্নান হল না, বৃষ্টি বাদলে ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে পঞ্চু বারণ করলে। জল স্পর্শ করে কর্ণেশ্বর শিব ও কর্ণমন্দি র্শন করা গেল। তীরে অনেক রকমারি রংয়ের উজ্জ্বল পাথর ছিল, কতকগুলি আমরা সংগ্রহ করেও আবার ফেলে রাখলুম। সব জায়গা থেকে যদি পাথর নিতে থাকি তাহলে আমাদের সঙ্গে একটী ছোটখাট গিরিশৃঙ্গ জমা হয়ে যাবে যে! তাই ও বিষয়ে আর মায়া বাড়াচ্ছিনে। যত নিয়েছিলুম চাটি করে ফেলে দিতে দিতে প্রায় শেষ হয়েই এসেছে।

কর্ণগঙ্গার সঙ্গে অলকানন্দার সম্মিলনে এই কর্ণপ্রয়াগের সৃষ্টি। পৌরাণিক দাতাকর্ণের এ নাকি তপস্যাভূমি। এখান থেকেই তাঁর একাঘ্নী অস্ত্র লাভ ঘটেছিল। এই একাঘ্নী অস্ত্রটা কি, বোমা?

পুলের ওপারে সহর। পুল বেশ বড়। দোকান বাজারও অনেকগুলি, তবে এর চেয়ে নন্দপ্রয়াগ ভাল।

শ্রীযুক্ত শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

রাত্রে চট্‌বা পিপ্‌লে থাকা হ'ল।

অমিকে একটা চিঠিতে লিখেছিলুম দেরাদুনে যেন তোমাকে ব'লে ৩০০৲ বা ৩৫০৲ টাকা পাঠায়। আমরা পৌঁছে হৃষীকেশ থেকেই ডাণ্ডিওলাদের ও মালকুলিদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে যাব। সবটাকা ফুরিয়ে গেছে। দেরাদুনে ফিরতে হবে বলে' এই রাস্তাতেই আমাদের ফেরা হবে, নাহলে রামনগর দিয়ে চলে যাওয়া হ'ত। অবশ্য এত

কুলি বদলের তাতে অসুবিধা খুবই পেতে হ'ত, একথাও পাণ্ডাজী বলছেন। তাছাড়া পঙ্কুরা যখন আরও মাস খানেক দেরাদূন মুসুরিতে কাটাবে তখন ওদিক্ দিয়ে গিয়ে লাভই বা কি ?

তবে শ্রীনগর বা দেবপ্রয়াগ হয়ে টিহিরীর পথে যদি যাওয়া হয়,—দেখা যাক। তাহলে হিমালয়ের আরও খানিকটা দেখতে পাওয়া যাবে।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার। সন্ধ্যায় বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে সারারাতই বর্ষণ চল্লো। কখনও মৃদু, আবার কখনও প্রবল বেগে বৃষ্টি হচ্চে। রাত্রে দুএকবার আধঘুমন্তয় ফোঁটা ফোঁটা জল গায়ে পড়েছিল, একটুখানি সরে শুলেম। আজ আর ভোরের বেলায় সাজ-সাজ রব পড়েনি। মেঘে আকাশ ভরা, কখনও কখনও ঝুপঝুপ, কখনও বা ঝির্ ঝির্ করে জল ঝরছে। পাহাড়ের উপর হতে বৃষ্টির জল প্রবল বেগে ঝরণার ক্ষীণ ধারাকে বৰ্দ্ধিত করে ঝরে পড়ছে। আমাদের লম্বা টানা দৌড়দার ঘরখানাতেই দাণ্ডি কাণ্ডি প্রভৃতি উঠিয়ে রাখা হয়েছিল। চাকর বামুন পাণ্ডার গোমস্তা সকলেই এরই এক প্রান্তে পড়ে আছে। পাথরের পাঁচিল ঘেরা একখানি উঠানের মত আছে, তারই মাঝখানে পাথরের বেদি গোছ একটা, তাতেই বৈকালে আমরা বসেছিলেম। পঙ্কু এবং ফণিবাবু দুখানা লোহার চেয়ারও পেয়েছিলেন। আর এরই একটী পাশে একটী ঝরণা-যেন বাড়ীর মধ্যের জল কলের মত আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়েছিল। সারা রাত্রের বৃষ্টি পাতে সেই ঝরণা পাহাড়-ঝরা জলের বেগে হুড় হুড় করে জল ঢেলে ঢেলে উঠান খানি থৈ থৈ করে তুলেছে। আকাশ ধূসর ঘনমেঘে সমাচ্ছন্ন, মনে হচ্চে, যেন আকাশে পাহাড়ে পৃথিবীতে সমস্তই আজ এক হয়ে গিয়েছে। এর মাঝখান

হতে আর আমাদের যেন বেরিয়ে পড়া দুরুহতর হয়ে উঠ্‌ল! বর্ষাকে আমি চিরদিনই ভালবাসি। আমার কাছে এই বর্ষাবারি-স্তম্ভিত সজল শ্যাম জলদরাশি, শ্যামসুন্দরের এই স্নিগ্ধ মধুর রূপ চির-অভিনন্দিত। আমাদের চুঁচড়োর বাড়ীতে থাকার সময় যখন উত্তর-পশ্চিম কোণে নীল রংয়ের মেঘ উঠে দ্রুতগতিভরে সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করে গঙ্গার জলকে তার গভীর কালো ছায়ায় মসীবর্ণ করে তুলত, আমাদের গঙ্গার ধারের বাড়ীর সুবিস্তৃত খোলা ছাদে বা গঙ্গার ধারের সেই প্রকাণ্ড লম্বা দালানে বাড়ীর সমস্ত ছেলেমেয়েরা মিলে কাপড়ের আঁচল, চাদর বা রুমালের পাল তুলে দিয়ে নৌকা হয়ে ছুটে বেড়াতাম। ঝড়ের শব্দকে ছাপিয়ে দিয়ে আমাদের দাপাদাপির শব্দ উপরে উঠে পড়ত, এতই আমোদ হ'ত। সে সব গল্প তুমি অনেকবারই শুনেছ এবং কিছু কিছু হয়ত দেখেও থাকবে!

যখন বর্ষা তার "মেঘময় বেণী" এলিয়ে দিয়ে, নীলাম্বরী শাড়ীর আঁচল দুলিয়ে, কেতকী কদম্বের মালা প'রে, কৃষ্ণচূড়ার গুচ্ছ খোঁপায় গুঁজে দেখা দিত, আমিও তাকে "এস হে এস"—বলে বরাবর ত সম্মান জানিয়েছি। আমার লেখায় ঝড় বৃষ্টির বর্ণনাটা বড্ড বেশী—এ কথা অনেক জনেই বলেছেন। আজ কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটেছিল। আজ ভোরের বেলা ঘুম ভেঙ্গে উঠে এই ধূমায়মান মেঘমণ্ডিত গিরি-পথের একটা ক্ষুদ্র চটিতে গুরু গুরু মেঘগর্জ্জনে যেন মনটা সাত হাত ভিতরে বসে গেল। গৃহ-পথবর্ত্তী মন কালিদাসের যক্ষের মত তাকে সুস্বাগত না জানিয়ে যেন অভিশাপের বাণী বর্ষণ করতেই উদ্যত হয়ে উঠল। কে'ই বা বাপু আজ তোমার পথ চেয়ে বসে আছে যে এমন করে ছুটে এলে?

যে রকম কাণ্ডটী, আজ যে এ বেলাই আবার বার হতে পারা যাবে, এর তো কোন আশাই ছিল না! নাঃ, সংসারের আশা নিরাশার কোন হিসাব করতে যাওয়া চলে না দেখছি! বৃষ্টি তো থেমে গেলই, দিব্য ঝিল্‌মিলে রৌদ্রও দেখা দিল। আমাদের বেরুতে মোটে সাতটা বিশ মিনিট।

খাসা রাস্তাটী! চড়াই উৎরাই খুবই কম। নদীর ধারে ধারে চলার পথ। মধ্যে মধ্যে উঁচুতেও উঠে গেছে, কিন্তু বেশীর ভাগই মাঠের ভিতর দিয়ে দিয়ে সোজা রাস্তা। সেই প্লেনটা এখনও চলেছে। নদীর ধারে ধারে থাক কাটা কাটা ক্ষেতগুলির মাঝে মাঝে সুন্দর কুটীরগুলি দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। আমায় কেউ কেউ বলেচেন, "আপনি লেখিকা হয়ে এতটা প্রাকটিক্যাল হলেন কি করে?" তা ঠিক! আমিও তাই ভাবি যে, সত্যিই ত হলুম কি ক'রে?—এই দেখনা, অত অত বরফ, ফুলের গাদা কত কি দেখে এসে, শেষে সেই কুঁড়ে ঘর আর শস্যক্ষেত্র দেখেই কি না আহ্লাদে আটখানা!

কিন্তু করব কি? আমার ওদিকটার উদ্ধত মূর্ত্তি "র‍্যাম্পার্টের" মত বিশাল দুর্ভেদ্য পর্ব্বত-প্রাচীর, যার মধ্যে থেকে মনে হ'ত ওর চূড়োয় উঠতে পারলে আকাশের চাঁদ ধরা কিছুই বিচিত্র নয়! যার মধ্যে থেকে আকাশ-টাকে একটা উঠোনের মত ছোট্ট মনে হ'ত,—আবার কখনও কখনও এমনও সংশয় জাগতো;—এর থেকে কি আর কখনও বেরুনো যাবে? তার চাইতে এদিক্‌কার এই কম উঁচু ঢিলা-ঢালা মোটা-সোটা আলস্যে যেন এলিয়ে প'ড়ে তাকিয়া ঠেস দেওয়া পাহাড়গুলিকে কিছুই মন্দ লাগচে না। এদের গায়ে যেন চেনা চেনা গন্ধ পাচ্চি! মধ্যে মধ্যে দুএকটী পাহাড় খুব

নীচু, তারই ফাঁক দিয়ে পিছনের অনেক দূরের রেঞ্জগুলি পর পর থাকে থাকে সাজান দেখতে পাওয়া যাচ্চে।

একটী লোহার পুল দেখিয়া পাণ্ডাজী বল্লেন এখান দিয়েও ঐ পথে গুপ্তকাশী যাওয়া যায় এবং ঠিক ঐ পুলের উপরকার বিশাল পর্ব্বত শৃঙ্গ দেখিয়ে বল্লেন, এর নাম নাগেশ্বর পর্ব্বত। তিন মাইল সোজা চড়াই উঠলে নাগনাথ মহাদেবের মন্দির। এই পাহাড়ের নাম থেকে এ অঞ্চলটাকে নাগপুর বলে। জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ কালে নাগেরা এসে এইখানে মহাদেবের শরণাপন্ন হয় এবং তিনিও তাদের এইখানেই নিজের অঙ্গভূষণরূপে গ্রহণ ক'রে রক্ষা করেন।

কাল বৈকালের চার মাইল পথের মধ্যে বেশীরভাগ উঁচু পাহাড়—অনেক উঁচু, আর সেই সব উঁচু পাহাড়ের উচ্চতর স্থানেই বহুতর সু-সমৃদ্ধ গ্রাম শোভা পাচ্ছিল দেখতে পেলাম। এদের মধ্যের কতকগুলি জনপদকে ঠিক গ্রাম বলতে পারিনে। সে গুলি অখ্যাতনামা হলেও গুপ্তকাশী, উখীমঠ, জোশিমঠ প্রভৃতির চেয়ে ঢের বেশি বড় পার্ব্বত্য সহর। এই সব স্থানে যাবার রাস্তাও কিছু প্রশস্ত। এপার থেকে ও-পারে যাবার নদীর উপরে দড়ির পুল আছে। শ্লেট পাথরের ছাদ দেওয়া এলামাটী বা গেরি মাটীর রঞ্জনের মধ্যে সাদা চুণকাম বা অভ্রমাখান বাড়ীগুলি যেন চিত্রার্পিত হয়ে রয়েছে। এইসব পুরাণো ধরণের সহরগুলির শোভা আমার চোখে এত সুন্দর লাগছিল, তা' বলতে পার্ব্বোনা। এর কাছে আধুনিক নির্ম্মিত শৈলাবাসকে যেন ভারি কৃত্রিম বলে মনে হয়।

এক সময় এই সকল স্থানেই এক একটী স্বাধীন রাজার রাজধানী ছিল। গাড়োয়ালের অসংখ্য গড়ের মধ্যেরই এরা সব দুর্ভেদ্য গড় বিশেষ।

এখন এসব সামান্য গ্রাম মাত্রে পর্য্যবসিত হয়েছে। এখন আর ওর মধ্যে সৈন্য সামন্ত রাজা জমিদার কেউই নেই। বাসিন্দারা সরকারের খাজনা দিয়ে জমি চষে, ক্ষেত করে, গরু বাছুর মোষ পালন করে, ছাগল ভেড়া পুষে তাদের লোমে স্থতো কেটে কাপড় করে' পরে', অতি সাধারণ জীবন যাপন করে। কার্পাস এ দেশে বড় একটা জন্মায় না, আর উর্ণা স্থতার প্রয়োজনও শীতের জন্য বেশী, তাই কম্বলেরই চলন। মোট কথা ঐ উচ্চ পর্ব্বতের গড়বাসীরা এক রকম ভিন্ন-জগতের প্রাণী। ওদের ব্রহ্মাণ্ডে ওদের দরকারী সবই আছে। চাষের জমিতে ফসল, ছাগল ভেড়ার লোমে বিছানা কাপড়, চকমকি পাথর ঠুকে আগুন, কঞ্চি বাঁশের চেটাই, ঘরের গরুর দুধ ঘি এইতেই এদের চলে যায়, সহরের সর্ব্বগ্রাসী সভ্যতার দায়ে এদের ঘরের ঘটী বাটী থেকে মাথার চুলের টিকিটী অবধি বিকিয়ে যায় না। মেয়ে পুরুষে সমান খাটে, মেয়েদেরও পুরুষদের কারুই পরস্পরের সঙ্গে Equal rightsএর জন্য লড়াই দিতে হয় না। অথচ কাহারও আনন্দের অপ্রতুলতা কোথাও দেখতে পেলুম না। এদের অভাব শুধু নুনের। আর তারই জন্যে বছরে দুএকবার করে এদের নেমে এসে ওই অভাবটুকু মোচন করতে হয়। আর ছুঁচ-স্থতোরও ঐ জন্যেই অত চাহিদা ছিল। ওটারও ওদের অভাব।

এ দেশের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বেশীর ভাগই স্থন্দর চেহারা। উচ্চ বর্ণের লোকই বেশী। আসল ব্যাপার এই যে, মুসলমান আক্রমণের সময় যে সব স্বাধীনচিত্ত আভিজাত্যপরায়ণ তেজস্বী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই স্থদূর এবং সেদিনের পক্ষে একান্তই দুর্গম গিরিশিখরে এসে নিজেদের নিভৃত নিবাস রচনা ক'রে অধীনতার লৌহ-পাশ থেকে মুক্তি

নিয়েছিলেন, এরা সব তাঁদেরই বংশধর। হয়ত আজও এদের এই নিভৃত জীবনে এরা আমাদের নব্য সভ্যতার বিড়ম্বনায় বিকারগ্রস্ত জটিল জীবনের চেয়ে স্বস্তিতেই আছে। এই সব পূর্ব্বতন অসংখ্য গড় থেকে এ দেশের নাম হয়েছিল, গড়ওয়ালা বা গড়বালা বা গাড়োয়াল।

বৃটিশ গাড়ো[illegible]লের মধ্যে এই দিক্‌টাতেই যেন লোকসংখ্যা বেশী মনে হ'ল। কেদার পথের প্রথম দিক্‌[illegible]তে গ্রাম ও গ্রামিকের সংখ্যা মন্দ ছিল না। শস্যোৎপাদিকা ভূমিও ছিল। কিন্তু এখানের মত সেটা উপত্যকা নয়, আর নদীতীরেও ফসলী জমি নেই, পা[illegible]ই গায়ে গায়ে ধাপ কেটে কেটে অনেক যত্নে ও কষ্টে ফসল ফলাতে হয়ে[illegible] পাহাড়ের মধ্যে বদরীর দিকের মত নিরেট পাথুরে পাহাড় ওদিকে সর্ব্বত্র [illegible] তাহলে চায আবাদ হতে পারত না। যে সব স্থানে কাঁচা পাহাড় সেই [illegible]নেই চাষ চলেছে। এ পথে পাহাড়েরই বা বৈচিত্র্য কত! এ দিক[illegible]র অধিকাংশ স্থলেই নোড়ার পাহাড় নুড়ির পাহাড়, গেরির পাহাড়। প[illegible] নোড়া-নুড়ির ছড়া-ছড়িটা বেশী, চলতে গেলে প্রায়ই নুড়িতে জুতো হ[illegible] যায়। কিন্তু এই রকম মাটীর আধিক্য বলেই এদিকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডা[illegible] তৈরি হয়ে আছে।

শিবানন্দী চটিতে স্নানাহার সেরে নিয়ে বিশ্রা[illegible]ন্তে প্রায় বারটার সময় বেরিয়ে যে পথে চল্লেম সে পথের শোভায় ও ঐশ্বর্য্যে মন মুগ্ধ ও প্রীত হয়ে উঠ্‌ল।

অধিত্যকার চারি দিকে শস্যশালিনী সুফলা ভূমি। একটা চড়াই উঠে দেখি তার মাথাটা হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড টেবল্‌-ল্যাণ্ডে পরিণত হয়ে গেছে। গৌচর চটিতে সেই গোচারণের মাঠটাও ঠিক এই রকম হয়েছিল। আর সেই প্রশস্ত স্থানের সমস্তটাতেই নূতন রোপিত শস্যাঙ্কুরে

ভিত হয়ে' নব কুমার' ক্রোড়ে আনন্দময়ী জননীর মতই সুশোভন বোধ চ্ছ! গত দুদিনের বৃষ্টিজলে ধুয়ে গিয়ে প্রকৃতি যেন স্নিগ্ধশ্রী ধারণ করে ছেন, পথে পথে সেই বকুলগন্ধী-জুঁইয়ের সারি, কাঞ্চন ফুলের গাছও র ভাবে দেখা দিয়েছে। পঞ্চমুখী জবার মত প্রভাময় (বরাস ফুলের) র আলোর দেখা আর পাচ্ছিনে; কিন্তু আরও অনেক রকম ফুল দেখা চ্ছে। পথে হাঁটতে ভারী ভাল লাগছে। কেবলই সেই গানটা মনে ড় যায়—"আমার এই পথচলাতেই আনন্দ"। এম্‌নি পথে চলতে তে গাইলে তবেই এগানের সার্থকতা!

শিবানন্দী চ্যবন ঋষির তপস্যা-ক্ষেত্র। চটির কাছে একটী শিব মন্দি য়েছে—গাড়োয়ালের কোন রাজমন্ত্রীর প্রতিষ্ঠিত। বৈকালে ে মেঘ রে উঠছে দেখেও আমাদের বেরুনো হল। সবারই গৃহাভিমুখী উন্মুখ চিত্ত ন আর আধিদৈবিক বাধা মানতে রাজী নয়! ঝড় জল এখন প্রায় ত্যই হচ্ছে। পথে একটু সামান্য বৃষ্টি পাওয়া গেল। পথ সেদিন াইএর নয়, উৎরাইএর, চড়াই চড়া তো অসম্ভব ব্যা , আর উৎরাইয়ে মতেও বড্ড পা কোমর ব্যথা হয়; কিন্তু রোগ টার মুখ চেয়ে টা পারি হাঁটি। তাকে ছাড়াতে মন কেমন কে াছাড়া সে অত থ থেকে বেঁচে উঠে, এখন ক্রমে সেরেও আসছে। শুধু তোমার সেজ মীনার একটা কুলি যার পায়ে পাথর ফুটে পেকেছিল, তাকে আর সারিয়ে তালা গেল না। তার বদলে অন্য কুলি নিয়ে তাকেও ওষুধ পত্র দিয়ে ঙ্গ আনা হচ্ছিল, কিন্তু এইবার বিদায় দিতে হ'ল। ক্রমেই বাড়ছে, ন্ন করার দরকার। লোকটা যাবার সময় কেঁদে গেল। মনটা সবারই ত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লো, আহা বেচারা!

কুলিগুলো প্রায় বেশির ভাগই ... । এদের মধ্যে তিনচার জন "এক্স্‌সোলজার", এখনও পেনসন পাচ্ছে । মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধে গেছ্‌ল ।

শিবানন্দী থেকে রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছবার মাইল দুই আগে অলকানন্দার তীর দিয়ে যেতে যেতে একটী মনোরম দৃশ্য দেখতে পাওয়া গেল। অলকানন্দার অন্য পারে, একেবারে গ্রামহীন মানব-সম্বন্ধ পরিশূন্য একটী পাহাড়ের উপরে সুরচিত উদ্যানের মধ্যে একটী দেবমন্দির এবং তিনখানি সুপরিচ্ছন্ন দ্বিতল গৃহ, আর তার পাশেই একটী খিলানের মত করা পর্ব্বতগুহা। যথার্থ উচ্চ প্রকৃতির ... সাধনোচিত স্থান বটে! শুনলেম কোন স্বামীজির সাধনাগৃহ। ... জানা গেল না। নদী এখানে তার চির-চাপল্য পরিহার ক'রে, ... মন্থর গমনে বয়ে যাচ্ছে, পর্ব্বতগুলি দৃঢ়, গাম্ভীর্য্যময়। নিকটে বা দূ... কোথাও একটী গ্রাম বা মানব-হস্ত-কর্ষিত শস্যক্ষেত্র দেখা যায় না। ...র উপর দিয়ে পর্ব্বত যেন একটী বাহু বিস্তৃত করে দিয়েছে। ঐ সাধ... ...টীরটীকে সে যেন তার অচল রক্ষাহস্ত দিয়ে বেষ্টন করে' সংসারের ... ...ত করে রেখেছে।

মনে হচ্ছিল, আমি যদি এই স্থানটীর অধিকার পেতুম, বেশ হ'ত!

সেকালে বানপ্রস্থ নিয়ে লোকে এই সব স্থানে আসত, এখান থেকে ফিরে আবার সেই গৃহ-কোটরে আবদ্ধ হতে তারা আমাদের মত ছুটত না। কি সুন্দর নিয়মই ছিল!

শ্রীমতী নলিনী দেবী—কল্যাণীয়াসু—

এবারে আমরা রুদ্রপ্রয়াগে না গিয়ে লোহার পুলের এদিকে পুনারেই রইলুম। রুদ্রপ্রয়াগের সেবার যেমন রুদ্র মূর্ত্তি বোধ হয়েছিল, এবার তা

'ল না। বেলা দেড়প্রহরের খর রৌদ্রে পার্ব্বত্যপথের যতই শ্রী থাক, তা তশ্রীই ঠেকে। তখন প্রাণের ক্ষুধার চাইতে দেহের ক্ষুৎপিপাসাই প্রবল য়ে ওঠে, কাযেই কাব্য তখন বাস্তবের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। অনেক-।।নি চড়াই পথে এসে, হেঁটে নদী পেরিয়ে, একটা বিশ্রী ভাঙ্গা চোরা পথ দিয়ে ধর্ম্মশালার নীচের তলার ঘর পাওয়াতেই মেজাজও বিগড়ে গেছল। তার উপর সাম্‌নেই সেই এলাহাবাদের সেবাশ্রমের ক্যাম্পের আহত! এমন ব্যাপারের সঙ্গে উঁচু উঁচু পাতাল পুরীর ধাপের মতন সিঁড়ি নেমে রুদ্র তাণ্ডবে নর্ত্তিত রুদ্রপ্রয়াগ সঙ্গমে স্নান করতে যাওয়া! কিন্তু এবার এই অপরাহ্ণের রক্তোজ্জ্বল স্নিগ্ধতার মধ্যে, পার্ব্বত্য বরফগলা জলের ধা বর্দ্ধিতায়তন, তাই ঈষৎ যেন শান্ত ভাবাপন্না অলকানন্দার দুধারে ছোট্ট সহরটীকে তো নেহাৎ মন্দ লাগল না! অবশ্য ওপারে বা ন সঙ্গমে আমরা এবার আর যাইনি।

পাণ্ডাজী সকালেই এসেছিলেন, মজফঃরপুরে এবং দেরাদু টেলিগ্রাম করতে। আমরা আসতে আসতে অফিস বন্ধ হয়ে যাবে আগেই তাঁকে পাঠান হয়েছিল। অনেকদিন তোমাদের খবর পাইনি নটা অস্থির হয়ে আছে। কর্ণপ্রয়াগেই টেলিগ্রাম করবার কথা ছিল, সে দিনের সেই ভীষণ ঝড়ে তার ছিঁড়ে গেছল বলে হ'ল না। এই মাত্র চিঠি পেলুম। তোমাদের খবর পেয়ে মনটা অনেক ঠাণ্ডা হ'ল।

একটুখানি চড়াই উঠে একটী বেশ পরিচ্ছন্ন দোতলা বাড়ীতে ঢোকা গেল। এখানের রাস্তা হরিদ্বার হৃষীকেশ এবং দেবপ্রয়াগের রাস্তার মত বড় বড় নোড়া দিয়ে তৈরি করা। উপরের সমস্ত জায়গায় কিন্তু কোথাও তা' নেই, স্লেটপাথরের তৈরি টালী বসান ঘরের মেজের মতই সুখস্পর্শ।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, তোমাদের সেজ মাসীমার পায়ের কাছেই একটা সাপ দেখা গেল। আলো আনিয়ে খুঁজতে গিয়ে কিন্তু সেটাকে দেখতে পাওয়া গেল না। এই প্রথম আমাদের সাপ দেখা! এত ঝোঁপ জঙ্গলের পর এই যা' পথের পরে দেখতে পেলুম। আর কেদার-পথের মধ্যভাগে শুধু একটী ফিরতি পথিক একদিন বলেছিল, "মা! পথ দেখে যাবেন, খানিক আগেই একটী সাপ দেখতে পেয়েছি।"

এখানে কাঁচকলা, পাহাড়ী শাক ও কুমড়ো পাওয়া গেল। 'পরল' পাওয়া যায় শুনে দোকানে দোকানে ঘোরা গেল, শেষে দেখা গেল, সেই 'পরল' হচ্চে চালভাজার মত মাপের মুড়ি ;—আবার তারও দাম হচ্চে ১৲ সের! যাই হোক তবু এখানে কয়েকটী আবশ্যক দ্রব্য কিনতে পেলুম।

সন্ধ্যার পর একটা লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটে আমাদের দলের মধ্যে এমন একটু হুলস্থূল বাধিয়ে দিলে, যা' সেদিনের সেই সন্ধ্যার সাপটাও পারেনি! তিন তিনটে আরসোলা আমাদের বিছানায় এসে পড়ায় এমন চেঁচামেচি উঠেছিল, যাতে করে নীচের দোকানদারটা লাঠি নিয়ে ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলে যে, "আবার কি উপরের ঘরেও সাপ বেরুল?"

রুদ্রপ্রয়াগের পরেই একটা বড় চড়াই চড়তে হ[illegible] আর চড়াই থাকলেই ধূম-বহ্নিবৎ অনিবার্য্য ক্রমে উৎরাই নামাও থাকবে।

এইখানের এই গুলাবরায় এবং নরকোটা চটিগুলি খুব উঁচু পাহাড়ের উপর। এইখান থেকে হিমালয়ের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখা যায়। এর কাছের পাহাড়গুলি নীচু নীচু ও ঢালু, একেবারে মন্দাকিনীর তীর পর্য্যন্ত যেন ওরা ঢলে পড়েছে। মধ্যে মধ্যে শস্যশালিনী উপত্যকা-ভূমি, সুচিত্রিত সুশোভন গ্রামাবলী, আর আমাদের দক্ষিণে হিমালয়ের সাত আট থেকে

ারটী পর্য্যন্ত রেঞ্জ পর পর, মহাসমুদ্রের অফুরন্ত তরঙ্গমালার মতই চির রঙ্গিত হয়ে রয়েছে। যাবার সময় এইখান থেকেই কেদার পর্ব্বতের পিছনকার চির-তুষারাচ্ছন্ন "কৈলাস" বা স্বর্গারোহণ চূড়া এবং তুষারাচ্ছন্ন কেদারপৃষ্ঠ সর্ব্বপ্রথম আমাদের চোখে পড়ে।—আশা ছিল আর এক বার শেষ দর্শনও হতে পারবে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উত্তরের অংশ কুয়াসায় ও মেঘে সমাচ্ছন্ন থাকায় আর একবার সেই অপরূপ রূপরাশি দেখে চক্ষু সার্থক করে নিতে পারলেম না।

আমায় দুঃখিত দেখে পাণ্ডাজী বল্লেন, "কাছে গিয়েই তো দেখে এলেন, মাইজি! তার চাইতে আর বেশি কি দেখবেন?"

মনে মনেই বল্লেম,—শ্রীমতী বলেছিলেন,—

"জনম অবধি হম রূপ নেহারিনু
নয়ন ন তিরপিত ভেল।"

আর আমি তো মোটে সেই একবারই দেখেছি! এ কি দেখে দেখে সাধ মেটবার?

নামার পথের আশে পাশে গ্রাম ও ক্ষেত অনেক দেখা যাচ্ছিল। মৈঠিয়ানা থেকে দেবপ্রয়াগ অবধিই হিমালয়ের এই অংশটা (পুরাতন গাড়ওয়াল রাজধানী এইজন্যই এখানে সংস্থাপিত হয়েছিল) উপত্যকাময়। স্থানে স্থানে এই সমতলগুলি দু তিন মাইলও বিস্তৃত, তাতে বড় বড় গ্রাম। খাংড়া চটিতে একটা ঝরণাকে বাঁধ দিয়ে বেঁধে নহরের মত করে রেখেছে, আরও খানিকটা গিয়ে তার থেকে একটা নদী বেরিয়ে গেছে। এদেশে এদের বলে গধড়। এদিকে গৌরাং ধরাসু প্রভৃতি বেশ সুসমৃদ্ধ গ্রাম আছে।

উত্তরাখণ্ডের পত্র

বিকালে মেঘ করে এল। ওদিনের ঝড়-বৃষ্টি মনে একটু ভয় জাগিয়ে রাখলেও সর্ব্বদাই কিছু আর অতটা হবে না, এই ভরসায় একটুখানি অপেক্ষা করে থেকে বেরিয়ে পড়া গেল। কুলিগুলো রোদের চেয়ে বৃষ্টিতে ভিজতেও রাজী আছে। যাহোক একটু বর্ষণ হয়েই থেমে গিয়ে আবার সূর্য্যকরোজ্জ্বল আলোকোদ্ভাসিত অপরাহ্ণ প্রকাশ পেলে, অধিকন্তু লাভ হল! সুন্দরী-প্রকৃতির জলধৌত প্রসন্ন চিক্কণতা—"বর্ষণ-হর্ষভরা ধরণীর"—অম্লান মধুরতর রূপ!

আজকের পথের দৃশ্য যেন ছায়াবাজীর মত ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছিল। এই জনহীন নীরব প্রান্তর-পথ, শুধু ঘুঘুর ডাকে মুখরিত হয়ে আছে। এই কত না বিচিত্র ফুলে ভরা উপবন;—আবার এই শ্বাপদ-সঙ্কুল ভীষণ ঘনারণ্য। এই শস্যশ্যামলা নদী-মেখলা লক্ষ্মীশ্রী-সম্পন্ন গৃহস্থকুল-সমাবেশিত জনপদ, এই ভীমকান্ত দুর্দ্ধর্ষ দুর্লঙ্ঘ্য রুক্ষতর পর্ব্বতশ্রেণী।

গত বৃষ্টিতে পথের উপর হুড়মুড়ে পাথরের গাদা উপর থেকে নেবে এসে জমা হয়েছিল। ক'জন কুলিতে কোদাল নিয়ে পথ সাফ করচে। আমাদের গম্য স্থানের মাইল দেড়েক বাকি থাকতে চলতে আরম্ভ করা গেল। আমাদের সঙ্গে যে সব পথের-সাথীদের দেখা হচ্ছিল, চমৌলী অথবা কর্ণপ্রয়াগ থেকে তাদের আর দেখা পাচ্ছিনে, তারা রামনগরের উদ্দেশ্যে অন্য রাস্তায় চলে গেছে। আমাদের মত হৃষীকেশের যাত্রী খুব কম।

নির্জ্জন নীরব বনপথে একা একা পথ চলতে এক এক সময় বড্ড ভাল লাগে। পথ চলার আনন্দটা যেন এতে ভাল করে উপভোগ করা যায়। মনে মনে কথা কওয়াও চলতে থাকে। মানুষের সঙ্গকে আমি

কোনদিন তুচ্ছ করিনি। যখনই যার সংশ্রবে এসে পড়েছি, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, দেশী-বিদেশী, রাণী কিম্বা ভিখারিণী সকলকেই যথাসাধ্য আদর করেই গ্রহণ করেছি। কিন্তু ভিতর থেকে আমার একটা নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত 'আমিত্ব' আছে।—সে আজ একেবারেই একা! সে তার চিরসাথীকে চিরদিনের মতই হারিয়ে ফেলেছে! তাই মধ্যে মধ্যে এই রকম সঙ্গহীন নির্জ্জনতার মধ্যে ডুবে থেকে বেশ একটা নিগূঢ় প্রশান্তি পেতে ইচ্ছা যায়। সংসারকে তার সমুচিত পাওনা গণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে এইটুকুই শুধু নিজের জন্য বাকি রাখা!

এমন্ করে পথ চলতে গেলে কত কথাই মনে জাগে। জগদতীতের কথা থেকে যারা আজ জগতের অতীত হয়ে তাঁরই হয়ে গেছে, তাদের কথাও তো না ভেবে থাকতে পারিনে! সেই সঙ্গে দাদামশাইকেও মধ্যে মধ্যে মনে পড়ে। তিনি নিশ্চয় আমার কথা মনে করেন। চিঠি পত্র তাঁকে অনেকদিনই লেখা হয়নি।

কর্ণপ্রয়াগের পর থেকে আম জাম দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশে চৈত্রমাসে বারুণী স্নানের সময়ে আম যত বড়টী হয়, এখানে এক একটা গাছে তত বড় আম দেখলুম। সব গাছে কিন্তু ধরেও নি। আর জামের সবে মাত্র পুষ্পোদ্গম হচ্চে। কেদারের পথে আখরোট আপেলদেরও এইরকম সদ্যোজাত অবস্থায় দেখে এসেছি। একদিন ডুমুর ভেবে একঝাড় আখরোট আমরা পাড়িয়ে ছিলুম। এদেশে এখন সর্ব্বত্রই বসন্তকাল দেখা দিয়েছে। বরফ গলছে, হিম জড়তা কেটে বন্য প্রকৃতি এই সবে মাত্র তার নূতন তাজা ফল ফুলের ডালিগুলি সাজাবার উপক্রম করচেন। এই সব অর্দ্ধমুকুলিত ফলফুল শ্রাবণ

ভাদ্রে ফুটে ও ফলে উঠে প্রকৃতিসুন্দরীর ভাণ্ডারকে ভরিয়ে দেবে।—কিন্তু সেদৃশ্য আমরা দেখতে আসব না।

এদিককার পাহাড়গুলির আকার ও বর্ণ নানাবিধ। কোথাও অভ্রময় পর্ব্বত সূর্য্য রশ্মিতে ঝিলিক হান্‌চে। কোনখানে নোড়ার পাহাড় স্তরে স্তরে থাকে থাকে উর্দ্ধে উঠে গেছে। কোথাও বা নদীতীরে নিরেট কালো পাথরের পাহাড়টাকে যেন গঠন সামঞ্জস্যে দক্ষিণ দেশীয় বিশালকায় মন্দিরের মূর্ত্তি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। কোনখানে জহর মহরা নামক সবুজে ও নীলে মেশান ঔষধি প্রস্তরের পর্ব্বত, দূর থেকে মনে হচ্চে যেন পর্ব্বতপৃষ্ঠে জহরতের ও মীনার কাজ করে দেওয়া রয়েছে। কোথাও লাল লাল পাথর, কোথাও শ্বেত পাথর, কোথাও শ্লেট পাথর এবং কোনখানে আল্‌গা বালি পাথরের ভস্মস্তূপ এবং পাহাড়ের গায়ে আমাদের পথরেখা আঁকা হয়ে রয়েছে। কত রং এবং কত আকারেরই যে পাথর চারিদিকে ছড়ান থাকে, মনে হয় সব কুড়িয়ে নিয়ে যাই। আর ঝরণার ঝুরুঝুরু ধ্বনি শ্রুত হয় না, এমন কোন স্থানই নেই! বদরীকেদার পথের এ সুখটী অতুলনীয়। জলকষ্ট ব'লে কোন জিনিষই এদিকে নেই, . এসব পথে এইটীই সব্বার চাইতে বেশী সুখ।

শ্রীনগরের চার মাইল পূর্ব্বে সুকরতা বা সুক্কৃতি চটিতে রাত কাটানো গেল। নদীতীরে ফলে ভরা আমগাছের ছায়ায় ছোট চটিটী দৃশ্য হিসাবে বেশ উপভোগ্য। মাধবীলতায় যত্র তত্রই কুঞ্জ রচিত হয়ে রয়েছে। অলকানন্দা এতদঞ্চলে ক্রমশঃই স্ফীত হ'তে স্ফীততরা হচ্ছেন। সুকরতার দু' মাইল আগে থেকে চাষ আবাদ আর গ্রামগুলি

দেখবার মতন। চটিতে লোকের খুব ভিড় ছিল। আমাদের লোক এসে দখল করে রেখেছিল বলে আমরা দুটো ঘর পেলুম। আমাদের লোকজনেরা এবং অন্য অনেক যাত্রী গাছতলাতেই রাত কাটালে।

স্থকরতা চটির নীচের দিক দিয়ে একটা রাস্তা ফরাসু গ্রামের দিকে গিয়েছে। এই স্থানে এক সময় পরশুরাম তপস্যা করেছিলেন, এইখানে এই ধ্যান বলে পূজা করতে হয়।

"কুলাচলা যস্য মহীং দ্বিজেভ্যঃ
প্রযচ্ছতঃ সোমদৃষত্বমাস্থ।
বভূবুরাৎসংগজলং সমুদ্রাঃ,—
স রৈণুকেয়ঃ শ্রিয় মা তনোতু॥"

এইখান থেকে আড়াই মাইল গিয়ে, সেখান থেকে পাকদণ্ডীর পথে দেবলগড় নামক এক পূর্ব্বতন রাজ্যাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে রত্নীদিগের রাজা শশিবিন্দুর পুত্র দেবলরাজ বৃদ্ধাবস্থায় নিজের পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক এখানে এসে রাজরাজ্যেশ্বরী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন!

স্থকরতা চটিও নাকি ব্যাসদেবাত্মজ শুক বের আশ্রম ছিল।

শ্রীনগরের আগে থেকে পরে পর্য্যন্ত অলকানন্দার খাত জলে খুব ভ'রে উঠেছে। এর পরে আমাদের 'হুগলী নদী' নামপ্রাপ্ত ভাগীরথীর মতই চওড়া দেখাবে, যখন বর্ষার জল নামবে।

ভিল্ল কেদারের ওপারে টিহিরির কীর্ত্তিনগর, বরুণ-প্রয়াগ। সেদিন সেখানে কোন মেলা ছিল। গঙ্গোত্রীর যাত্রীরা পুল পেরিয়ে ওপারের রাস্তা ধরলে। পথে নাকি চটি নেই, ধর্ম্মশালা বহুদূর, জলকষ্টও কোন

কোন জায়গায় হয়ে থাকে, তাই পঙ্কুরা ও পথে যেতে ভরসা করলে না।

তিন জায়গায় বৃষ্টির জলের তোড়ে পথ ভেঙ্গে গিয়েছিল। সাবধানে পেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে রইলুম, কি জানি সাথীরা যদি ডাণ্ডি চড়ে এসে দেখতে না পায়! সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

ক'দিন থেকেই মধ্যে মধ্যে বর্দ্ধমানের রাজ-ভগিনীর দলের সঙ্গে এক একটা চটিতে দেখা হয়ে যাচ্ছিল। বদরী মন্দিরেও এঁদের দেখেছিলাম, তখন অবশ্য চেনা ছিল না। এঁরা অনেক দিন আগে একবার সূর্য্যগ্রহণের সময় আমাদের চুঁচ্ড়োর বাড়ীর গঙ্গাঘাটে স্নান করতে এসেছিলেন। আমি তখন ছিলুম না, মায়েদের সঙ্গে আলাপ হয়। রাজা বনবিহারী কাপূরের সঙ্গে আমার বাবার ভাল রকমই জানাশুনা ছিল। মহারাণী বৰ্দ্ধমানের সঙ্গে আমারও কয়েক বৎসর থেকে আলাপ ও বন্ধুত্ব হয়েছে তুমি তো তা জানোই! মহারাণীর প্রকৃতি বেশ অমায়িক। আমাদের মত সাধারণ লোকেদের সঙ্গেও খুব হৃদ্যতার সহিতই মেলামেশা করে থাকেন।

আমাদের এ দুটীদল যে চটিতে একত্র হচ্ছে, বাইরের আর কোন লোকের সেখানে জায়গা পাবার উপায় থাকচে না। এঁদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। রাজার ঘরের মেয়ের যেমন হওয়া সঙ্গত, তেমনই,—অর্থাৎ বেশ অমায়িক। সমস্ত দিনটা বসে গল্প করা গেল। মহারাণী কুম্ভস্নানে এসেছিলেন জানতুম না, তাহলে দেখা করা যেতে পারত।

এবার ফিরতিপথে বৃটিশ-দেবপ্রয়াগে পুলের এপারে আমরা আড্ডা গাড়লুম, তবে স্নানটা ওপারে গিয়ে প্রয়াগ ঘাটে করে আসা গেল। এই

একটী প্রয়াগেই যা স্নান করা চলে, আর কোথায়ও জলে নেমে স্নান সম্ভব হয়নি, বিষ্ণুপ্রয়াগে তো ঘাটেই নামা যায়নি। বর্দ্ধিত জলধারায় বড় বড় পাথর ডুবে থাকায় প্রয়াগ ঘাটের নদী দুটী যথেষ্ট শান্তভাবাপন্ন হয়ে এসেছেন। আমার এদের দুটী সখীর এই নূতন ভাবটী দেখে শ্রীরাধিকার সম্বন্ধীয় বৈষ্ণব কবির সেই বর্ণনাটী মনে পড়ে গেল :—

"কৈশোর যৌবন দুঁহু মিলি গেল—"

শ্রীনগরেও চিঠি লিখেছেন,—লিখেছিলেন, সে চিঠি কৈ পাইনিত? হয়ত পরে আসবে। এখানের চিঠিটী পেয়েছি। তোমরা অত গরম ভোগ করছো জেনে মনটা একটু খারাপ হলো। নিজে এমন ঠাণ্ডার দেশে ঘুরছি, এবছর একদিনও গরম ভোগ করতে হয়নি। টেলিগ্রামের জবাব এলো না কেন বুঝতে পারলুম না! যাহোক শনিবারের লেখা চিঠি আজ মঙ্গলবার পেলুম।

আমি হয়ত আগামী শনিবার নাগাৎ হৃষিকেশ পৌঁ , সেই দিনই ওখান থেকে ট্রেণে উঠতে পারি। তারপর বেনার স একদিন থেমে, মজফ্ফরপুর যাব। তবে তোমার সেজমাসিমা ঘোর আপত্তি তুলছেন, তিনি বলছেন, দেরাদুনে পৌঁছে দুদিন থেকে যেতে হবে। দেখি কি হয়। তাহলে আরও দুটো দিন দেরি হয়ে যাবে। আমাদের আর ৪৫ মাইল পথ বাকি আছে। প্রত্যেক দিন পনের মাইল করে যেতে পারলে তিন দিনেই হয়ে যাবে। দুএকদিন পনেরও হয়। নামার সময় শীঘ্র হয়, তার উপর কুলি গুলোও এখন ঘাড়ের বোঝা ফেলতে পারলে বাঁচে। নৈলে ওদের কষ্ট হবে বলে আমরা ওদিকে সাত, আট, নয়, মাইলই বেশি,—দশ মাইল কদাচিৎ চলেছি। এবার অবশ্য সকলেই আমরা দুতিন

মাইল ছবেলায় হাঁটছি। নাহলে সমানে পিঠে বোঝা করে অত পথ কি চলতে পারে? প্রথম প্রথম মানুষের পিঠে চড়তেই তো মহা সঙ্কোচ বোধ হত। বাবাও কখনও এটা পছন্দ করতেন না। বলতেন 'মানুষকে পশুর মত ব্যবহার করা, এতে যেন মনুষ্যত্বের অপমান করা হয়, অথচ ওদের এতে অন্নসংস্থান, না করলেও তো নয়। তবে যতটুকু সম্ভব মুখ চাওয়া উচিত বই কি! পঙ্কুরও গরীবের উপর মায়াদয়া আছে। আমরা যথাসাধ্য ওদের বিশ্রাম দিতে ও যত্ন নিতে চেষ্টা করেছি। ওরা কি অসামান্য কষ্টই সহ্য করে! কেদারের সেই দুরন্ত বরফে আর যত সঙ্কটময় পথে কি একান্ত যত্নেই আমাদের নিয়ে গেছে! ফিরে আমরা বেশী ভুগিনি, কিন্তু ওদের অনেকেরই রক্তবমি, রক্ত-আমাশা, পায়ে হিমের ঘা প্রভৃতি হয়ে কারু কারু প্রাণ সঙ্কটও হয়েছে। এসব ভুলে যাবার বিষয় নয়! মনে হয় কি দিলে ওদের সে যত্নের ঋণ শোধ যাবে? ভাড়া দিয়ে কি এমন যত্ন পাবার কথা?

ব্যাসচটির মাইল দুই আগে থেকে সমতলে ক্ষেত খামার আর চিড়গাছ নদীতীর পর্যন্ত বিস্তৃত। চিড়ের জঙ্গল এদিকের একটী প্রধান বৈভব। নন্দপ্রয়াগ থেকেই রাশি রাশি চিড়ের তক্তা চেরা ও সাজান হচ্ছে দেখে এসেছি। ঐ সব তক্তা নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে হরিদ্বারে তুলে রেলপথে চালান করা হয়। পথে পথে নদী গর্ভে তক্তা ভাসতে ও চড়ায় আটকে থাকতে দেখে এসেছি। আবার এর জন্য নিযুক্ত লোক এসে সেগুলোকে ঠেলে ঠেলে নামিয়ে দেবে।

ব্যাসচটিতে দোকানদারদের সঙ্গে ডাণ্ডিওলাদের ঝগড়া হতে হতে শেষে মারামারির উপক্রম। এদেশে তর্কেতে লাঠির গুঁতোর প্রমাণটা

মানুষে বড্ডই হঠাৎ এসে উপস্থিত করে থাকে! পঞ্চু গিয়ে তবে থামালে। আর কারুর সাধ্য হল না। দাণ্ডি কাণ্ডি বরাবরই বাইরে থাকে, এবার নাকি তা' থাকতে দেবেনা এবং এরাও এই নূতন আইন মান্য করতে প্রস্তুত ছিল না।

রাত্রে বেশ গরম বোধ হচ্ছিল। গায়ে শুধু র‍্যাপারেই হয়ে গেল। পরদিন প্রাতে ব্যাসগঙ্গার সম্মিলন ছেড়ে পুল পার হ[illegible]ই ওঠা হলো।

বন্দরমেল চটির আগের রাস্তাটী ভারি সুন্দর। অথচ যাবার সময় এই পথকেই কি সঙ্কটময় বলে বোধ হয়েছিল! গোল পাহাড়কে তিন দিকে বেষ্টন করে গঙ্গার জল তিনটে জায়গায় ঘুরে গেছে, সেগুলিকে মনে হচ্চে যেন পরিখা বেষ্টিত দুর্গ। নদীর ওপারকার চটিওলারা ডাকাডাকি করছিল, কিন্তু আধমাইলটাক এগিয়ে থাকার সুবিধায় আমরা আগের চটিতেই এসে পৌঁছলাম। গতবার যেখানে ছিলাম সেই চটিতেই আমাদের সেই পুরাণো দোকানদার ডেকে নিলে। সে এক রকম ভালই, কারণ শেষ দিকের দুএকটা চটিতে ঘি কম কেনা নিয়ে দোকানদার গুলো বড্ডই জ্বালাচ্ছিল। এতবড় শেঠ-লোক হয়ে দুচার সের ঘি না কিনিলে তাদের আর সুবিধা কি হল? অথচ "শেঠজী" এবং "শেঠানীদের" অত ঘি খাবার মতন হজম শক্তি তো এত বড় হিমালয় ভ্রমণেও কৈ জন্মালো না! পঞ্চুর বাইওকেমিক, হোমিওপ্যাথি এবং আমাদের সোডামিণ্ট, একোয়াটাইকোটিস যা কিছু সম্বল ছিল, সবই প্রায় নিঃশেষ হয়ে এ[illegible]। অবশ্য এর ভাগীদার অনেকেই জুটেছিল। অতগুলি কুলি, পাণ্ডাজীর লোকজন, আমাদের চাকর বামুন, তাছাড়া চটিদার এবং তাদের আত্মীয়রা এবং যাত্রীদের মধ্য থেকেও যার যার দরকার জানা গেছে।

গতবারে এখানে বেশ ভাল লেগেছিল। এবার গঙ্গার গতি স্থির, জল গভীর, চড়া অনেক ডুবে গেছে। দেব-প্রয়াগের পর থেকেই ধীর স্থির পরিণত-দেহ—বুদ্ধিশালিনী গঙ্গামূর্ত্তি দেখে মনে হচ্ছিল ইনি যেন সেই চঞ্চলা চপলা কলোচ্ছ্বাস-মুখরা বালিকা জাহ্নবী নহেন। বাল-চাপল্য এবং যৌবনগাম্ভীর্য্য মিলিয়ে এসেছে, অথচ আজও সম্পূর্ণরূপে মেলায়নি, তাই ক্ষণে ক্ষণে ধীর গতিশালিনী—আবার স্থানে স্থানে গতিবেগ মৃদু ভঙ্গিমাময়।

বন্দর চটির ঠিক পাশ দিয়েই সেই চার মাইল ব্যাপী চড়াই ও উৎরাই তেমনই ভাবেই প্রতীক্ষা করচে। এ পথে এক সঙ্গে এতটা বেশী চড়াই উৎরাই আর কোথাও নেই। উখীমঠের পথে যেটা আছে সেটা এত বেশী নয়, অর্থাৎ বেশী হলেও নূতন নিয়মে প্রস্তুত বলে এত কঠিন নয়।

উপর থেকে আর একবার দূর দূরান্তরের পর্ব্বত মালার মুক্ত দৃশ্য চোখে পড়ল। গঙ্গার ওপারে রিয়াসত টিহিরীর সমস্ত পর্ব্বতশ্রেণী যেন উভয় রাজ্যের সীমা প্রহরায় নিযুক্ত চির-জাগ্রত পাষাণ প্রহরীর মতই উষার নব রঞ্জিত রক্তালোকের ধারার মধ্যে স্নাত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাণ্ডাজি হাত দিয়ে নির্দ্দেশ করে দেখালেন, "মাইজি! ওই দিকে গঙ্গোত্রী—কেদার পর্ব্বতও ঐদিকেই।"

দেখা তো আর হবে না! উদ্দেশ্যেই ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ জাহ্নবীর জন্মভূমিকে যোড় করে প্রণাম নিবেদন করলেম।

আজ সকাল বেলা স্বর্গপথে (লক্ষ্মণঝোলার এপারে) পৌঁছে আমরা অবাক হয়ে গেলেম। প্রথমদিন সন্ধ্যায় এখানে পৌঁছে কি কর্ম্মভোগই না করা গেল! আর এইখানে এতবড় সহর, বড় বড় ধর্ম্মশালা দোকান-